স্বাধীনতা

প্র থ ম খ ণ্ড

সম্মুখ
সমরের
যোদ্ধাদের
অভিজ্ঞতা

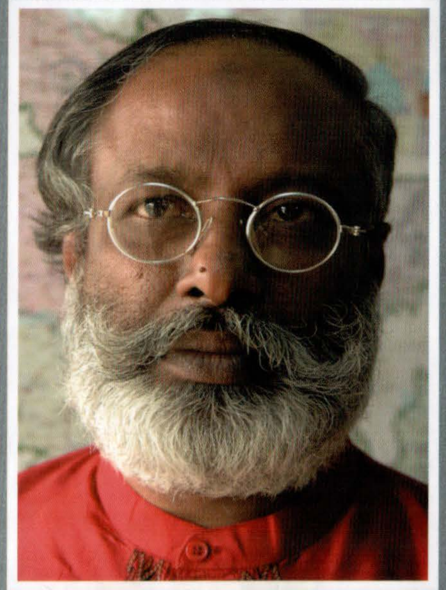
মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া
স ম্পা দি ত



স্বাধীনতা নামের ক্রমিক বইটি স্বাধীনতার লেখায় অর্থাৎ একাত্তরের রণাঙ্গনের লেখা নিয়ে সংকলিত। ভালো যোদ্ধারা, সাহসী সৈনিকরা যে ভালো লিখবেন তেমন কোনো কথা নেই। তবুও প্রয়াস অব্যাহত থাক, যদিও কাজটি মোটেও সহজ নয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আজ যে বয়স তাতে ভবিষ্যতে যে সৃজনশীলতা নিয়ে কলম চলবে তা হবার কথা না, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই। ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন সাধের লেখা ভিন্ন ভিন্ন মুক্তিযোদ্ধারা লিখছেন একই মোড়কে তারওতো স্বাদ ভিন্ন।

আমি নিজে মরণকে স্মরণ করে কষ্ট পাই না। কেউ চিরজীবী নয়। তবে বাংলাদেশে একদিন একজনও মুক্তিযোদ্ধা থাকবে না—কথাটা মনে আসলে মনটা কেমন করে। সে জন্যই মুক্তিযুদ্ধটা থেকে যাক সেটাই বাসনা।

জীবনে সব আশা সত্যি হয় না। স্বাধীনতা প্রকাশও হয়তো বেশিদিন স্থায়ী হবে না। তবুও স্বপ্ন দেখি।



জন্ম : ২৪ জুলাই ১৯৫২। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে যখন তিনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তখনই ডাক এল মুক্তি সংগ্রামে। যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধের ২ নম্বর সেক্টরে এক তরুণ গণযোদ্ধা হিসেবে। মুক্তিযুদ্ধের দুই কিংবদন্তি মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন হায়দারের সহযোদ্ধা হিসেবে তাদের পাশে পাশে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের হিরন্ময় দিনগুলিতে। একাত্তরের বীরযোদ্ধাদের পাশাপাশি নিজেকে শাণিত করেছেন স্বদেশপ্রেমের এক প্রগাঢ় চেতনায়। বাহাত্তরে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত হলেও বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠায় বিলম্বের কারণে চুয়াত্তরের ৯ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন এবং পচাত্তরের ১১ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৮৩ সালে বেইজিং ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার ইউনিভার্সিটি থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর ১২ জুলাই ১৯৯৬ সেনাবাহিনী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন। একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়ার জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন-এ যেমন উচ্চ শাঘার, একমাত্র পুত্র শিশু সাবিতের মৃত্যু তেমনি তার হৃদয়ের গভীরতম ক্ষত। তবুও এ ক্ষত নিয়ে, এই বিক্ষত সময়ে তিনি সবুজআদৃত এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেন।

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০০৭

দ্বিতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০০৯

তৃতীয় মুদ্রণ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

স্বাধীনতা
সম্পাদনা : মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (অব.)

প্রকাশক



সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ
এপার্টমেন্ট # ৪ বি, বাড়ি # ৪৪৮/এ
রোড # ৭ (পূর্ব), বারিধারা ডিওএইচএস, ঢাকা ১২০৬
ফোন #০১৫৫২ ৪৪৯৪০৪, ০১৭১১ ৫৩৬৫০০
ই-মেইল : cblws1971 @ yahoo. com

কম্পোজ
তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
পাণিনি প্রিন্টার্স
১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সুত্রাপুর, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

একমাত্র পরিবেশক
অনন্যা
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
E-mail : anannyadhaka@gmail.com

মূল্য : দুইশত টাকা

Shadhinata (volume-1) edited by Major Qamrul Hassan Bhuiyan and also Published by him on behalf of Centre for Bangladesh Liberation War Studies, (Ground Floor) House # 448/A, Road # 7 (East), Baridhara DOHS, Dhaka 1206. Cover Design by Dhrubo Ensh. Price Taka : 200.00 Only US # 8

ISBN 984 70008 0000 8

উৎসর্গ

সকল শহীদ এবং একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দেশে
যাঁরা দেশপ্রেমের প্রদীপ্ত শিখা অম্লান রেখেছেন



সম্পাদকের কথা

সার্বিক অর্থের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখালেখি যতটা বেশি হয়েছে ততটাই কম লেখালেখি হয়েছে আমাদের সম্মুখ সময় নিয়ে। এর কারণ নিয়ে আলোচনা করছি না। আমি শুধু পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদের ছেলেদের মাঠের অর্জনের কথা বলছি। স্বাধীনতার জন্য এ দেশের মানুষের সীমাহীন ত্যাগ ও প্রাণোৎসর্গের কথা বলছি। একাত্তরপূর্ব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এবং একাত্তরের রণাঙ্গনে এই মাটিবর্তী মানুষরাই ছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রধান নিয়ামক। রণাঙ্গনে নিয়মিত বাহিনীর ব্যাটালিয়ানগুলিও ছিল নিম্নবর্তী সৈনিক নির্ভর এবং সে ইউনিটগুলির বৃহদাংশই ছিল ছ'সপ্তাহের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একাত্তরের ছাত্র, কৃষক, খেটেখাওয়া মানুষ। তারা অধিকাংশই তখনো কৈশোর পেরোয়নি। স্বাধীনতা ওদের কাছে একটি বাস্তব বিভাজক। বিভাজনের এই প্রক্রিয়া এবং ক্রমাগত সামাজিক শ্রেণীভেদ বৃদ্ধি তাদেরকে প্রান্তবর্তীত করে ফেলে। লেখা আর কথায় মুক্তিযুদ্ধের এই ব্রাত্যজনদের উচ্চকিত প্রশংসা করা হলেও তার সঙ্গে শ্রদ্ধাবোধের দূরবর্তী কোনও সম্পর্ক ছিল না। 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান' আখ্যায়িত হয়ে তাদের তুষ্ট থাকতে হচ্ছে।

একাত্তরের মুক্তিযোদ্ধারা আগামী পনেরো বা বিশ বছরের মধ্যে এ পৃথিবী থেকে চলে যাবেন। যারা থাকবেন তারা বয়সের ভার কাঁধে নিয়ে বাঁচবেন বার্ধক্যজনিত রোগ-বালাই নিয়ে। লেখালেখির সময় তখন আর তাদের থাকার সম্ভাবনা নেই।

প্রথাগত শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা যোদ্ধাদের সংখ্যাই ছিল অধিক। তারা লিখতে পারেননি। যারা হয়তো চেষ্টা করলে লিখতে পারতেন সেই সংখ্যালঘু যোদ্ধারা উদ্যোগী হননি। ফলে লেখা হয়েছে অতি সামান্য। ইতিহাসবেত্তা বা যাদের লিখিত উপস্থাপনা ভাল তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সেই অহংকারের কাহিনী 'কথ্য ইতিহাস' আকারে লিপিবদ্ধ করেননি। এ বিষয়ে লেখালেখির লোক মাঠে না থাকায় উঠে আসেনি আমাদের 'যুদ্ধ সাহিত্য'। ঢাকায় পত্রিকা এবং ছাপা মাধ্যমগুলি খ্যাতিমানদের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেননি বলে তাদের যুদ্ধকাহিনীগুলি ছাপেনি। অথচ এই যুদ্ধকথা লিপিবদ্ধ হওয়া অপরিহার্য।

'সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ' মুক্তিযোদ্ধাদের লেখা ছাপাবে—এই প্রত্যয় নিয়ে তাদের লেখা সংগ্রহ করছে। মুক্তিযোদ্ধারা যেন পরবর্তী প্রজন্মদ্বারা এই দোষে দুষ্ট আখ্যায়িত না হন যে তারা তাদের যুদ্ধকথা রেখে যাননি। এই বই সেই প্রয়াসের প্রথম প্রকাশ। আশাকরি *স্বাধীনতা* পর্যায়ক্রমিক প্রকাশ আমরা অব্যাহত রাখতে পারবো।

ঢাকা
জানুয়ারি ২০০৭

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (অব.)

সূচিপত্র

টিটোর স্বাধীনতা

নাসির উদ্দীন ইউসুফ

প্রচণ্ড বেগে বইছে ঝড়।

মাঝে মাঝে ঝাপটা মেরে তাঁবুটা উড়িয়ে নিতে চায়।

তাঁবুর ভেতর আমরা পনেরো জন মুক্তিযোদ্ধা। সবাই ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমি জেগে বসে আছি। ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিজের হাত মুখের সামনে মেলে ধরলেও দেখা যায় না।

তাঁবুর এক কোনায় রাখা হারিকেনটা ঝড়ের দাপটে অনেক আগেই নিভে গেছে।

তাঁবুর সামনের পর্দার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালাম।

কিছুই দেখা যায় না। অঝোর ধারায় বৃষ্টি আর প্রচণ্ড বাতাস বাইরের অন্ধকারকে করেছে আরো গাঢ়। একেই বুঝি বলে পাহাড়ি ঝড়।

আমরা যেখানে তাঁবু গেড়েছি সে জায়গাটার নাম মনিঅন্দ।

জায়গাটা বেশ উঁচু। ঠিক পাহাড় নয়।

অনেকটা মালভূমির মতো। দিনের বেলায় দেখেছি কী সুন্দর সবুজ। এখান থেকে দাঁড়িয়ে নিচের ঘর-বাড়ি আর গাছ-গাছালির মাথার ওপর দিয়ে দেখা যায় তিতাস নদীর রুপালি শরীর।

আমাদের লক্ষ্য ওই তিতাস নদী। পাকিস্তানি মিলিটারির চোখকে ফাঁকি দিয়ে আমাদের আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া সড়ক পেরিয়ে পড়তে হবে তিতাস নদীর বুকে। তিতাসে পৌছলে আর কোনো চিন্তা নেই। কেননা কোনোভাবে দিন সাতেক নৌকা চালিয়ে পৌছে যাবো ঢাকা।

আমাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ঢাকা উত্তর অর্থাৎ সাভার—ঢাকা অঞ্চলের পাকিস্তানি ঘাতক বাহিনীকে খতম করার।

আগস্টের শেষ প্রায়। আমরা বাহান্নজন মুক্তিযোদ্ধা এই উত্তেজনাপূর্ণ কাজে ঢাকা যাবো। ঢাকা যেতে হলে এই মনিঅন্দে আসতে হয়। এখানে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি বড় ক্যাম্প রয়েছে। এরা সব খবরাখবর রাখে। এরাই পার করে দেয় মুক্তিযোদ্ধা দলগুলোকে।

আমাদের জন্য সব ঠিকঠাক ছিল।

গত পরশু সন্ধ্যা নাগাদ আমরা ঢাকা কোম্পানির বাহান্নজন এবং ফরিদপুর কোম্পানির একশ' পঞ্চাশ জন রওনা দিয়েছিলাম। রওনা দেয়ার আগে ক্যাম্প কমান্ডার

ক্যাপ্টেন আইনুদ্দীন সব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের। সঙ্গে দিয়েছেন তিরিশ জন সৈনিক। ওরা নিরাপদে আমাদের পার করে দেবে আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়ক।

পার হওয়ার নকশাটি ছিল—দশটি বড় নৌকায় আমরা অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে প্রথমে পার হবো ব্রাহ্মণবাড়িয়া-আখাউড়া রেলসেতু। ওই সেতু পার হলে পানিতে সয়লাব একটি বড় বিলে গিয়ে পড়বে আমাদের নৌকাবহর। ওই বিল আড়াআড়ি পাড়ি দিলে দেখা মিলবে আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়ক। ওই সড়কের একটি নির্দিষ্ট সেতুর নিচ দিয়ে আমাদের নৌকা পার হয়ে যাবে তিতাসের বুকে। নকশা অনুসারে আমরা সন্ধ্যার পর নেমে আসা নিস্তব্ধ রাত্রির ঘুটঘুটে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে নিরাপদে পার হয়ে যাই রেলসেতু। নৌকা দশটি আস্তে আস্তে পানি কেটে বিল পাড়ি দিয়ে প্রায় আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়কের নির্দিষ্ট সেতুর কাছে পৌঁছে যায়। কারো মুখে কোনো কথা নেই। বুকের হৃৎপিণ্ডের টিপটিপ শব্দ। আমরা তখনো জানি না কী ভয়াবহ সময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। সামনে ফরিদপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সাতটি নৌকা। পেছনে আমাদের তিনটি। সেতুর একেবারে কাছে ওরা। হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা খানখান করে গর্জে উঠল শত শত রাইফেল আর মেশিনগান। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সামনের সাতটি নৌকার চারটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কী করবো বুঝতে পারছি না।

তড়িৎ গতিতে বাকি নৌকার মাঝিরা নৌকা ঘুরিয়ে ছুট দিল। বুঝতে পারলাম আমরা ফাঁদে পড়েছি। যেভাবেই হোক পাকিস্তানিরা আমাদের প্ল্যান আগেই টের পেয়ে মহাসড়ক ও সেতুর ওপর স্থান নিয়েছে। মেশিনগান, রাইফেলের বিরতিহীন গুলি আর মর্টারের গোলায় আমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন। সামনের নৌকার মুক্তিযোদ্ধাদের আর্তচিৎকার আর কান্নায় বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। আমরা দ্রুত নৌকা ঘুরিয়ে অথৈ পানির মাঝে জেগে থাকা ছোট্ট একটি মাটির ঢিবির আড়ালে চলে আসি। নৌকা থেকে নেমে সাঁতার কেটে কেটে নৌকা তিনটিকে আমরা নিয়ে আসি আরো নিরাপদ স্থানে। সারারাত ধরে চলে গোলাগুলি। আমাদের কিছুই করার নেই। পানির ওপর মাথা জাগিয়ে অপেক্ষা করি কখন ভোর হবে। ক্রমেই পাকিস্তানিদের গুলি থেমে আসে। ভোরের আলোতে দেখতে পাই মহাসড়কের সেতু হতে মাত্র ৫০ গজ দূরে আমরা। সেতুর ওপর পাকিস্তানি ঘাতক সৈনিক। চারপাশে সহযোদ্ধাদের লাশ। ক্ষোভ, দুঃখ আর ক্রোধে পানির ভেতর সারারাত থাকা শরীরের রক্ত চনচন করে ওঠে। প্রতিশোধ, প্রতিশোধ নিতে হবে। তবে এখনই কিছু করতে যাওয়া মানে আত্মহত্যা। প্রথমে ফিরে যেতে হবে ক্যাম্পে। কতজন বেঁচে আছি আমরা। এখনো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রথম কাজ যারা বেঁচে আছে সবাইকে একত্রিত করে ঘাঁটিতে ফেরা। পানিতে নুইয়ে থাকা ঝোপ আর বাঁশঝাড়ের আড়ালে সাঁতার কেটে ক'জন যোদ্ধা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে জীবিত সবাইকে একত্রিত করে ফেললো। হিসাব করে দেখা গেল চুয়াল্লিশ জন নেই। আমরা বুঝে নিলাম চুয়াল্লিশ জন সহযোদ্ধা শহীদ হয়েছে। এবার ফিরে চলা। সন্ধ্যা নাগাদ ক্যাম্পে পৌঁছলাম। উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনা নিয়ে অপেক্ষা করছিল মনিঅন্দ ক্যাম্পের মুক্তিযোদ্ধারা। হতভম্ব, ক্লান্ত, শ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধারা সবাই দাঁড়ালো সারি বেঁধে ক্যাম্প কমান্ডারের সামনে নতমুখে। সবার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রু। বিষাদ করুণ কণ্ঠে

কমান্ডার সান্ত্বনা দিলেন। তারপর সবাইকে বিশ্রাম নিতে বললেন। আমরা যার যার তাঁবুতে চলে গেলাম। সন্ধ্যার পরপরই মুষলধারে বৃষ্টি নামল, সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। যেন প্রকৃতি রাগে আর ক্ষোভে কাঁদছে নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য। সাথী হারানোর বেদনায় ভারাক্রান্ত দীর্ঘ যাত্রায় পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত মুক্তিযোদ্ধারা বৃষ্টি ও ঝড়ের ঠাণ্ডায় আস্তে আস্তে সবাই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লো। প্রায় ছত্রিশ ঘণ্টা পর সবাই বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছে। আমি জেগে। ঘুম আসছে না। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়। অন্ধকারে চোখ মেলে বসে আছি। গত রাতের ভয়াবহ নারকীয় দৃশ্য বারবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। গুলি খাওয়া মুক্তিযোদ্ধাদের দেহগুলো নৌকা থেকে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে বিলের কালো পানিতে। ক্ষোভ, দুঃখ আর বেদনায় দম বন্ধ হয়ে আসে। হঠাৎ তাঁবুর সামনের পর্দার ফাঁক দিয়ে আলোর রেখা দেখতে পেলাম। তারপর গাড়ির শব্দ। তাকিয়ে দেখি একটি জিপ এসে দাঁড়ালো আমাদের তাঁবুর সামনে। কে হতে পারে? রাত কত এখন? গাড়ির দরজা খুলে নামলেন একজন দীর্ঘদেহী মানুষ। দরাজ ও গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলেন মানিক, বাচ্চু কোথায়, কোথায় তোমরা'? কণ্ঠস্বরে বুঝলাম আমাদের দুই নম্বর সেক্টরের কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ। সঙ্গে সঙ্গে পর্দা খুলে বাইরে এসে বললাম, 'স্যার এই তো আমরা'। তিনি দ্রুত তাঁবুর ভেতরে ঢুকলেন। পেছনে দেখি ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরী। তার পেছনে একজন যুবক ও একটি কিশোর। তাড়াতাড়ি হারিকেন জ্বালালাম। যুবকের গায়ের রং মিসমিসে কালো। কিশোরের গায়ের রং শ্যামলা। চোখ দু'টি ভারি সুন্দর কেমন ভাসাভাসা। ছোট্ট নাক। খালেদ মোশাররফ মাথা নিচু করে গত রাতের সব ঘটনা শুনলেন। তারপর বাইরের অন্ধকারের দিকে মুখ ফিরিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি বুঝতে পারছিলাম ওর চোখ দিয়ে অশ্রু পড়ছে। অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের ডাকার জন্য আমি প্রস্তুত হতেই তিনি বারণ করছেন। বললেন, 'না থাক। সবাই খুব ক্লান্ত, ওরা ঘুমাক। আমি কাল সকালে আবার আসব। তুমি এ দু'জনকে তোমাদের সঙ্গে ঢাকা নিয়ে যাও। এরা দু'জন মানিকগঞ্জের ছেলে'।

ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম চৌধুরী কালো যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এর নাম নিজাম আর ও টিটো'। আমি টিটোর দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকালাম। ও কেন যাবে যুদ্ধে? ও কীভাবে করবে যুদ্ধ? কত বয়স হবে ওর? বড় জোর তেরো-চৌদ্দ। সম্বিৎ ফিরে পেলাম খালেদ মোশাররফের ফিরে যাওয়ার শব্দে। বললেন, 'যাই কাল দেখা হবে'। আমি টিটো আর নিজামকে শোয়ার ব্যবস্থা করে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকাল ৯টা নাগাদ এলেন খালেদ মোশাররফ। আমরা সবাই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালাম সেই দীর্ঘকায় সাহসী মানুষটির সামনে। অনেক কথা বললেন তিনি। সাহস দিলেন। মৃত্যু মানুষের জন্য অবধারিত সত্যটি বারবার বললেন। সবশেষে বললেন, মনে রেখো—স্বাধীন দেশের মানুষ জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের ভালোবাসে না। স্বাধীন দেশ মৃত মুক্তিযোদ্ধদের ভালোবাসে। জীবিত নয় মৃত গেরিলা চায় স্বাধীন দেশের মানুষ। আমরা ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে। টিটো অবাক বিস্ময়ে শুনছিল কথাগুলো। আমি ওর চোখে প্রত্যয়ের বিশ্বাসের দ্যুতি খেলতে দেখলাম। পরেরদিন সন্ধ্যায় আবার যাত্রা। একই রাস্তা। এবার নিরাপদ। কেননা গত রাতে আমাদের সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধারা এক মরণ

আঘাত হেনেছিল পাকিস্তানিদের ওপর। সন্ধ্যার পরপরই আমাদের নৌকা তিনটি আখাউড়া-ব্রাহ্মণবাড়িয়া মহাসড়ক অতিক্রম করে তিতাসের বুকে গিয়ে পড়ল। টিটো আমার নৌকায়। উত্তেজনায় ছটফট করছে। বাইরে বৃষ্টি। ছইয়ের নিচে আমরা বিশজন। টিটোকে বারণ করলেও শুনছে না। পাটাতনের নিচে আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আর বিস্ফোরক। কিছুক্ষণ পরপর দেখতে হচ্ছে কাঠের ফাঁক দিয়ে পানি প্রবেশ করে মেশিনগান, রাইফেল, গ্রেনেড, ডেটোনেটরগুলো ভিজছে নাকি! কাঠের ফাঁক দিয়ে নৌকার খোলে যে পানি জমে, তা মাটির খোরা দিয়ে নদীতে ফেলে দেয়ার জন্য পালাক্রমে একেকজন কাজ করছিল। টিটোর জ্বালায় কেউ কাজটি করতে পারছিল না। টিটো একাই কয়েক মিনিট পরপর পানি সেচতে লাগল। রাত গভীর হয়ে আসে। বৃষ্টির ফোঁটা পানিতে পড়ার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। মাঝি ছ'জন আর দু'জন মুক্তিযোদ্ধা প্রহরী ছাড়া সবাই শুয়ে পড়ে। আমি টিটোকে বললাম শুয়ে পড়তে। টিটো একটু মোড়ামুড়ি করে আস্তে শুয়ে পড়ল। একটু পর টের পেলাম টিটো ঘুমায়নি। ও একটু একটু করে এগিয়ে ছইয়ের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছে। আমি ধমকে উঠলাম, 'এই টিটো কী হচ্ছে'? টিটো উঠে বসে বলল, 'আমার ঘুম আসছে না। আপনিও তো ঘুমান নাই'। আমি বললাম, 'আমার কথা আলাদা' তুমি ঘুমাও। টিটো বলল, 'না আমার ঘুম হবে না। আমি বাইরে বইসা পাহারা দেই'। আমি আবার ধমক দিয়ে উঠি। টিটো চুপ করে গেল। আমার একটু খারাপই লাগছে। আশ্চর্য এই দেড়দিনে টিটোর সম্পর্কে কিছুই জানা হয়নি। আস্তে আস্তে ডাকলাম, 'টিটো, টিটো'। টিটো তিড়িং করে একলাফে আমার কাছে চলে এলো। 'মানিকগঞ্জের কোথায় তোমার বাড়ি'? টিটো বলল, 'জানেন আমাদের বাড়ির কাছে না একটা নদী। আমি ওই নদীতে কত সাঁতার কাটছি। কত নৌকা বাইছি' আবার বকবক শুরু করে টিটো। 'জানেন আমি না ফাঁদ পাইতা ঘুঘু ধরবার পারি'। আচ্ছা টিটো তুমি কী স্কুলে পড়ো'—আমি জিজ্ঞেস করি। 'আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি।' বাড়িতে কে আছে তোমার,? 'বাবা-মা আর এক বইন'। 'তুমি এত ছোট, যুদ্ধ করবে কেমন করে'?, 'ক্যান। সবাই আপনেরা যেমনে করবেন আমিও হেইভাবে করুম। 'তোমার তো ট্রেনিং নাই' 'ওহ। খাড়ান'। বলেই টিটো একলাফে পাশে রাখা আমার এসএলআর (সেলফ লোডিং রাইফেল) তুলে নেয় হাতে, 'দ্যান শিখাইয়া দ্যান'। আমি আঁতকে উঠি 'সাবধান টিটো'। চকিতে ওর হাত থেকে রাইফেল নিয়ে নিই। ও নাছোড়বান্দা। আমি ধীরেসুস্থে ওকে রাইফেলের সব কাজ ও চালানোর নিয়ম-কানুন শিখিয়ে দেই। কোমর থেকে গ্রেনেড খুলে দেখিয়ে দিই কীভাবে দাঁত দিয়ে পিন খুলে হাতের আঙুল দিয়ে লিভারটা চেপে ধরে ছুড়ে মারতে হয় শত্রুর দিকে।

খুব খুশি টিটো আমার ওপর। বলে, 'মুড়ি খাইবেন'? আমি কিছু বলার আগেই ও ছালার মুখ খুলে মুড়ি-গুড় বের করে গামছায় করে নিয়ে আসে। মুড়ি চিবোতে চিবোতে জিজ্ঞেস করি, 'টিটো কেন তুমি যুদ্ধ করবে?' মুড়ি চিবানো বন্ধ হয়ে যায় টিটোর। ও চুপ করে থাকে। আবার জিজ্ঞেস করি, 'কী হলো?'। খানিকক্ষণ চুপ থেকে ও খুব নিচু গলায় বলল, 'ওই মিলিটারিরা আমার ভাইরে রাইফেলের আগার ছুরি দিয়া খোঁচাইয়া

খোঁচাইয়া মারছে। আমি গুইনা দেখছি, আটচল্লিশটা ঘা আছিল আমার ভাইয়ের শরীরে। আমি ওগো বেবাকরে মাইরা ফালামু'। আমার মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। টিটো বলে চলে 'ওরা আমাগো পুরা গ্রাম জ্বালাইয়া দিছে। কয়েকশ' মানুষ মাইরা আগুন দিয়া পুইড়া ফালাইছে। আমি ওগোরে আগুনে পুইড়া ছাই কইরা ফালামু'। আলো-আঁধারের ভেতর আমি টিটোর চোখে আগুনের ফুলকি দেখতে পেলাম। ক্রমে ভোর হয়। আমাদের নৌকা মেঘনা নদীর ওপর। আরো ছ'দিন লাগবে আমাদের ঢাকার উত্তরে সাভার-ধামরাই পৌঁছাতে। ওখানে ক্যাম্প গড়ে আমাদের অপারেশন চালাতে হবে ঢাকা শহর ও তার আশপাশে। দিনের বেলায় আমরা সবাই নৌকার ছই-এর নিচে। পাশ দিয়ে পাকিস্তানি গানবোটগুলো গুমগুম শব্দে চলে যায়। টিটো ছটফট করে ওঠে আমি ওকে চেপে ধরে রাখি। মেঘনা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী হয়ে সাত দিনের মাথায় আমরা পৌঁছলাম ধামরাই রৌহা গ্রামে। গ্রামবাসী ব্যস্ত হয়ে পড়ল আমাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। নারী-পুরুষ সবাই কুশল জানতে চায়। যেন আমরা তাদেরই সন্তান, অনেকদিন পর ফিরছি বাড়িতে। বাহান্ন জনের জন্য ছিল বাহান্নটি অস্ত্র। টিটো আর নিজাম পরে যোগদান করাতে ওদের জন্য কোনো অস্ত্র ছিল না। টিটোর তাতে ভারি মন খারাপ। আমরা সবাই মিলে ওকে বোঝাই, 'সবাই তো আর একসঙ্গে যুদ্ধ করবে না। তাই তুমি অন্য কারোরটা নেবে প্রয়োজন হলে'। কিন্তু ও কিছুতেই একথা মানতে চায় না। রৌহা পৌঁছার পরের রাতে পাকিস্তানিরা খবর পেয়ে আমাদের ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ চালায়। আমরা পাক বাহিনীর আক্রমণের আগেই পেয়ে যাওয়াতে প্রস্তুত ছিলাম। মাত্র পনেরো মিনিটের যুদ্ধে পরাস্ত হলো পাকিস্তানিরা। ওদের হাত থেকে দখল করা একটি অস্ত্র হাতে নিয়ে টিটোর সেকি উল্লাস! টিটোকে কখনোই আমরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে দিতে সম্মত ছিলাম না। ওকে দায়িত্ব দেয়া হলো সবার দেখাশোনা করার। বিশেষ করে খাবার-দাবার। একমাসের মধ্যে আমাদের যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচশ'। দলে দলে গ্রামের যুবক-কৃষকরা এসে যুদ্ধে যোগ দিচ্ছে। গ্রামের জনগণ দিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রতিদিনের খাবারের জন্য চাল-ডাল,তরি-তরকারি, মাছ। সবার প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য রৌহা আর শিমুলিয়ায় আঠি ভাওয়ালে খোলা হলো ট্রেনিং ক্যাম্প। একদিকে প্রশিক্ষণ, অন্যদিকে শত্রুর ওপর হামলা। খুব অল্প সময়ে আমরা ঢাকা-সাভার-আরিচা সড়কের দু'পাশের অঞ্চল দখলে নিয়ে নিলাম।

দেখতে দেখতে আমাদের যোদ্ধার সংখ্যা দাঁড়াল নয়শ'। শিমুলিয়া ক্যাম্পে টিটো ভীষণ ব্যস্ত। প্রায় পাঁচশ'র মতো মুক্তিযোদ্ধা। দম ফেলার সময় নেই। ভোর পাঁচটা হতে রাত দশটা অবধি ওর কাজ। খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও সবার খবরাখবর নেয়া, আহত বা অসুস্থ যোদ্ধাদের সেবা-সব টিটোকে ছাড়া কারোরই চলে না।

গ্রামের সব জেলে রাতে কালিগঙ্গায় জাল ফেলে মাছ ধরে নিজের সংসারের জন্য যৎসামান্য রেখে বাকি সব দিয়ে যায় টিটোর হাতে, ভোরের আলো ফোটার আগে। দূর-দূরান্তের কৃষকরা মাথায় করে বয়ে নিয়ে আসে নিজের ক্ষেতের তরি-তরকারি, ঘরের চাল-ডাল। টিটোকে হিসাব রাখতে হয় সবকিছুর। কে কী খায় না খায়।

যে টিটো ক'দিন আগেও আমার ছায়ার মতো লেগে থাকতো তার এখন আমার সঙ্গে কথা বলার সময় থাকে না। মাঝে মাঝে এসে আমার পাশে বসে। কীভাবে অপারেশন করলাম। ক'জন পাকিস্তানি সেনা খতম করেছি, সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে। অপারেশনের গল্প বলার ফাঁকে দেখেছি ওর চোখ থেকে ঠিকরে বেরুতো আগুন। মাঝেমধ্যে আমি অপারেশনে যাওয়া থেকে বিরত থাকতাম ইচ্ছে করেই। অনেকটা ছুটি কাটানোর মতো। টিটো আগেই টের পেয়ে যেতো আমার হাবভাব দেখে।

সন্ধ্যার পরপরই টিটো কাজকর্ম শেষ করে ফেলতো। তারপর হাঁড়িতে করে জ্বলন্ত কয়লা এনে আমার সামনে রাখত। শীতের রাতে জ্বলন্ত কয়লার আঁচে হাত সেঁকতে খুব আরাম। আঁচে হাত সেঁকতে সেঁকতে টিটোকে গল্প শুনাতাম বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের। টিটো তার ছোট্ট চোখ দুটো মেলে অবাক হয়ে শুনতো। একদিন আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি স্বাধীনতা বোঝ'? ও একটু ইতস্তত করে বলল, 'হ সবাই কয় দেশ স্বাধীন হইলে সবাই নাকি সুখে থাকব। ভাত-কাপড়ের অভাব হইব না। দেশ থিক্যা অশান্তি দূর হইব। আইচ্ছা আমি স্বাধীনতা দেখুম না'? 'নিশ্চয়ই দেখবে' বলি আমি। 'হ নিশ্চয় দেখুম'। অক্টোবরের মাঝামাঝি একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ দূরের গ্রামের ক'জন গ্রামবাসী ছুটে এলো। বেশকিছু রাজাকার আর পাকিস্তানি সেনারা এসে ওদের গ্রাম লুট করছে। তৎক্ষণাৎ তিরিশজনের একটি দল ছুটল। টিটোও ওদের সঙ্গে, হাতে রাইফেল। আমি ক্যাম্পে ছিলাম না। নয়ারহাট গিয়েছিলাম। ঘাটের দু'পাশে পাকিস্তানি বাহিনীর অবস্থান পর্যবেক্ষণ করতে। ফেরার পথে দেখি টিটো দৌড়াচ্ছে দ্রুতগতিতে, হাতে রাইফেল। সামনে কয়েকটা রাজাকার দিগ্বিদিক জ্ঞানহীন দৌড়াচ্ছে। আমি চিৎকার করে ডাকলাম, টিটো, টিটো। কে শোনে কার কথা। হঠাৎ ক'টা রাজাকার উপায়ান্তর না দেখে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো সামনের পুকুরে। টিটো রাইফেল হাতে পুকুর পাড়ে। রাজাকাররা একবার মাথা তোলে, আর টিটো একটা করে গুলি ছোড়ে। রাজাকাররা আবার ডুব দেয়। আমি বেশ আনন্দের সঙ্গে দৃশ্যটা উপভোগ করছিলাম। এভাবে চলে অনেকক্ষণ। গ্রামবাসী বেশ মজা পেয়ে যায়। প্রায় চার ঘণ্টা এ ঘটনার পুনরাবৃত্তি চলে। পুকুরের ঠাণ্ডা পানিতে রাজাকারদের মরণদশা। আমি এগিয়ে গিয়ে টিটোকে বলি অনেক হয়েছে, এবার ওদের নিয়ে চলো ক্যাম্পে। ও খুব বিরক্ত হলো। বললো, 'কী কন আপনে ওগোরে ওই পানিতে ডুবাইয়া মারুম। একটা গুলিও খরচ করুম না'। এবার আমি ধমকের সুরে বলি, ও চুপ হয়ে যায়। রাজাকারদের ইঙ্গিত করে মাথার ওপর হাত তুলে পাড়ে উঠে আসতে বলি। রাজাকারগুলো কোনোভাবে পুকুর হতে উঠে আসে। তারপর বিজয়ীর মতো টিটো ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলে ক্যাম্পের দিকে। নভেম্বরের চৌদ্দ তারিখ আমাদের কমান্ডার মানিক ধামরাইর কাছে ভায়াডুবি ব্রিজ অপারেশনে শহীদ হন। ভায়াডুবি ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে আমরা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনা করি। নভেম্বরের চৌদ্দ তারিখ আটটা নাগাদ আমরা ভায়াডুবি ব্রিজের কাছে পৌঁছি। অপারেশনে আসার আগে টিটো খুব কান্নাকাটি করেছিল আমাদের সঙ্গে আসার জন্য। কিন্তু মানিক আর আমার নিষেধ ও অমান্য করতে পারেনি। ও থেকে গিয়েছিল ক্যাম্পে। রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ আমরা

ভায়াডুবি ব্রিজের ওপর অবস্থানকারী পাকিস্তানি পাহারাদার সৈন্যদের ওপর আক্রমণ শুরু করি। তখন মুক্তিযোদ্ধারা ব্রিজ উড়িয়ে দেবে এ আশঙ্কায় সব মহাসড়কের ব্রিজগুলোয় পাকিস্তানিরা পাহারা বসিয়েছিল। ভায়াডুবি ব্রিজের দু'পাশে পাকিস্তানি সেনারা বাঙ্কার অর্থাৎ মাটি খুঁড়ে উপরে চালা দিয়ে তার ওপর বালির বস্তা দিয়ে ছোট ছোট ঘাঁটি তৈরি করে ওই ঘাটির ভেতর অবস্থান করতো। যত সহজে ব্রিজ দখল করবো ভেবেছিলাম তা হলো না। পাকিস্তানিদের পাল্টা আক্রমণ আমাদের কাজকে কঠিন করে তোলে। প্রায় পনেরো মিনিট বিরামহীন যুদ্ধ এবং আমাদের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখেও পাকিস্তানিরা তাদের অবস্থান ছাড়ছে না দেখে মরিয়া হয়ে মুক্তিযোদ্ধারা জীবনের পরোয়া না করে রাইফেল হাতে চতুর্দিক থেকে দৌড়ে, বুকে ভর দিয়ে ব্রিজের ওপর উঠে পড়ে এবং পাকিস্তানিদের সঙ্গে হাতে হাতে লড়াই করে ওদের পরাজিত করে।

ব্রিজ পুরো আমাদের দখলে এলে আমরা তিনভাগে ভাগ হয়ে দু'ভাগ ব্রিজের দু'পাশে পাহারা এবং একভাগ ব্রিজ উড়িয়ে দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত হই। ব্রিজ উড়ানোর জন্য আমরা যখন এক ধরণের বিস্ফোরক ব্রিজের ওপর বসাচ্ছিলাম, ঠিক তখন আমরা লক্ষ্য করি আরিচার দিক থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর একটি ট্রাকবহর এগিয়ে আসছে। ব্রিজের ওপাশের মুক্তিযোদ্ধারা প্রাণপণ লড়াই করেও ওদের থামাতে পারে না। আমরা আত্মরক্ষার্থে বিস্ফোরক বসানো থামিয়ে দৌড়ে ব্রিজের আরেক পাশে এসে যেখানে মানিকের অবস্থান সেখানে অবস্থান নেই। পাকিস্তানি ট্রাকগুলো ব্রিজে উঠে এলে আমরা আক্রমণ শুরু করি। আমাদের আক্রমণের মুখে পাকিস্তানিরা পালিয়ে যায়। কিন্তু শহীদ হন আমাদের অধিনায়ক মানিক। সে রাতের মতো অপারেশন স্থগিত রেখে আমরা মানিকের লাশ নিয়ে ফিরে আসি ক্যাম্পে। মানিকের মৃত্যুতে মুষড়ে পড়া পুরো দলকে সচল করার জন্য আঠারো নভেম্বর অর্থাৎ মানিকের মৃত্যুর মাত্র চারদিন পর আমরা সাফল্যের সঙ্গে ভায়াডুবি ব্রিজ অপারেশন করি এবং তার দু'দিন পর সাভারের ডেইরি ফার্মের পেছনে জিরাবো নদীর ধারে আমাদের নতুন ক্যাম্প স্থাপন করি।

নভেম্বরের শেষ নাগাদ সাভার, ধামরাই, মানিকগঞ্জ এলাকার সিংহভাগ অঞ্চল মুক্তিযোদ্ধারা শত্রুমুক্ত করে নিজেদের দখলে নিয়ে আসে। মুক্ত গ্রামের প্রতিটি ঘরে ঘরে উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা। সাভারের জিরাবো ক্যাম্প থেকে রেডিও সম্প্রচার কেন্দ্র আক্রমণ, সাভার মিলিশিয়া ক্যাম্প ও বিশ্ববিদ্যালয় মিলিটারি ক্যাম্প দখল এবং ঢাকা-আরিচা সড়কের টহলদাতা পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর কয়েকদফা সফল আক্রমণ পরিচালনা করা হয়। আমি জিরাবো অগ্রবর্তী ক্যাম্পে, সঙ্গে টিটো। টিটো আমার পেছনে ছায়ার মতো। আমারও মায়া পড়ে গেছে এই ছেলেটির ওপর। প্রতিটি অপারেশন থেকে ফিরে আসার পর টিটো আদর-আপ্যায়নে অস্থির করে তুলতো, শুধু আমাকে নয়, দলের প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধাকে। প্রতিটি মুক্তিযোদ্ধার মন আর হৃদয় ভরিয়ে দিতো পিতা-মাতার মতো স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে। কখনো টিটো মা, কখনো বাবা। কখনো অবুঝ ছোট্ট ভাই, কখনোবা পাখি।

ডিসেম্বরের তেরো তারিখে সাভার থানা দখল করার জন্য আমরা ষাটজন মুক্তিযোদ্ধা থানার দিকে অগ্রসর হই। আমাদের লক্ষ্য ছিল কোনো প্রকার গুলি ক্ষয় না করে ওদের আত্মসমর্পণ করানো। থানা ঘেরাও করে আমরা শত্রুপক্ষকে আহ্বান জানালে ওরা কোনো প্রতিরোধ ছাড়া আত্মসমর্পণ করে। ভোররাতে আমরা ক্যাম্পে ফিরে আসি। সারারাতের ধকলে আমরা ক্লান্ত। শোয়ার আয়োজন করছে টিটো। হঠাৎ বাইরে কোলাহল শুনে বেরিয়ে দেখি ক'জন গ্রামবাসী, ওরা বেশ উত্তেজিত। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে ওরা জানাল, উত্তরদিক থেকে অনেক পাকিস্তানি সৈন্য আমাদের ক্যাম্পের দিকে আসছে। আমাদের প্রশ্নের জবাবে ওরা আরো জানাল, প্রায় আধ ঘণ্টা আগে পাকিস্তানিদের, এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে দেখে এসেছি। মহাসড়ক দিয়ে নয়, উত্তরমুখী বাঁকা রাস্তা দিয়ে ওরা আসছে। পাকিস্তানিদের দেখে এই গ্রামবাসী দু'টি সাইকেলে করে দ্রুত খবর দিতে এসেছে। হঠাৎ পূর্বের আকাশের দিকে চোখ পড়ল। রাতের অন্ধকার কেটে পূর্বদিকের আকাশে রুপালি ছটা। শরীরের ভেতর বিদ্যুৎ খেলে গেল। এই তো সময়। 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করে সবাইকে জড়ো হতে বলে নিজেও তৈরি হয়ে নিলাম। টিটো আমার পেছনে। চারশ' পঞ্চাশ জন মুক্তিযোদ্ধা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে। সবাইকে বললাম, শেষ যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে। সবার চোখে প্রত্যয় আর বিশ্বাস। সবাই প্রস্তুত। জয় অথবা মৃত্যুর জন্য। সাড়ে চারশ' থেকে চারশ' জন মুক্তিযোদ্ধাকে আলাদা করে চারভাগে ভাগ করা হলো। দ্রুত পরিকল্পনায় নির্ধারণ করা হলো অবশিষ্ট পঞ্চাশ জন থাকবে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য। একশ' জনের চারটি দলের একটি থাকবে রিজার্ভ ফোর্স হিসেবে, প্রয়োজনে ওরা কাভারিং ফায়ার দেবে। তিনটি একশ' জনের দল থাকবে আক্রমণে। একশ' জনের একটি দল নিয়ে আমি থাকব মাঝে, আর আমার বাম ও ডান পাশে বেশ খানিকটা দূরে অবস্থান নেবে বাকি দু'টো একশ' জনের দল। টিটো পড়ে গেল জরুরি অবস্থা মোকাবেলার দলে। ও কেঁদে ফেলল। 'আমারে নিয়া যান। আমি যুদ্ধ করুম। আমি স্বাধীনতা দেখুম। আজই তো শেষ যুদ্ধ'। আমি হেসে বললাম, 'কে বলল আজ শেষ যুদ্ধ'? 'কেন? আপনিই তো কইলেন', টিটো বলল। আমি বুঝিয়ে বললাম, 'ধুর বোকা। শেষ যুদ্ধ মানে আমাদের জন্য হয়তো শেষ। আমরা অনেকেই আর নাও ফিরতে পারি'। তাই সবাইকে বোঝালাম। ও লাফ দিয়ে উঠল, 'আপনেরা মইরা যাইবেন আর আমি বাঁইচা থাকুম ক্যান? আমার ভাই মরছে। আমি আইছি যুদ্ধে। আমিও মরুম'। আমি ওকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে বললাম, 'শোনো টিটো, তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তুমি না স্বাধীনতা দেখতে চাও। তুমি এখানে থাকো। কেউ আঘাত পেলে ওদের সেবা-শুশ্রূষা করবে। এটাও যুদ্ধের চেয়েও বড় কাজ'। টিটো চুপ হয়ে গেল। আমরা দ্রুত রওনা দিলাম। পাঁচ মিনিটেই পৌঁছে গেলাম মাটির রাস্তার ওপরে। পরিকল্পনা মতো রাস্তার পূর্ব পাশে। রাস্তার সমান্তরাল প্রায় একহাজার মিটার বিস্তৃত হয়ে আমরা অবস্থান গ্রহণ করলাম। রাস্তাটি উত্তর-দক্ষিণমুখো। আমরা রাস্তার পূর্বপাশে ছোট ছোট মাটির ঢিবি, ঝোপ, আর খানাখন্দে লুকিয়ে থেকে অপেক্ষা করতে থাকলাম শত্রুর জন্য। মাঝখানে আমাদের দল। ডানে প্রায় পাঁচশ' মিটার ও

বায়ে পাঁচশ' মিটার জায়গাজুড়ে বাকি দুটো দল। গেরিলা যুদ্ধে আমাদের অবস্থানকে অ্যাম্বুশ বলা হয়। আর আমাদের মাঝের দল মেইন বডি, ডান ও বায়ের দলগুলোকে ফ্লাঙ্ক বলে। বোঝার সুবিধার জন্য ডানদিকেরটা ফ্লাঙ্ক-১ ও বামদিকেরটা ফ্লাঙ্ক-২ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইলের পর্যুদস্ত পাকিস্তানি বাহিনীর এই সাভার দিয়ে ঢাকা যেতে হবে। ওরা বুদ্ধি করে কাঁচা রাস্তা ধরেছে। পাকা রাস্তায় বিপদ হতে পারে। ওরা ক্লান্ত এটা জানা কথাই। পরিকল্পনা হলো ওরা যখন হাঁটতে হাঁটতে ফ্লাঙ্ক-১ ও মূল দলকে অতিক্রম করে ফ্লাঙ্ক-২-এর দিকে এগুবে ঠিক তখন মূল অর্থাৎ আমরা গুলি করব। আমাদের সঙ্গে সঙ্গে দুই ফ্লাঙ্ক হতেও আক্রমণ শুরু হবে এবং আমরা নিশ্চিত কয়েক মিনিটের যুদ্ধে পরাস্ত হবে পাকিস্তানিরা। যদিও আমরা খবর পেয়েছি, ওরা সংখ্যায় অনেক। ওদের সঙ্গে রয়েছে ভারী অস্ত্রশস্ত্র। ভোরের আলো-আঁধারি কেটে কুয়াশা ভেঙে সূর্যালোকে প্রকৃতি হেসে ওঠে। কিন্তু আমাদের কিছুই ভালো লাগছে না। মুহূর্তগুলো তেলাপোকার মতো মাথা হতে গড়িয়ে পিঠ হয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। অস্থির হয়ে উঠছি আমরা। নানা ধরনের শীতের পোকা নিশ্চিন্ত হেঁটে বেড়ায় মুখ-নাক, হাত-পায়ের ওপর দিয়ে। কিছু করার উপায় নেই। নড়াচড়ার সুযোগ নেই। অপেক্ষায় পাথর হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ নিস্তব্ধতার পাথর ফুঁড়ে কানে বেজে ওঠে ধুপধাপ শব্দ। বুটের আওয়াজ। অনেক সৈন্যের। নড়েচড়ে অবস্থান নিল সবাই। ক্রমেই শব্দ আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানিদের। ধীর পায়ে সাবধানী হিংস্র জন্তুর মতো এগিয়ে আসছে। তিনশ' মুক্তিযোদ্ধা দম আটকে মরণাঘাত হানার জন্য অপেক্ষা করছে। পাকিস্তানিরা ঢুকে পড়েছে আমাদের অ্যাম্বুশ বা ফাঁদে। এগিয়ে যাচ্ছে তীক্ষ্ণ চোখ রেখে সবদিকে। পরিকল্পনা অনুসারে ফ্লাঙ্ক-১ কোনো গুলি করছে না। প্রথম করছে মূল দল। তারও দেরি আছে। ওরা মূল দলের সোজাসুজি এলে তারপর আক্রমণ করা হবে। মূল দলের সোজাসুজি আসতে আর মাত্র পঞ্চাশ মিটার বাকি হাতের মুঠোয় ঘামে ভিজে ওঠে অস্ত্র। কিন্তু চোখের সামনে এত শত্রু দেখে ঠিক থাকতে পারল না আমাদের এক সহযোদ্ধা। পুরো শত্রু বাহিনী অ্যাম্বুশে ঢোকার আগেই গুলি ছুড়ল। তড়িৎ গতিতে পজিশন নিল শত্রুপক্ষ। আমরা সবাই হতবাক। প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ শুরু করল শত্রু বাহিনী। শুরু হলো রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। শত্রু বাহিনীর একাংশ যারা ফাঁদের বাইরে, তারা অবস্থান নিল অত্যন্ত সুসংহতভাবে। সম্মুখের যারা অ্যাম্বুশে প্রবেশ করেছিল তারা রাস্তার পশ্চিমে অবস্থান নিল পূর্বমুখী হয়ে এবং গুলি ছুড়তে ছুড়তে নিজেদের সংযুক্ত করে ফেললো বাইরের দলটির সঙ্গে। দ্রুত আমাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করা হলো। ফ্লাঙ্ক-১-কে মূল দল হিসেবে যুদ্ধ চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ পাঠিয়ে আমি মূল দল নিয়ে ছুটে পেছনে হেঁটে এসে ফ্লাঙ্ক-১-এর ডানে অবস্থান নিলাম। এখন আমাদের অবস্থান ফ্লাঙ্ক-১। পরিবর্তিত পরিকল্পনায় আমরা পাকিস্তানিদের তিন দিক থেকে ঘিরে ফেললাম, দুর্ধর্ষ সেই পাকিস্তানি রেজিমেন্টের সঙ্গে পেরে ওঠা কষ্টসাধ্য। ওরা অবস্থান নিয়েছে সুবিধাজনক অবস্থানে। ওদের ভারী মেশিনগান বসিয়েছে একটু উঁচুতে। তার সামনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঝোপের আড়ালে সৈন্যরা। ওরা মাঝে মাঝে আক্রমণের তীব্রতা

বাড়িয়ে দিয়ে আমাদের অবস্থানকে চিরে বের হয়ে যেতে চাচ্ছে সোজা। আমরা পিছিয়ে গিয়ে আবার একত্রিত হচ্ছি পূর্বের অবস্থানের কাছাকাছি এবং পাল্টা আক্রমণ করছি। এ যেন দাবা খেলা। প্রায় আধঘণ্টা চললো যুদ্ধ, কিন্তু কিছুতেই ওদের কাবু করতে পারছি না। ওদের মূল শক্তি ওদের নিয়মিত ওই ভারী মেশিনগান ও দু'পাশের আরো আটটি হালকা মেশিনগান। যেভাবে হোক ওদের ভারী মেশিনগানটিকে নিস্তব্ধ করে দিতে হবে। আমাদের ফ্লাঙ্ক-১-এর অবস্থান নিচু কাঁঠালবাগানে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ওদের মেশিনগানের অবস্থান; কিন্তু আমরা নিচে অবস্থান করাতে কিছুই করতে পারছিলাম না।

মাথা তোলার কোনো সুযোগ নেই। একমাত্র ফ্লাঙ্ক-২ পারে, একটু বাঁয়ে পশ্চিমে সরে শত্রুর পেছনে অবস্থান নিয়ে যদি কেউ জীবন বাজি রেখে ওই মেশিনগান যে চালাচ্ছে তাকে খতম করতে পারে, তবে আমরা ওদের কাবু করতে পারবো। আমার পাশে আরিফ। আরিফকে বললাম, দৌড় দিয়ে ফ্লাঙ্ক-২-এ নূরুকে নির্দেশ পৌঁছে দিতে যেন ওই ভারী মেশিনগানটিকে নিস্তব্ধ করে দেয়। আরিফ নিজে না গিয়ে পাশের যুদ্ধরত টিটোকে যেতে বলল। টিটো যে নির্দেশ অমান্য করে আমার পাশেই শুয়ে রাইফেল চালাচ্ছে আমি জানি না। যুদ্ধের নিয়ম কিশোর টিটো জানত না। টিটো লাফ দিয়ে উঠে সোজা দৌড়ে গেল নূরুর দিকে চিৎকার করতে করতে। গর্জে উঠল শত্রুর ভারী মেশিনগান। একঝাঁক গুলি টিটোর বুক চিরে ফেলল। মাটি থেকে প্রায় দু'হাত উপরে ছিটকে উঠল টিটো। তারপর পড়ে গেল। চোখের সামনে ঘটে গেল ঘটনাটা। মাত্র দশ মিটার সামনে। টিটো যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে যুদ্ধের সব নিয়ম-কানুন ভুলে আমরা মরিয়া হয়ে সামনে এগুতে থাকলাম। শত্রুর প্রচণ্ড গুলিতে আমাদের তিনজন আহত হলো। সামনের সমতল ভূমিতে টিটো। আর এগোনো যাচ্ছে না। হঠাৎ দেখি দ্রুত এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে নূরু পাকিস্তানিদের পেছন থেকে এগিয়ে আসছে মেশিনগান পোস্টের দিকে। কী অবিশ্বাস্য গতি। মুহূর্তের মধ্যে নূরু মেশিনগান পোস্টের বিশ মিটারের মধ্যে চলে এলো এবং নির্ভুল নিশানায় হত্যা করল ঘাতক মেশিনগান চালককে। পেছন থেকে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে দিশেহারা শত্রুপক্ষ। এ সুযোগের ব্যবহার করল ফ্লাঙ্ক-২ এবং মূল যোদ্ধারা। একের পর এক শত্রু হনন করে চলল নূরু ও তার সাথীরা। আমরা দ্রুত টিটোর কাছে পৌঁছে তাকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনলাম। শত্রু তখন বিচ্ছিন্ন-বিপর্যস্ত। কেউ করছে আত্মসমর্পণ কেউবা মৃত্যুবরণ। আরিফ ও কয়েকজন মিলে টিটোকে নিয়ে গেল ক্যাম্পে। চিকিৎসার প্রয়োজন। আধঘণ্টা খানিক যুদ্ধের পর পাকিস্তানিদের প্রায় সবার অবস্থান নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বাকি দু'একটি অবস্থান নিশ্চিহ্নের দায়িত্ব নূরুদের ওপর দিয়ে আমি ক্যাম্পে ফিরে এলাম। ক্যাম্পে তখন আরো অনেক আহত যোদ্ধা। টিটোর জখম সবচেয়ে বেশি। বুকের ডান পাশের কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত অসংখ্য গুলি ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে। ক্যাম্পের ধূসর ধুলাময় উঠান টিটোর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। একটি পাটির ওপর শোয়ানো হয়েছে টিটোকে। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। ওর শরীর ঢেকে দেয়া হয়েছে বিশটি কম্বল দিয়ে। টিটো বলছিলো শীত লাগছে, ব্যথা করছে। কম্বল দিয়ে ঢেকে ওর

মৃত্যুকষ্টই কমাতে চাচ্ছিল ওর সহযোদ্ধারা। আমাকে দেখে টিটো চিৎকার করে বলল, 'ভাই, ভাই, আমি স্বাধীনতা দেখতে চাই। আমারে বাঁচান, আমি স্বাধীনতা দেখুম। স্বাধীনতা দেইখ্যা আমি মরুম'। সবার চোখে অশ্রু। সবার চোখে একটাই প্রশ্ন, টিটো কেন? আমরা তো কেউ একজন মরতে পারতাম। ওই কিশোরটি কেন? টিটো কেন মরবে? সূর্য হেলে পড়েছে পশ্চিমে। গাছের ছায়া ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে। ধীরে ধীরে নিস্তব্ধ-নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছে টিটো। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হয়ে আসছে। 'আমি স্বাধীনতা দেখতে চাই। স্বাধীনতা স্বাধীনতা ...'।

আমাদের সবাইকে ফেলে টিটো চলে গেল। সাভারের লালমাটি আরো লাল হলো। টিটো চলে গেলো। টিটোর কবর হলো সাভারের ডেইরি ফার্মের গেটে। অতি সাধারণভাবে ছোট্ট কবর। সাভার ডেইরি ফার্মের গেটে ডান ধারে ছোট্ট যে কবরটি দেখা যায় সেই স্থানে মাটির নিচে শুয়ে আছে—নীরবে।

ঘন বর্ষার ভারী জলের ফোঁটা আর শীতের ভোরের শুভ্র-শিশির ফোঁটা নিয়ত ঝরে ওর কবরের ওপর।

হয়তো ওরা শুনতে পায় টিটোর ক্ষীণ কণ্ঠের উচ্চারণ—'আমি স্বাধীনতা দেখতে চাই, স্বাধীনতা, স্বাধীনতা '।

রচনাকাল ১৯৯২

জনযুদ্ধের যোদ্ধারা

মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ (অব.), বীর বিক্রম

একাত্তরের জনযুদ্ধের প্রধান চরিত্র সাধারণ জনগণ। পরিস্থিতিই অনেক স্থানে ন্যাচারাল লিডার সৃষ্টি করেছে। ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক ও আপামর জনসাধারণ মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষে যে অতুলনীয় শৌর্য, দেশপ্রেম দেখিয়েছে, যেভাবে হেলায় জীবন উৎসর্গ করেছে, তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। একাত্তর সালের মার্চ মাসে যশোর ক্যান্টনমেন্টে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের প্রথম ব্যাটালিয়নে (দি সিনিয়র টাইগারস) কর্মরত ছিলাম। রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সারাদেশ তখন এক উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়। সীমান্ত এলাকায় ট্রেনিং মহড়ায় নিয়োজিত থাকার কারণে দেশের চলমান ঘটনাবলি সম্পর্কে অবগত ছিলাম না। ২৫ মার্চে পাকবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ, স্বাধীনতা ঘোষণা ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি। ৩০ মার্চ ভোরে সেনাকর্তৃপক্ষ যশোর ক্যান্টনমেন্টে আমাদের ব্যাটালিয়নকে নিরস্ত্র করার নির্দেশ দিলে আমরা অস্ত্রাগার ভেঙে অস্ত্র হাতে নিয়ে পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করি। ক্যান্টনমেন্টেই আট ঘন্টাব্যাপী পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধে উভয় পক্ষে বেশ কয়েকজন সৈনিক হতাহত হন। আমাদের কমান্ডিং অফিসার লে. কর্নেল রেজাউল জলিল বাঙালি ছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তিনি এ বিদ্রোহে যোগদান করেননি। বিকেলের দিকে আমরা দুইশত বিদ্রোহী বাঙালি সৈনিক ক্যান্টনমেন্ট থেকে তুমুল গুলিবৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে এসে চৌগাছা বাজারে একত্রিত হই। এ সেনাদলে আমিই ছিলাম একমাত্র অফিসার। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের দু'শ বিদ্রোহী সৈনিকের সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয় স্থানীয় ছাত্র-যুবকরা। ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের আম্রকাননে শপথ নেয় স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার। বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ মনোনীত হন কর্নেল এমএজি ওসমানী, গড়ে ওঠে মুক্তিবাহিনীর চেইন অফ কমান্ড। কর্নেল ওসমানীর নির্দেশে আমি পাঁচশ যুবককে আমার ব্যাটালিয়নে রিক্রুট করে এটিকে সাতশ সৈনিকের একটি পূর্ণ শক্তিমান পদাতিক ইউনিটে রূপান্তরিত করি। এটি ছিল সত্যিকারের গণবাহিনী। সৈনিক ছাড়াও ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, ড্রাইভার ও দোকানদার এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত এ বাহিনীর সদস্য ছিলেন। মাত্র দু'মাসের ট্রেনিং নিয়ে এরা দুঃসাহসী যোদ্ধায় পরিণত হয়। সমগ্র সেনাবাহিনীতে এরাই সর্বোচ্চসংখ্যক বীরত্ব উপাধি অর্জন করে।

এপ্রিল মাসজুড়ে এ ব্যাটালিয়ন চৌগাছা এবং বেনাপোল সীমান্ত এলাকায় পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয় এবং শত্রু নিধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে এ পল্টনকে মেঘালয়ের তেলঢালা নামক স্থানে নিয়ে আসা হয় রিক্রুটদের ট্রেনিং প্রদানের জন্য। এখানেই প্রথম, তৃতীয় এবং অষ্টম ইস্ট বেঙ্গলের সমন্বয়ে গঠিত হয় পদাতিক ব্রিগেড জেড ফোর্স, যার কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। জুলাই মাসের প্রথমার্ধে আমি কমান্ডিং অফিসারের দায়িত্ব হস্তান্তর করি মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরীর কাছে। ৩১ জুলাই তারিখে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের ব্রাভো ও ডেলটা কোম্পানি আমার ও ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজের নেতৃত্বে কামালপুর বিওপি শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এটিই ছিল সর্ববৃহৎ প্রথাগত আক্রমণ (Conventional Attach)। পাকবাহিনীর ৩১ বালুচ রেজিমেন্টের এক কোম্পানি সৈন্য এ সুরক্ষিত বাঙ্কারসজ্জিত প্রতিরক্ষা বেষ্টনীতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছিল। তাদের সহায়তায় সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত ছিল গোলন্দাজ বাহিনীর কামানগুলো। তাদের অবস্থানের সামনে ছিল মাইনফিল্ড এবং কাঁটাতারের বেড়া। আমাদের সহায়তার জন্য অত্যাবশ্যক ছিল গোলন্দাজ বাহিনীর গোলাবর্ষণ, কিন্তু আক্রমণকালে আমরা কোনো ফায়ার সাপোর্ট পাইনি। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা কামালপুর আক্রমণ চালাই। শত্রু প্রথম থেকেই আমাদের ওপর মিডিয়াম কামানের গোলাবর্ষণ করে। মর্টারের গোলাবর্ষণ, মেশিনগানের অবিশ্রান্ত গুলিবৃষ্টির মধ্য দিয়ে, মাইনফিল্ড পেরিয়ে প্রমত্ত ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বল্প প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নবীন সৈনিকরা যেভাবে শত্রুর কয়েকটি বাঙ্কার দখল করে, সে স্মৃতি রোমন্থন করে আজো বিস্ময়ে আপ্লুত হই। কিন্তু এ আক্রমণে আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। ত্রিশজন শহীদ এবং ছিষট্টিজন আহত হয়। ডেলটা কোম্পানি কমান্ডার জাতির গর্ব ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করে শাহাদত বরণ করেন, আমি নিজেও আহত হই। এত অধিকসংখ্যক হতাহত হওয়ার কারণে আমরা শত্রুঘাঁটির কিছু অংশ দখল করেও পিছিয়ে আসতে বাধ্য হই। এত অল্পসংখ্যক সৈন্য নিয়ে কোনো সুশিক্ষিত পেশাদার বাহিনীর পক্ষেও এমন সুরক্ষিত শত্রুঘাঁটি দখল করা সম্ভব নয়। একমাত্র নির্ভেজাল দেশপ্রেমিক, স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত, মৃত্যুঞ্জয়ী মুক্তিসেনার পক্ষেই কামানের সাহায্য ছাড়া এ ধরনের মৃত্যু উপত্যকায় পদচারণা করা সম্ভব।

১০ সেপ্টেম্বর আমাদের ডেলটা কোম্পানি কামালপুরের কাছে ঘাসীপুরে রক্ষণব্যূহ গড়ে তোলে। পাকবাহিনী তাদের সরবরাহ লাইন নিষ্কন্টক রাখার জন্য বাধ্য হয়ে আমাদের ওপর আক্রমণ হানে। আক্রমণ ব্যর্থ হয়, তাদের বহু সৈনিক হতাহত হয়। আমাদের পক্ষে দুঃসাহসী যুবক ল্যান্স নায়েক ইউসুফ এবং সুবেদার মোজাম্মেল শহীদ হন।

মোজাম্মেলের ডায়েরির মধ্যে আমার একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা চিরকুট পাওয়া যায়। তার বাড়ি ভোলার দৌলতখান থানায়। তার শেষ অনুরোধ, যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলে তার বাড়িতে আমি যেন খবরটি পৌঁছে দিই। ২১

সেপ্টেম্বর আমাদের চার্লি কোম্পানি লে. কাইউম চৌধুরীর নেতৃত্বে রৌমারীর কোদালকাটি এলাকায় রক্ষণব্যূহে অবস্থান নিলে পাকবাহিনীর ওপর চাপ সৃষ্টি হয়। ২৪ সেপ্টেম্বর পাকবাহিনী এ অবস্থানের ওপর মর্টার সাপোর্ট নিয়ে আক্রমণ আনে। আক্রমণ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করা হয়। শত্রুপক্ষে ৪০ জন নিহত হয় এবং ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তারা পশ্চাদপসরণ করে। আমাদের পক্ষে নায়েক আব্দুল হক, হাবিলদার সোবহান, মকবুল ও নায়েক আতাউর রহমানসহ জনাপাঁচেক আহত হন। হক ও আতাউর এলএমজি নিয়ে শত্রুকে আক্রমণের জন্য সংগঠিত হওয়ার আগেই তাদের ওপর আঘাত হানায় তারা মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত হয়। এ আক্রমণ প্রতিহত করায় সৈনিকদের মনোবল দৃঢ়তর হলো।

৫ অক্টোবর কর্নেল ওসমানী আমাদের ব্যাটালিয়ন পরিদর্শনে এলেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে প্রশংসনীয় সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য আমাদের অভিনন্দন জানালেন। আরো জানালেন, সিলেট এলাকায় মুক্তিবাহিনীর তেমন তৎপরতা নেই, ফলে পাক সরকার নির্ঝঞ্ঝাটে চা উৎপাদন ও রফতানি করে বৈদেশিক মুদ্রা কামাচ্ছে। তাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য এবং বহির্বিশ্বে প্রচার লাভের জন্য আমাদের চা বাগান এলাকায় সামরিক তৎপরতা চালাতে হবে। নির্দেশ মোতাবেক প্রায় তিন মাসের আবাসস্থল তেলঢালা ক্যাম্প ছেড়ে ১ম ইস্ট বেঙ্গল যাত্রা করে সিলেট সীমান্তের উদ্দেশে। বিদায়ের সময় মনটা উদাস হয়ে গেল। সালাহউদ্দিন মমতাজ, সিরাজ, ইউসুফ, মোজাম্মেলসহ বহু বীর যোদ্ধাকে এখানে হারিয়েছি আমরা, কয়েকজনকে সমাহিতও করেছি পাহাড়ের ঢালে।

পুরো ব্যাটালিয়নের বিরাট কনভয় নিয়ে তিন দিনের পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করে শিলং, জোয়াই হয়ে ১২ অক্টোবর ছোট শহর আমবাসার উপকণ্ঠে পৌঁছলাম। সিলেট জেলার কমলগঞ্জের উল্টোদিকে ভারতীয় সীমান্তের কয়েক মাইল অভ্যন্তরে একটি পাহাড়ি জঙ্গলে স্থাপিত হলো আমাদের ক্যাম্প। সীমান্ত পেরিয়ে বিভিন্ন চা বাগান এলাকায় গভীর রাতে রেকি করে এলাম আমরা। কমান্ডার-ইন-চিফ-এর এডিসি ক্যাপ্টেন নূর চৌধুরী আমাদের পল্টনে যোগ দেয়, তাকে চার্লি কোম্পানির কমান্ডার নিযুক্ত করা হলো। প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের সামরিক অফিসার হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিহারের মুর্তি নামের একটি স্থানে একটি ট্রেনিং একাডেমি গড়ে তোলা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রথম ব্যাচের ক্যাডেটদের এখানেই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। কমিশন লাভের পর এই ব্যাচের দু'জন সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ওয়াকার ও আনিস আমাদের পল্টনে যোগ দেন। ১৪ অক্টোবর চার্লি কোম্পানি খাজুরী চা বাগানে রেইড করে ফ্যাক্টরি ধ্বংস করে। ১৯ তারিখে দিনের বেলা আমি একটি ছোট গ্রুপ নিয়ে চম্পারায় চা বাগানে প্রবেশ করে মেশিন ঘরের ওপর রকেট লঞ্চার দিয়ে ফায়ার করি, কিন্তু গোলা ফাটেনি। বাধ্য হয়ে এক্সপ্লোসিভ লাগিয়ে মেশিনের কিছু অংশ উড়িয়ে দিলাম। সিলেট অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা কিছুটা ঝিমিয়ে পড়েছিল ইতোমধ্যে। জনগণের মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা তৎপরতা আরো জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিই। শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনে পাকবাহিনীর ক্যাম্পের ওপর রেইড করার

সিদ্ধান্ত এবং আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি গ্রহণ করি। সীমান্ত পেরিয়ে দীর্ঘ কয়েক মাইল পথ চা বাগানের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করতে হবে আমাদের। সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলে আগে কখনো আসিনি, চা বাগানও প্রথমবারের মতো দেখতে পেলাম। পাহাড়ি এলাকার চা বাগানের প্রাকৃতিক দৃশ্য সত্যিই মনোরম, যদিও যুদ্ধপরিস্থিতির কারণে সে দৃশ্য উপভোগ করার মানসিকতা আমাদের কারুর ছিল না। গেরিলা তৎপরতার জন্য চা বাগান আদর্শ এলাকা। মুক্তিযুদ্ধের ফলে বহু চা বাগান অব্যবহৃত জঙ্গলে পরিণত হয়েছে, জনমানবের তেমন সাড়া নেই।

বাগানের চারা গাছের গোড়ার দিকটা যথেষ্ট পরিষ্কার, শুয়ে বিশ্রাম করা কিংবা লুকিয়ে চলাফেরা করার জন্য সুবিধাজনক। এ অঞ্চলে যাতায়াতের জন্য স্থানীয় গাইড প্রয়োজন হয় এবং বাগানের শ্রমিকরাই এ কাজে পটু। শ্রীমঙ্গল যাওয়ার জন্য হরি নামে পাত্রখোলা বাগানের একজন শ্রমিককে জোগাড় করলাম। শীর্ণদেহ, কোঁকড়া চুল, বোকাসোকা চেহারা, মুখে শিশুর মতো মিষ্টি হাসি লেগেই আছে। মার্চের ক্র্যাকডাউনের পরই গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে এসে শরনার্থী শিবিরে মানবেতর জীবনযাপন করছে। শত্রুকবলিত এলাকায় গাইডের কাজ খুবই বিপজ্জনক। মাত্র কিছুদিন আগেই আমাদের আলফা কোম্পানির সঙ্গে গাইডের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে গুতনাবের নামে এক শ্রমিক শত্রুর গুলিতে নিহত হয়েছে। হরিকে শ্রীমঙ্গলে গাইড হিসেবে যাওয়ার কথা বলতেই নির্দ্বিধায় রাজি হয়ে গেল।

অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে এক বিকেলে শ্রীমঙ্গলে রেইডের উদ্দেশে যাত্রা করলাম, সঙ্গে একটি প্লাটুন (৩৫ জন) ও ডাক্তার মুজিব। দু'টি ৩ ইঞ্চি মর্টার নিলাম। সীমান্ত পেরুনোর আগে খবর এল, হরির আসন্নপ্রসবা স্ত্রী খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তার মুজিবকে সঙ্গে নিয়ে হরিকে তার স্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। ঘন্টাখানেক পর ডাক্তার এসে জানাল, হরির স্ত্রী একটি মৃত সন্তান প্রসব করে মারা গেছে, বেচারির ভাগ্যে কিছুদিন ধরে ওষুধপত্র জোটেনি। শুনে দুঃখ পেলাম। অপারেশন সম্পন্ন করার ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন হলাম, কারণ হরির সাহায্য ছাড়া বাগানের ভেতর দিয়ে শ্রীমঙ্গল যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আবার তার মানসিক অবস্থার কারণে আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুরোধও করা যাচ্ছে না। আধঘন্টা পর হরি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম এবং শ্রীমঙ্গল যাওয়ার জন্য অন্য কোনো গাইড পাওয়া যাবে কিনা জিজ্ঞাস করলাম।

চোখ মুছতে মুছতে সে জবাব দিল, 'সাব, চিন্তা করইন্না যেন। বউ মরছে তো কিতা অইচে। আমি আফনারারে লইয়া যাইমু শ্রীমঙ্গল।'

এই অশিক্ষিত শ্রমিকের দৃঢ়তায় অবাক হলাম, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। তার সাহায্যে অন্ধকার রাতে চা বাগানের ভেতর দিয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমরা শ্রীমঙ্গল রেলস্টেশনে অতর্কিত হামলা চালিয়ে নির্বিঘ্নে ফিরে এলাম। ক্যাম্পে ফিরে এসে হরি চলে গেল অজানার উদ্দেশ্যে, আর কোনো পিছুটান নেই তার। তাকে অনুরোধ করলাম আমাদের সঙ্গে থেকে যেতে, কিন্তু কোথায় যেন চলে গেল। আর কখনো দেখা হয়নি চা বাগানের সেই 'কুলি'র সঙ্গে। 'তুমি কেমন আছ বন্ধু, বেঁচে আছ তো ভাই'?

হরি, চৌগাছার আলী মিয়া ড্রাইভার, বেনাপোলের তোতা এদের কাছে স্বাধীনতার অর্থ কী? এরা কি জানে দেশ স্বাধীন হলে তাদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না? কিসের নেশায় এই অশিক্ষিত গ্রামীণ কিশোর-যুবকরা জীবন বিপন্ন করে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে আমাদের তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে? মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেরই রাজনৈতিক আদর্শ সম্পর্কে তেমন চেতন ছিল না, তারা কোনো তন্ত্রমন্ত্রের ধার ধারতো না। তাদের কাছে দেশ ও জনগণের স্বার্থে অস্ত্র তুলে নেয়া এবং জীবন উৎসর্গ করা ছিল এক নিতান্ত কর্তব্য, যা তারা হাসিমুখে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে করে গেছে। মা-বোনের আব্রু রক্ষার লড়াইকে তারা জ্ঞানপাপী কাপুরুষদের মতো দুই কুকুরের লড়াই বলে ভাবেনি।

এ অঞ্চলে পাকবাহিনীর সবচেয়ে দুর্ভেদ্য ঘাঁটি ধলই বিওপি। এখানে পাক নিয়মিত বাহিনীর প্রায় দুই কোম্পানি সৈন্য দীর্ঘদিন ধরে শক্ত রক্ষণব্যূহ গড়ে তুলেছে। কামালপুরের মতো এখানেও রয়েছে কাঁটাতার, মাইনফিল্ড এবং কংক্রিট বাঙ্কার। পাকসেনারা জানে, রক্ষণব্যূহ ছেড়ে বের হলেই বিপদ, বাইরে তাদের কোনো আশ্রয়স্থল নেই, স্থানীয় জনগণ তাদের শত্রু। তাই জীবনপণ করে তাদের আমৃত্যু বাঙ্কারে লড়াই করে যেতে হবে। তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুন্দরভাবে ক্যামোফ্লেজ করে গোপন রাখা হত, সৈন্যসংখ্যা সম্পর্কে আমাদের মূল্যায়ন প্রায়ই সঠিক হতো না। ভারতীয় ৪ কোর কমান্ডার লে. জেনারেল সগৎ সিং আমাদের অনুরোধ করলেন ধলই বিওপি এলাকায় একটি আক্রমণ পরিচালনা করার জন্য। তিনি সম্ভবত পাকবাহিনীর বাঙ্কারগুলোর অবস্থান এবং রক্ষণব্যূহের ব্যাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন। আমরা পরিকল্পনা করলাম, চার্লি কোম্পানি বিওপির একটি অংশে আক্রমণ চালাবে। আমি ব্রাভো কোম্পানি নিয়ে সীমান্তের কয়েক মাইল অভ্যন্তরে ধলইয়ের পেছনে পাত্রখোলা চা বাগান এলাকায় অবস্থান নেবো। আমার অবস্থানের উত্তরে ডেল্টা কোম্পানি পাকা সড়কের ওপর অবস্থান নেবে। আমাদের দায়িত্ব ধলই থেকে পশ্চাদপসরণরত পাকসেনাদের অ্যাম্বুশ করা এবং ধলইকে সাহায্যকারী সেনা দল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা।

২৮ অক্টোবর। পরিকল্পনা মোতাবেক আমি ব্রাভো কোম্পানি নিয়ে ধলইয়ের দু'মাইল পেছনে পাত্রখোলা চা বাগান এলাকায় প্রতিরক্ষাব্যূহ স্থাপন করি। সঙ্গে ক্যাপ্টেন মাহবুব। ক্যাপ্টেন পাটোয়ারীর নেতৃত্বে ডেল্টা কোম্পানি আমার অবস্থানের এক মাইল উত্তরে পাকা সড়কে ব্লকিং পজিশন স্থাপন করে। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে চার্লি কোম্পানি ক্যাপ্টেন নূরের নেতৃত্বে ধলই বিওপির একটি অংশে আক্রমণ চালায়। পাকবাহিনী তাদের শক্ত বাঙ্কার থেকে এই আক্রমণ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিরোধ করে। এই লড়াইয়ে নায়েব সুবেদার ইব্রাহিম, ইউসুফ, হাবিলদার সোবহানসহ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। এক পর্যায়ে শত্রুপক্ষ চার্লি কোম্পানির ওপর পাল্টা আক্রমণ পরিচালনা করে। সিপাই হামিদুর রহমান একটি মেশিনগান থেকে অবিশ্রান্ত গুলিবর্ষণ করে শত্রু সৈন্যদের ঠেকিয়ে রাখে এবং এভাবে একটি প্লাটুনকে পিছিয়ে আসার সুযোগ করে দেয়। বেশ কিছু শত্রুসেনা নিহত হয় তার গুলিতে, কিন্তু অসামান্য বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে এক পর্যায়ে এই তরুণ সৈনিক মৃত্যুবরণ করেন। তাকে সর্বোচ্চ সাহসিকতার পুরস্কার 'বীরশ্রেষ্ঠ' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

পাত্রখোলায় আমরা রুদ্ধশ্বাসে ধলই থেকে বের হয়ে আসা শত্রু সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি, কিন্তু কারো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। আমার সঙ্গে বেতার সেটসহ রয়েছেন ভারতীয় গোলন্দাজবাহিনীর ফরওয়ার্ড অবজার্ভেশন অফিসার মেজর চৌধুরী। উড়িষ্যা রাজ্যের অধিবাসী তিনি-শান্তশিষ্ট, অমায়িক ব্যক্তিত্ব। তার দায়িত্ব শত্রু সৈন্যের তৎপরতা দেখা গেলেই বেতার সেটে গান পজিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে, ম্যাপ রেফারেন্স পাঠিয়ে শত্রুর ওপর কামানোর গোলা নিক্ষেপ করা। তার সঙ্গে ভারতীয় বাহিনীর জনাপঁচিশেক সৈনিকের একটা 'ডিটাচমেন্ট' রয়েছে। আমরা সবাই দু'দিন পাত্রখোলা অবস্থানে থাকার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছি, সঙ্গে চিঁড়া-গুড় ইত্যাদি শুকনো খাবার।

চার্লি কোম্পানির আক্রমণের পর বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হলো, আমার রক্ষণব্যূহের সামনে কোনো জনপ্রাণীর দেখা নেই। ক্যাপ্টেন মাহবুবকে পাঁচজন সৈনিকসহ পাঠালাম ধলইয়ের দিকে শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার জন্য। আধঘন্টা পর গুলির শব্দ শোনা গেল। ক্যাপ্টেন মাহবুব এগিয়ে যায় এবং দূরে কালো পোশাকধারী সৈনিক দেখতে পেয়ে একটি ব্রিজের আড়ালে পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। জনাদশেক শত্রু কাছে আসা মাত্র তার লাইট মেশিনগান গর্জে ওঠে এবং ছ'জন ঘটনাস্থলেই নিহত হয়। বাকি সবাই উল্টোদিকে পালিয়ে যায়। একজন বয়স্ক সুবেদার আহত হয়ে কাতরাতে থাকে, আমাদের সৈনিকরা তাকে বহন করে পাত্রখোলায় নিয়ে আসে। আহত পাঠানের নামটি সুন্দর, গুল চমন (বাগানের ফুল)। দেখতে রোগাপটকা, মাথার চুল সব শাদা হয়ে গেছে। প্যারা মিলিটারি ইউনিট ফন্ট্রিয়ার কনেস্টবুলারির সুবেদার। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার অবস্থা সংকটাপন্ন। তাকে ফার্স্ট এইড দেয়া হলো। জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলাম, মাত্র কয়েকদিন আগেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে আনা হয়েছে তাদের।

যুদ্ধে এটাই তাদের প্রথম অভিজ্ঞতা। চার্লি কোম্পানির আক্রমণকালে কামানের গোলার শব্দে তারা ভয় পেয়ে প্রতিরক্ষা অবস্থান ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করে এই বিপদ ডেকে এনেছে। আমার প্রশ্নের উত্তরে সে বারবার প্রাণভয়ে উর্দুতে বলছে, "জয় বাংলা, দোয়া করি বাংলাদেশ স্বাধীন হোক।" ঘন্টাচারেক পর তার মৃত্যু হয়। ১২ হাজার মাইল দূরে জন্ম নেওয়া পাহাড়ি ফুল সিলেটের চা বাগানে বেঘোরে ঝরে গেল! বেচারার প্রতি মায়া জন্মে গিয়েছিল কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে। বিকেলের দিকে ডেল্টা কোম্পানির ওপর শত্রুর এক কোম্পানি আক্রমণ চালায় মহাসড়কে সৃষ্ট প্রতিবন্ধক সরাবার উদ্দেশ্যে। ক্যাপ্টেন পাটোয়ারী বেতারে মেজর চৌধুরীর কাছে কামানের গোলা ফেলার অনুরোধ করতেই তিনি মহা উৎসাহে গান পজিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে গোলা ফেলতে লাগলেন। শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা হলেও, তাদের অধিনায়ক একজন ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ৪০ জন হতাহত হয়। রাতে পাকসেনারা বের হয় না, কাজেই রাতটি নির্ঝঞ্ঝাটে কেটে গেল।

২৯ অক্টোবর, আমার জন্মদিন। ট্রেঞ্চে বসে একথা মেজর চৌধুরীকে জানাতেই বললেন, "হ্যাপি বার্থডে।"

"ধন্যবাদ, দোয়া করবেন জন্মদিন যেন মৃত্যুদিনে পরিণত না হয়।"—আমার জবাব। উভয়ের সম্মিলিত হাসি। দু'মুঠো চিঁড়া, একটু গুড় আর পাহাড়ি নালার পানি দিয়ে জন্মদিনের ব্রেকফাস্ট সারলাম দু'জনে। এক চিমটি লবণ থাকলেই এটাকে ওরস্যালাইন ব্রেকফাস্ট বলা যেতো!

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জাঠ ব্যাটালিয়নের দু'টি কোম্পানি ধলই বিওপি এলাকায় কামানের সাপোর্ট নিয়ে আক্রমণ চালায়। পাকিস্তানিরা মরিয়া হয়ে এই আক্রমণ সফলভাবে প্রতিরোধ করে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে ভারতীয় বাহিনীর একজন মেজর ও দু'জন লেফটেন্যান্টসহ প্রায় ৫০ জন নিহত হন। আরো জনাষাটেক আহত হয় মারাত্মকভাবে।

আমাদের কোম্পানিগুলো এবং ভারতীয় বাহিনী বেতার সেটে একই ফ্রিকোয়েন্সিতে ছিল। আক্রমণের শুরু থেকেই বেতারযন্ত্রের হ্যান্ডসেটে কান লাগিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের কমান্ডারদের কথোপকথন মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। এক পর্যায়ে কথোপকথন হচ্ছিল ভারতীয় বাহিনীর ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার ইয়াদব এবং জাঠ ব্যাটালিয়নের সিও লে. কর্নেল দালালের মধ্যে। ব্রিগেড কমান্ডার রিজার্ভে রাখা দুটি জাঠ কোম্পানি নিয়ে পাক অবস্থানে আক্রমণ করার নির্দেশ দিলেন কমান্ডিং অফিসারকে। কিন্তু সিও এই নির্দেশ অমান্য করলেন। ইংরেজি ভাষায় তাদের বাক্যালাপ এভাবে চলছিল-

'দালাল, তুমি দু'টি কোম্পানি নিয়ে এখনই আক্রমণ চালাও', ব্রি. ইয়াদব।

'দুঃখিত, আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার দু'টি কোম্পানি ইতোমধ্যেই ধ্বংশ হয়ে গেছে। বাকি দু'কোম্পানি নিয়ে ওদের শক্ত ঘাঁটি দখল করা অসম্ভব', লে. কর্নেল দালাল।

'আমি তোমাকে মিলিটারি অর্ডার দিচ্ছি, আক্রমণ চালাও। অবাধ্য হলে তোমাকে কোর্ট মার্শাল করা হবে', ইয়াদব।

'আমার পক্ষে আমার প্রিয় সৈনিকদের নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া সম্ভব নয়। তাদের সাফল্যের ন্যূনতম সম্ভাবনাও নেই। আমি শাস্তির জন্য প্রস্তুত আছি', দালাল।

'তুমি ভয় পেয়েছ চিকেন। জাঠ ব্যাটালিয়নের একশ' বছরের সাহসিকতা ও গৌরবময় ঐতিহ্য তুমি ধুলায় লুটিয়ে দিও না। ফর গড্স সেক, আক্রমণ করো', ইয়াদব।

'আক্রমণ আমি নিশ্চয় করব, তবে আজ নয়। আমাকে আরো সৈন্য দিতে হবে। আমি দুঃখিত', দালাল অনড় রইলেন।

উভয়ের কথায় যুক্তি ছিল, একদিকে অমোঘ সামরিক নির্দেশ, অপরদিকে অধীনস্থ শত শত সৈনিকের নিশ্চিত মৃত্যু। মনে দাগ কাটার মতো বিরল কথোপকথন!

দুপুরের দিকে আমার অবস্থানের সামনে বেশ দূরে শত্রু সৈন্যদের তৎপরতা দেখা গেল। আমার আন্ডার কমান্ড মেজর চৌধুরীকে গোলা ফেলার নির্দেশ দিলাম। প্রচন্ড শব্দে কয়েকটি গোলা শত্রুর কাছাকাছি পড়তেই তারা রণে ভঙ্গ দিল। কামানের গোলার সাহায্যে শত্রুর ওপর মরণআঘাত হানতে পারা আমার মতো পদাতিক সৈনিকের জন্য অত্যন্ত সুখকর অভিজ্ঞতা!

সন্ধ্যার পর অধিনায়ক মেজর জিয়াউদ্দিন নির্দেশ দিলেন আমাদের ফিরে আসার জন্য। ব্রাভো ও ডেল্টা কোম্পানি চা বাগানের পথ ধরে গভীর রাতে ফিরে এল। আমার লিখিত সুপারিশে মেজর চৌধুরীকে ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ 'বীরচক্র' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১ নভেম্বর। আজ আমাদের ব্যাটালিয়ন মোহনপুর সীমান্তে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ভোরের আলো ফুটতেই আমাদের অবস্থানের ওপর দিয়ে গিয়ে দু'টি ভারতীয় ব্যাটালিয়ন (জাঠ ও রাজপুতনা রাইফেলস) ধলই বিওপি এলাকায় পাকবাহিনীর ওপর কামানের সহায়তা নিয়ে আক্রমণ করে। কোর কমান্ডার লে. জেনারেল সগৎ সিং আমাদের অবস্থানে থেকে নিজে এই আক্রমণ পরিচালনা করেন।

প্রায় আটঘণ্টা ধরে তুমুল যুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষের কামানের গোলার শব্দে চারদিক প্রকম্পিত হতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে ভারতীয় বাহিনী পাক অবস্থানের অর্ধেক অংশ দখল করে, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই পেছনে হটা পাকবাহিনী সংগঠিত হয়ে কাউন্টার অ্যাটাক করে আবার হারানো এলাকা কব্জা করে নেয়। শেষ অবধি সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ভারি কামানের সংখ্যাধিক্যতার জোরে ভারতীয় বাহিনী ধলই এলাকা দখল করে এবং পাকিস্তানি বাহিনী নির্মূল হয়। ভারতীয় বাহিনী প্রশংসনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করলেও অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে এই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে। দু'দিন আগে বেতার সেটে কথোপকথনকালে ব্রিগেডিয়ার ইয়াদব কর্নেল দালালকে একশ বছরের পুরনো জাঠ ব্যাটালিয়নের কলঙ্ক বলে উল্লেখ তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লেগেছিল। এ যুদ্ধে দালাল সাহসের সঙ্গে লড়াই করে আহত হন এবং নেতৃত্বের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ব্রিগেডিয়ার ইয়াদবও যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। তুমুল গোলাগুলি উপেক্ষা করে তাকে আমাদের একটি প্লাটুন আহত অবস্থায় উদ্ধার করে নিয়ে আসে। লে. জেনারেল সগৎ সিং আমার প্রতিরক্ষা অবস্থানে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনাকালে আমাদের সৈনিকদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ফ্লাক্স হাতে দাঁড়ানো এডিসি তাকে চা ঢেলে দিলে জেনারেল আগে ক্যাপ্টেনকে (অর্থাৎ আমাকে) চা অফার করে বলেন, "Son, you are going to be part of history".

দু'টি ব্যাটালিয়নের আক্রমণে কোর কমান্ডারের আগমনের প্রয়োজন পড়ে না। তবুও এই অভিযানে সব পদমর্যাদার অফিসারই সাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। ভারতীয় বাহিনীর দু'জন কোম্পানি কমান্ডার নিহত এবং দু'জন আহত হন। গোলন্দাজ বাহিনীর একজন মেজরও নিহত হন এই ভয়াবহ সংঘর্ষে। সিও এবং ব্রিগেড কমান্ডারের বেতার কথোপকথনের স্মৃতি বারবার মনের পর্দায় ভেসে উঠেছিল। সমরবিদ্যায় একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে, "সেনাবাহিনী ঐতিহ্যের ওপর ভর করে লড়াই করে।" ধলইয়ের যুদ্ধে এরই বাস্তবায়ন দেখতে পেলাম। ধলইয়ের পতনের পর আবার আমবাসায় ফিরে এলাম কিছুদিন বিশ্রামের জন্য। ৭ নভেম্বর জিয়াউর রহমান এলেন আমাদের পল্টনে, তাকে লে. কর্নেল পদে প্রমোশন দেয়া হয়েছে। তিনি জানালেন, কয়েকদিন আগে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল ধামাই চা বাগান এলাকায় পাকবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। তরুণ ক্যাডেট এমদাদ অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে

শহীদ হয়েছেন সেখানে। যুদ্ধের প্রথম দিকে সে কাকুল মিলিটারি একাডেমি থেকে আরেকজন ক্যাডেট মুদাচ্ছেরকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলো। শত্রু এলএমজি-র বার্স্ট শরীরে বিদ্ধ হওয়ার পরও সে ট্রেঞ্চে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে এলএমজি-কে নিস্তব্ধ করে দেয়। এই দুঃসাহসী সদাহাস্যময় যুবকের মৃত্যুতে মন বিষাদে ছেয়ে গেল।

১১ নভেম্বর। সীমান্তের আট মাইল অভ্যন্তরে নূরজাহান চা ফ্যাক্টরি এলাকার উত্তরে পাকবাহিনীর চলাচলের পথে অ্যাম্বুশ (ফাঁদ) পাতলাম, সঙ্গে একটি প্লাটুন ফ্লাইং অফিসার লিয়াকত ও ডা. মুজিব। ছয় ঘন্টা অপেক্ষা করার পরও শত্রুর দেখা নেই, সম্ভবত আমাদের অবস্থানের খবর তাদের কাছে পৌঁছে যাওয়াতেই এমনটা ঘটেছে। ফেরার পথে আমরা নূরজাহান চা ফ্যাক্টরিতে আগুন ধরিয়ে দিলাম। ওই রাতেই জানলাম আগামীকাল ঈদুল ফিতর। ঈদের দিন সকালে সীমান্ত এলাকায় টিলার ওপর সারিবদ্ধভাবে ঈদের জামাতে দাঁড়ালাম আমরা অর্থাৎ পুরো ব্যাটালিয়ন। ঈদগাহ বলতে চারদিকে জঙ্গলবেষ্টিত একটা অসমতল মাঠ। ঈদের পোশাকের পরিবর্তে পরনে ইউনিফরম, পাশে শুয়ে রাখা অস্ত্র-স্টেন, রাইফেল ইত্যাদি। নামাজরত অবস্থায় নীরবে অশ্রুবর্ষণ করছিল সবাই, মোনাজাতের পর কোলাকুলির সময় শুরু হলো সশব্দ ক্রন্দন। পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজনের কথা সবার মনে পড়ছে আজ। ফেলে আসা দিনগুলোতে পারিবারিক পরিবেশে উদযাপিত ঈদের স্মৃতি মনে জেগে উঠার কারণে এদিন কেউ অশ্রুসংবরণ করতে পারেনি। আমরা কোথায়, পরিবার কোথায়, কেউ জানে না। বিপদসংকুল বর্তমান আর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সবাই বিহ্বল হয়ে পড়ি। যুদ্ধেক্ষেত্রে মারণাস্ত্রের ছোবলের মুখে যারা নিঃশঙ্ক নির্বিকার, সেই অসম সাহসী যোদ্ধারা শিশুর মতো কাঁদছে! জাতি কি এদের কথা মনে রাখবে? স্বাধীন দেশ নাকি জীবিত গেরিলা চায় না। আমরা একে অন্যকে সান্ত্বনা দিলাম। অশ্রুসিক্ত চোখে অপরকে বলছি, কাঁদার কি আছে? কী মুশকিল, কাঁদছিস কেন? সুবেদার ফয়েজ এসে বলল, "স্যার দুদিনের ছুটি চাই। বউ আর ছোট ছেলেটাকে বিলোনিয়াতে রেখে এসেছি অনেকদিন হলো। একটু দেখে আসি, যাব আর আসব"। "ঠিক আছে, যাও তুমি", জানালাম।

কৃতজ্ঞতার হাসি উপহার দিয়ে, চোখ-মুখে বিদায় নিল ফয়েজ। ২২শে অক্টোবর মুক্তিবাহিনী এবং মিত্রবাহিনী সম্মিলিতভাবে পাকবাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। এ দিন মিত্রবাহিনীর ৪/৫ গোর্খা ব্যাটালিয়ন সিলেট জেলার আটগ্রাম শত্রুঘাঁটি আক্রমণ করে পাকবাহিনীকে উৎখাত করে। আমার নেতৃত্বে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের ব্রাভো কোম্পানি চারগ্রাম আক্রমণ করে দখল করে নেয়। প্রচুর গোলাবারুদ আমাদের হস্তগত হয় এবং থাল স্কাউটের (প্যারামিলিটারি ফোর্স) কয়েকজন সৈনিকও আমাদের হাতে বন্দি হয়। ২৮শে অক্টোবর গোরীপুরে পাকবাহিনীর ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের দু'টি কোম্পানি আমাদের আলফা কোম্পানির ওপর আক্রমণ করে। তাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। শত্রুপক্ষের পঞ্চাশজন নিহত হয় এবং পঁচিশজন পাঞ্জাবি সৈনিক আলফা কোম্পানির হাতে জীবিত অবস্থায় বন্দি হয়। আমাদের আলফা

কোম্পানি কমান্ডার মাহবুবুর রহমান শত্রুর গোলার আঘাতে শহীদ হন। এরপর থেকে শত্রু সিলেট শহরের দিকে পশ্চাদপসারণ শুরু করে এবং আমরা তাদের অবস্থানকে বাইপাস করে চা বাগানের জঙ্গলাকীর্ণ পথ ধরে সিলেট শহরের দিকে অগ্রসর হতে থাকি (Infitration-এর মাধ্যমে)। ১৩ই ডিসেম্বর আমরা সিলেট শহরে প্রবেশ করি। সূর্যোদয়ের অব্যবহিত পরেই এমসি কলেজের সন্নিকটে উঁচু টিলায় আমরা অবস্থান নিলে পাকবাহিনীর এক কোম্পানি সৈন্য আমাদের ব্রাভো কোম্পানির ওপর আক্রমণ চালায়। তাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং প্রায় চল্লিশজন নিহত হবার পর তারা রণে ভঙ্গ দেয়।

১৫ই ডিসেম্বর বিকেলেই তারা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিলে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিনাবাধায় সিলেট শহরে প্রবেশ করে। এভাবেই সাফল্যমন্ডিত হয় একাত্তরের জনযুদ্ধের এক গৌরবময় অধ্যায়।

রচনাকাল ১৯৯৭

এই বাংলা, বাংলার মুখ

মাহবুব আলম

এলাকাটা পঞ্চগড়। জুলাই-আগস্ট মাস।

নদীটা পশ্চিম দিক থেকে এখানে এসে বাঁক নিয়েছে দক্ষিণমুখী হয়ে। সেই বাঁক খাওয়া জায়গাটিতেই গড়ে উঠেছে ফ্রন্ট লাইন বা অগ্রবর্তী ঘাঁটি। তিনটি প্লাটুনের অবস্থান এখানে। এফএফ প্লাটুন একটি, দুটি এমএফ প্লাটুন। মূল ডিফেন্স লাইন পেছনে। প্রায় আধা মাইল। সেখানে অবস্থানরত তিনটি কোম্পানি থেকে বাছাই করে ফ্রন্ট লাইনে পাঠানো হয়েছে দল তিনটিকে। উদ্দেশ্য পরিষ্কার। নদীর ওপারই শত্রুর অবস্থান। তাদের সঙ্গে মুখোমুখি থেকে লড়ে যেতে হবে নিয়মিত। তারা যাতে নদী পার হতে না পারে, সেটা দেখতে হবে। তাদের অগ্রাভিযান ঠেকাতে হবে। পেছনে সজাগ ডিফেন্স লাইন। সামনের ফ্রন্টকে প্রয়োজনে সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে আসবে। শত্রু দ্বারা আক্রান্ত এবং তছনছ হয়ে গলে মূল ডিফেন্স লাইন তখন পুরোদমে সক্রিয় হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। মোট কথা কোনো অবস্থাতেই তাদের আর এগুতে দেয়া হবে না। এই ডিফেন্স লাইন ভেঙে গেলেই শত্রুর জন্য তেঁতুলিয়া পৌছতে অসুবিধা হবে না। তেঁতুলিয়া থানা এখন পর্যন্ত মুক্ত রয়েছে। সেটা কোনোভাবেই শত্রুর পদানত হতে দেয়া যাবে না।

এই রণকৌশল নিয়ে বর্তমানে মুক্তিযোদ্ধাদের ভজনপুর-দেবনগর-মাগুরা ডিফেন্স লাইন গড়ে উঠেছে। প্রলম্বিত যুদ্ধে আটকে গেছে পাকবাহিনী। অগ্রবর্তী দল তিনটিকে এই যুদ্ধে মূল ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে।

নদীর এপারটা খাড়া। চড়া ভূমি ওপারে। ছোট নদী। নাম চোয়াই। ভারতের জলপাইগুড়ি হয়ে অমরখানায় বাংলাদেশে ঢুকেছে নদীটি পশ্চিম থেকে এসে। তারপর কিছুটা এগিয়ে এসে খাড়া বাঁক নিয়ে চলে গেছে দক্ষিণমুখী। সামনে কোথাও মিশেছে গিয়ে করতোয়ার সঙ্গে। পাহাড়ি নদী। এমনিতে তেমন পানি থাকে না। হাঁটু জল, কোমর জল। বর্ষায় পাহাড়ি ঢল এলেই হঠাৎ নদীর পানি ফুলে ওঠে। প্রবল স্রোতস্বিনী ধারা নিয়ে নদী তখন প্রচন্ড গতিময়তায় প্রবহমান থাকে। চড়াভূমি ডুবিয়ে দিয়ে অনেকটা বন্যার রূপ নেয়।

এসব শোনা কথা। নদীটি এখনো তেমন রূপ ধারণ করেনি। যদিও ভরা বর্ষা চলছে। নদীর এপার-ওপার হতে তেমন কোনো অসুবিধা নেই। মূল সড়কপথ ধরে শত্রু প্রথমদিকে ক'বার তেঁতুলিয়ার দিকে এগুনের চেষ্টা করেছে। পারেনি। শক্ত

ডিফেন্স লাইন ভজনপুর। সেখানে বাধাগ্রস্ত হয়ে ফিরে এসেছে। এখন তাদের প্রচেষ্টা পাকা সড়ক বাদ দিয়ে এই গ্রামীণ এলাকা ধরে এগুনোর। কিন্তু বাধা এই নদীটি। সেটাও তেমন বড় কোনো বাধা ছিল না। এক রাতে ভরা বর্ষা মাথায় নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের তিনটি দল হঠাৎ করে এখানে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। প্রথমে এটা তাদের নজরে আসেনি। যখন এসেছে, তখন নাকের ওপর মাছি বসার মতোই বিরক্তিকর মনে হয়েছে তাদের কাছে। আর তাই এখন তাদের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে নদীর বাঁকটিতে ঘাপটি মেরে বসে থাকা মুক্তিযোদ্ধার দলটিকে উৎখাত করে তা দখলে নিয়ে নেয়া। কৌশলগত দিক দিয়ে সেটা দখল করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্যই তাদের নিয়মিত এগিয়ে আসার প্রচেষ্টা। আর সেই প্রচেষ্টার মুখে প্লাটুন তিনটির সদা সতর্ক অবস্থান। খাড়া পাড় থেকে বিশ-পঁচিশ গজ দূরুত্ব রেখে গড়ে তোলা হয়েছে ফ্রন্ট। ট্রেঞ্চ-বাঙ্কারের সারি। পেছন দিয়ে চলাচল করার জন্য বুক সমান উঁচু ক্রলিং ট্রেঞ্চ। কিন্তু এখন তা পানিতে টইটুম্বুর। বাঙ্কার-ট্রেঞ্চগুলোও প্রায় সয়লাব। ছেলেদের প্রাণান্তকর চেষ্টা সেগুলো শুকনো রাখার ব্যাপারে। বৃষ্টির ছাঁট অনবরত ভিজিয়ে দেয়। মেঝেতে পানি জমে যায়। একজন রাইফেল নিয়ে ভিজে পানি-কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্যজন অনবরত পানি ছেচে চলে। বাদলাদিন সব প্রকৃতির মতো এই ফ্রন্টবাসীদেরও ভিজিয়ে চলছে অনবরত।

এর মধ্যে সেন্ট্রি ডিউটি চলছে। পেট্রল ডিউটি। পর্যবেক্ষণ দল গেছে তাদের পোস্টে। প্রতি পোস্টে ছেলেরা রয়েছে সজাগ-সতর্ক। কিন্তু এই ঝমঝম বাদল বরিষণে সবার মধ্যেই কিছুটা আলস্যভাব আসে। কিছুটা ঢিলেঢালা ভাব সব ফ্রন্ট লাইনকেই গ্রাস করে রাখে।

কিন্তু হঠাৎ পর্যবেক্ষণ পোস্টের দিক থেকে গুলির শব্দের মতো কিছু একটা শুনতে পায় সেন্ট্রি পোষ্টে দাঁড়ানো ছেলে পহর আলী। ঝরঝর বৃষ্টির শব্দের মধ্যে ভালোভাবে কিছু বোঝা যায় না। কিছুটা এগিয়ে যায় সে সামনের দিকে। পরপর আরো কয়টি গুলির শব্দ। এবার সব ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে ওঠে তার। পর্যবেক্ষণ মিশন থেকে গুলির সিগন্যাল! তার মানে, তারা শত্রুকে আসতে দেখেছে। সবাইকে সজাগ করা দরকার এবং দ্রুত। এই বোধ থেকে পহর আলী নদীর ওপার লক্ষ করে গুলি ছুড়তে ছুড়তে দৌড়াতে থাকে আর ফ্রন্টবাসীদের উদ্দেশে চিৎকার করে বলতে থাকে, হুশিয়ার, সাবধান, খানের দল আসতেছে, গুলি ছোড়েন ...!

মালেক-মঞ্জুর সিগন্যাল পহর আলীর মাধ্যমে জেনে যায় সবাই। হঠাৎ করেই এলোমেলো-হুড়োহুড়ি অবস্থা সৃষ্টি হয়। এর মধ্যেই যে যার মতো অবস্থান থেকে নদীর ওপারে থাকা শত্রুর উদ্দেশে গুলিবর্ষণ শুরু করে। পেছনের ফ্রন্ট লাইনও জেগে ওঠে। নদীর ওপারে ছড়িয়ে পড়ে শত্রু। তাদের গুলি ছুটে আসতে থাকে একনাগাড়ে। ধমাধম শুরু হয় আর্টিলারি শেষ বর্ষণ। বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ। গগনবিদারী শব্দ। নদীর এপার-ওপার মিলে শুরু হয় ধুন্ধুমার যুদ্ধ। উত্তরাঞ্চলের পঞ্চগড় সেক্টরে একাত্তরের জুলাইয়ের শেষ দিনে শুরু হয় আর একটা মরণপণ লড়াই।

দুলু সেই যে এলো, থেকেই গেল স্থায়ীভাবে। এখন তার যাওয়ার উপায় নেই। যদিও পিছুটান প্রচুর। যুদ্ধের উদ্দাম জীবনটাকে সে পছন্দ করে ফেলেছে। এখানে

রোদন-ভরা বসন্ত আছে। খোল খোল দ্বার আছে। আগুন জ্বালো আগুন জ্বালো আছে। আছে তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা। শেকল ভাঙার গান আছে। ও আমার দেশের মাটি আছে। আছে আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি। আর আছে পিন্টু। যখন-তখন তার স্টেনগানটা গিটার হয়ে যায়। আর খোলা প্রান্তরে উদ্দাম গলায় সে গান করে। আনন্দ-বেদনার, ভালোলাগা ভালোবাসার, দুঃখ জাগানিয়ার।

আর সঙ্গে যোগ হয়েছে দুলু। অফুরন্ত প্রাণশক্তি। সদা হাস্যরসিক। রোমান্টিকতায় ভরপুর। জয়বাংলার জন্য নিবেদিত সাহসী যুবক। এ দু'জনে জমিয়ে রাখে অবকাশ-অবসরের নিজস্ব সময়গুলোতে। যুদ্ধের মাঠে এমনিতেই সময় পাওয়া যায় না। যে সময়টা তবুও বের হয় তা নিংড়ে নিয়ে উপভোগ করে ছেলেরা। পিন্টু দুলুর সঙ্গে যোগ দেয়, মধুসূদন, মতিয়ার, খলিল ও মোসারফ পাগলা। একদল তাজা প্রাণের তরুণ যুবক।

–হাতিয়ার চালানো জানেন? রাইফেল?

–জি, ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের কলেজে কয়দিন ট্রেনিং নিয়েছিলাম।

–ওতেই চলবে।

দুলুর ইন্টারভিউ হয়ে যায়। ওকে রাইফেল দেয়ার নির্দেশ দিই। যুদ্ধক্ষেত্রে গুলি ছুড়তে ছুড়তেই রাইফেল চালানো শিখে যাবে। ইচ্ছা শক্তিটাই এখানে বড়। আর প্রয়োজন সাহসের। মনে হয় ওর দু'টোই আছে।

গৌরবর্ণ হালকা-পাতলা শরীর, লম্বাটে গড়নের হাস্যোজ্জ্বল যুবক। দু'গালের চোয়াল কিছুটা ভাঙা। তাকে বলি, রিচার্ড হ্যারিসন নাকি?

–কী যে বলেন!

–অভিনয় করেছেন কখনো?

–জীবনে একবার।

–গান?

–কিছু কিছু। তবে যুদ্ধের এই ডামাডোলের মধ্যে সব পালান দিছে।

–পালান দেয়ার পরও কিছুটা তো আছে? হোক দেখি!

পিন্টুকে ইশারা দিই। পিন্টু এগিয়ে আসর জমিয়ে বসে। দুলু গান ধরে, তুই ফেলে এসেছিস কারে মন ...।

বাইরে বৃষ্টি, তা ঝিরঝিরিয়ে বর্ষার বৃষ্টি। এই আসে, এই চলে যায়। কিছুক্ষণ আগেই টিনের চালে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ঝরছিল। আকাশ ভেঙে যেন বালতিতে পানি ঢেলে দিচ্ছিল কেউ। এখন তা নেই। ধরে এসেছে বৃষ্টি। এর মধ্যে মেঝের বিছানায় বসে দুলুর সুরেলা কণ্ঠে গান।

দুলু থামে, পিন্টু ধরে আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো। ওটা শেষ হলে দু'জনে একসঙ্গে ধরে, ও আমার দেশের মাটি ...। মতিয়ার উসখুস করতে করতে ভেতরগড় অপারেশন দখিলকৃত ভাঙা হারমোনিয়ামটা নিয়ে এসে যোগ দেয়। মিনহাজ পরিবেশন করে গরম চা আর পিঁয়াজি। জমে ওঠে মধুপাড়া হাইড-আউটের পরিবেশ। বাঁধনছাড়া উদ্দাম জীবন। হাস্যরস-কৌতুক আর আনন্দের হুল্লোড় তুলে তারুণ্যের বহিঃপ্রকাশ।

এখন যুদ্ধ নেই। অবসরের নিজস্ব সময় এটা। ইচ্ছা-খুশিমতো ছেলেরা এই সময়টা উপভোগ করে। শুধু একটাই বিধিনিষেধ। হাইড-আউটের বাইরে যাবে না কেউ।

–কি দুলু ভাই, আপনার নাকি জ্বর এসেছে?

–নাহ্। খানের দল আসার খবর পেয়ে জ্বরটা পালান দিছে।

'পালান দিছে' কথাটা হচ্ছে দুলুর মুদ্রোদোষের মতো। প্রতিটা প্রসঙ্গে এবং আলোচনার শেষে তার এই 'পালান দিছে' শব্দ দুটো থাকবেই। যেমন খানের দল আজ টিকতে না পেরে পালান দিছে। শান্তি কমিটির আনাজ চেয়ারম্যান জানের ভয়ে পালান দিছে। গাইড মতিন কাইলকার যুদ্ধে ভয় পাইছে আর পালান দিছে। এমনিভাবে বারবার তার পালান দেয়ার কথাটা এসে যায়। প্রথম দু'দিন ব্যাপারটা বোঝা যায়নি। তৃতীয় দিনে পিন্টু ব্যাপারটা ধরে ফেলে। আর হঠাৎ করেই তাকে বলে বসে, আপনিও কি পালান দেবেন?

–কী কহিলেন?

–এই যে পালান দেয়ার ব্যাপারটা আর কি!

–মানে?

দুলু আমার মুখের দিকে চায়। পিন্টুকে দেখিয়ে দিই আমি ইশারায়।

পিন্টু বলে, আপনার কথামতো সবাই তো পালান দিছে, আপনি কবে দেবেন সেটা আগেভাগে জানলে ভালো হতো না? এবার বুঝে ফেলে দুলু। রসিকতা। কিন্তু মুখ গম্ভীর করে বলে,

–আমি যাচ্ছি না।

–থেকেই যাবেন?

–হ্যাঁ।

–কিন্তু পিছুটান? মা-ভাইবোনরা? ওপারে শরণার্থী তারা। গার্জেন বলতে শুধু আপনি। ওদের কি হবে?

–ওরাও থাকবে। লক্ষ কোটি শরণার্থী। তাদের মাঝে ওরাও থাকবে। কিন্তু এই যুদ্ধ, দেশের জন্য এই কাজ করার সুযোগ আর তো পাব না।

–খারাপ কিছু হতে পারে। দুদিন আগে আব্বাস মারা গেল। গোলাম গউস মারা গেছে। আমি পরিস্থিতির গভীরতা বোঝাতে চাই।

দুলু বলে, তা হোক। কপালে থাকলে হবে। যুদ্ধের মাঝে থাকব। আর মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকবে না এটা কি হয়?

আমি বলি, জানেন তো চান্স ফিফটি ফিফটি। বাঁচা-মরার সম্ভাবনা সমান সমান। আপনার দিকে তাকিয়ে আছে ওপারে শরণার্থী মা-ভাইবোন-আত্মীয়রা। কীভাবে তারা বাধা দিচ্ছিল্ল, কাঁদছিল, যখন আসেন!

–রাখেন তো মেয়ে মানুষের প্যানপ্যানানি। ওরা অমন করবেই।

–তাহলে পালান দেবেন না?

–দূর!

–তবে তাই হোক। এখন তাহলে গান ধরেন।

ছোট একটা খাল। হাঁটু সমান স্রোতস্বিনী জলরাশি। দু'ধার উঁচু অসমতল। কাশবন, নলখাগড়া, জঙ্গুলে গাছ, বুনো ঘাসের ঝোপঝাড়। বিকেল ঘনিয়ে এসেছে। খালটা মাঝখানে রেখে দু'পাশের অবস্থান থেকে সারাদিন চলেছে যুদ্ধ। শত্রুরা একেবারে স্থির প্রতিজ্ঞ ছিল এপার আসবেই। দখলে নেবে আমাদের মধুপাড়ার হাইড-আউট। অন্তত তাদের মতিগতি তাই বলছিল। কিন্তু তা হয়নি বাস্তবে। দুলু গাইড করে এনেছে আমাদের এই কৌশলগত অবস্থানে। এখান দিয়েই তারা এগুতে চাইছিল। দুলুর সাহায্যে ঠিক সময়ে এই অবস্থানে না আসতে পারলে আজ হয়ত আর একটা ম্যাসাকার হতো। হয়নি। সারাদিন সমানতালে গুলিবিনিময় যুদ্ধের পর তারা হাল ছেড়ে পিছিয়ে গেছে। আজ আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। ওদের হয়েছে কি না জানা যায়নি।

শত্রু রণেভঙ্গ দিয়ে চলে যাওয়া মানে যুদ্ধ শেষ। অল ক্লিয়ার সিগন্যাল পেয়ে সবাই উঠে আসে। কাদা-বালিতে মাখামাখি। শরীরজুড়ে শ্রান্তি-ক্লান্তি। কাঁধে অস্ত্র ঝুলিয়ে তারা আসে। পরিত্যক্ত ছনের বাড়িটার সামনের ঘাসযুক্ত উঠানে তারা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে। তৃষ্ণার্ত এবং ক্ষুধার্ত তারা। জঙ্গলযুদ্ধে গেরিলা যোদ্ধাদের সহজে পানি বা খাবার পাওয়ার উপায় নেই। তারা টলতে টলতে আসে। ক্লান্তিতে-অবসাদে বসে পড়ে এদিক-সেদিক শুয়ে পড়ে। দুপুরের না-খাওয়ার খিদে এই শেষ বিকেলে এসে মরে গেছে। তবে তৃষ্ণার্ত সবাই। দুটো ৭.৬২ এমএম গুলির বাক্স খালি করা হয়। স্রোতস্বিনী পাহাড়ি খালের পানির মোটামুটি পরিষ্কার। তাই তুলে আনে ছেলেরা। বাক্সে মুখ লাগিয়ে খায়। হাইড-আউটের দূরত্ব প্রায় ৩-৪ মাইল। পেটে দানাপানি কিছু না দিয়ে এতদূর হেঁটে যাওয়া! যেতে তো হবেই। দুলুকে বলি,

–পারবেন কিছু খাবার জোগাড় করতে?

–পারিল যাবে।

–মানে?

–পারা যাবে।

–কিন্তু আশপাশে তো কিছুই দেখছি না। সব পরিত্যক্ত বাড়িঘর। মানুষজন সব চলে গেছে ওপারে।

–আমার নাম দুলু। মাহবুবার রহমান প্রধান। চেয়ারম্যান মশিয়ার রহমান প্রধানের ছেলে আমি। এটা আমাদের জোতদারি এস্টেট। দেখেন না পারি কিনা। শুধু হুকুম করে দেখেন।

–হুকুম তো করা হলো। সেটা তামিল করতে গিয়ে পালান দেবেন না তো?

দুলু হাসে। রিচার্ড হ্যারিসনের অবয়ব ফুটে ওঠে সেই হাসিতে। বলে, একটুখানি অপেক্ষা করেন।

–মোর নাম মহেন্দ্র সর্দার। দুলু ভাইয়া এইগুলান দিয়া পাঠাইছে।

সের তিনের চাল ভাজা। লবণ আর কাঁচা লঙ্কা। মোতালেব আর একরামুল মিলে সেই শুকনো খাবার পরিমাণমতো মুঠি করে বিলি করে। ক্ষুধার পেট। আউস চাল ভাজার মোটা দানা। লবণ-কাঁচা লঙ্কা, অমৃতসম মনে হয়।

–আপনি কিসের সর্দার?

–আমাদের জাতির। সাঁওতাল আমরা। ভাইয়াদের প্রজা। তাদের জমি-জিরাত চাষ করি।

–তাহলে এই এলাকার সাঁওতাল সর্দার আপনি? বেশ তা! দেশ ছেড়ে ওপারে যাননি?

–গেইছে কেউ কেউ। আমরা যাই নাই। গেইলে কিছুই থাকিবে না।

কালো কুচকুচে শরীর, শক্ত বাঁধন, লোহা পেটানো যেন। মহেন্দ্র সর্দারের চেহারা সর্দারের মতোই। প্রথম দেখাতেই মনে হয়, না ঠিকই আছে নামকরণ পদবি।

–ভাইয়া সন্ধ্যার পর আপনাদের নিয়া যাইতে কহিছেন।

–কোথায়?

–আমাদের পাড়ায় নালাগঞ্জে। সেখানে তো খাসি মারা হয়েছে। সবার জন্য রান্না হচ্ছে।

–বাহ্! বিউটিফুল! কতদূর এখান থেকে?

–আধ মাইল হইবে।

–ঠিক আছে। আমরা যাব।

–চলেন আজ রাতে হাড়িভাসা। ওদের তাড়িয়ে দিয়ে আসি।

ভূরিভোজ হয়েছে। এখন মেঘমুক্ত আকাশের নিচে খড়ের গাদার ওপর সবাই শুয়ে-বসে আছি। রাতের অন্ধকারের কালোছায়া চারদিকে। আকাশজুড়ে তারকারাজি। তারই সঙ্গে মিল রেখে যেন চারপাশে খেলে বেড়ায় জোনাকির দল। আকাশের দিকে মুখ রেখে সপ্তর্ষিমন্ডলের দিকে চেয়ে থাকি। শুক্রগ্রহ খুঁজি। দুলু তখন প্রস্তাবটা দেয়। দূরবর্তী জগদলহাট কিংবা মীরগড় ফ্রন্ট থেকে একটানা মেশিনগানের শব্দরাজি ভেসে আসে। কামান যুদ্ধ আপাতত বন্ধ। কখন আবার শুরু হয়ে যায় ঠিক নেই। এদিকে হাড়িভাসা থেকে প্রতিদিনই পাকসেনারা হামলা করতে আসছে। চাচ্ছে কম্বিং অপারেশন করে তাদের সমূলে উৎপাটন।

আজ ১৪ আগস্ট। পরপর তিন দিন তারা এলো। এভাবে দিনের পর দিন তাদের ক্রমাগত আক্রমণ আমাদের সমূহক্ষতি করে ছাড়বে। এর একটা কিছু বিহিত করা দরকার। দুলুর প্রস্তাবটা এ অবস্থায় মনঃপূত হয়। পিন্টু, মুসা, শামসুল চৌধুরী ও একরামুল এদের সবাইকে ডাকি। দুলুও থাকে। রাতের অন্ধকারে পাকবাহিনীর ঘাঁটিতে আঘাত করে হাড়িভাসা থেকে স্থায়ীভাবে তাদের বিতারণের ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা হয়। মুসা বলে,

–ডেইলি ডেইলি মার খাওয়ার চেয়ে চলেন ওদেরই আমরা মেরে আসি।

–মারা কি যাবে? ওরা দারুণ শক্তিশালী। একরামুল বলে।

–দুলু ভাই ঠিকভাবে নিয়ে যেতে পারলে আমরা সফলকাম হতেও পারি।

পিন্টুর জবাব।-আমাদের তরফে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তবুও রিস্ক নিতেই হবে। প্রতিদিন এভাবে মার খাওয়া যায় না। আমি সিদ্ধান্ত দিয়ে দিই।

–ওকে বস্, তাহলে দল রেডি করি। দুলু মিয়া আপনিও রাইফেল নিয়া ফল-ইন হন। পিন্টু এই বলে দুলুকে নিয়ে উঠে যায়।

তিনটি দল। কাট-আপ পার্টি, কভার এবং অ্যাসোল্ট পার্টি। পিন্টুর সঙ্গে কভার পার্টিতে থাকে একরামুল। মুসার সঙ্গে কাট-আপ পার্টিতে থাকে শামসুল চৌধুরী। অ্যাসোল্ট পার্টিতে আমার সঙ্গে থাকে মোতালেব ও থাকে দুলু। গাইড এবং ফাইটার দু'টি দায়িত্বই সে পালন করবে। সর্বমোট বত্রিশজনকে নিয়ে দল তিনটি সাজানো হয়। এলএমজিটা থাকে মোতালেবের কাছে। আর পিন্টুর কাছে থাকে দুই ইঞ্চি মর্টার। অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন, এম-১৪ বা অ্যান্টি পারসোনাল মাইন থাকে যথেষ্ট পরিমাণে মুসার সঙ্গে।

যুদ্ধক্লান্ত সবাই। দিনভর নাওয়া-খাওয়া হয়নি। রাতে দুলু মিয়ার চেষ্টায় মহেন্দ্র সর্দারের বাড়িতে হয়ে গেল ভূরিভোজ। ছেলেরা ক্ষুন্নিবৃত্তি শেষ করে নিজ নিজ হাতিয়ার নিয়ে খড়ের গাদায় শুয়ে-বসে থাকে। অবসাদে-ক্লান্তিতে অবসন্ন শরীর। আজ রাতেই যে আবার যুদ্ধযাত্রা হবে তা কেউ আঁচ করতে পারে না। বিড়ি-সিগারেট খায়। মৃদু স্বরের কথাবার্তা, হালকা হাসি-মশকরার শব্দ। বাইরে সেন্ট্রি দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির রাস্তার প্রবেশমুখে। জোনাকিরা আলো জ্বেলে আলো নিভিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অন্ধকারে তাদের পথকে আলোকিত করে। আপাত শান্তিময় নিরুপদ্রব রাত। শুধু দূরের শব্দধ্বনি জানান দিয়ে যায়, আমরা যুদ্ধের মধ্যে রয়েছি। এখন যুদ্ধের সময়। নিজ দেশ বাসভূমি গাঁওগ্রাম থেকে বিতাড়িত। অচেনা-অজানা সীমান্ত এলাকায় ঝোপঝাড়-জঙ্গল দিয়ে ঘেরা একটা সাঁওতাল বসতি। মহেন্দ্র সর্দারের বাড়ির দরজায় আমরা বসে আছি। অদ্ভুত লাগে ব্যাপারটা ভাবতে! দুলু আর তার প্রজা মহেন্দ্র সর্দার এখন আমাদের আপনজন, পরম আত্মীয়তুল্য। অথচ সেইসব আপনজন, আত্মীয়জনরা কোথায় এখন? পরাধীন দেশে বন্দি তারা। ভাবতেও পারছে না আমরা কোথায় আছি। আমরাও জানতে পারছি না তাদের এখনকার অবস্থা, হাল-চাল, কেমন আছে সবাই, কে জানে?

মহেন্দ্র সর্দার মাঝে-মাঝে মৈলী-মাঈ মৈলী-মাঈ বলে ডাকে। তার ডাকে সাড়া দিয়ে সদ্য কৈশোর পার হয়ে আসা একটি তরুণী বয়সের মেয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়। সর্দার তাকে এটা-ওটা নির্দেশ দেয়। লঘু পায়ে চঞ্চল ভঙ্গিতে মেয়েটি তা পালনের জন্য নিমিষেই হারিয়ে যায়। কালোবরণ কন্যারে তোর কুঁচবরণ কেশ-মৈলী মেয়েটিকে দেখার পরই প্রথমে এই লাইনটি মনের মধ্যে গুঞ্জন দিয়ে ওঠে। বসতবাটির পরিবারগুলো রয়ে গেছে মহেন্দ্র সর্দারকে কেন্দ্র করে। তকতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়িঘর। মেঝে-উঠোন চমৎকারভাবে লেপানো, ময়লা-অপরিষ্কার কিছুই নেই। মাটির ঘরগুলো দেখতে একইরকম। উপরে ছন, কিন্তু দেয়ালগুলোতে হাতে আঁকা নানা ধরনের ছবি। শিল্পী তার মনে থেকে মানুষ, পশু, দেবতা এগুলোর অবয়ব-আনার চেষ্টা করেছে কাঁচা হাতের তুলিতে। এটাই তাদের ঐতিহ্য, কালচার। এখনো আদিম স্বভাবের মানুষগুলো কি সুন্দর তাদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করছে!

অন্ধকারে কুপি হাতে বউঝিরা চলাফেরা করে। দু'তিনটা হারিকেন অন্ধকার তাড়ানোর চেষ্টা করে চলে। তাতে দেখা যায় নিখাদ কালো গ্রানাইট পাথরের তৈরি দেহের বাঁধুনি এক একজনের। বিশেষত মেয়েদের শরীরের গড়ন চোখে পড়ার মতো। কালো রঙ কিন্তু স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কি এমন আহার পায় এরা? অথচ

ভরপুর স্বাস্থ্য! রীতিমতো বিপজ্জনক শরীরের বাঁক। এরা থাকবে কীভাবে এখানে, খানদের থাবার নাগালের আওতায়? এতদিন ধরে আমরা না হয় ঠেকিয়ে রেখেছি। এরপর শত্রুদের ব্যাপক প্রস্তুতির মুখে তাদের ঠেকানো নাও যেতে পারে। তখন কী হবে এদের? কোথায় যাবে?

মৈলী এসে সর্দারের সামনে দাঁড়ায়। হাতে পান আর বিড়ির প্যাকেট। বলে, বাবা এই নে পান আর বিড়ি। বিড়ি কিন্তু শ্যাষগে। চাহিলে আর পাবোনি।

সর্দার মাথা নাড়ে। হাত বাড়িয়ে নেয়। বিড়ি এগিয়ে দেয় আমার পিন্টুর দুলুর উদ্দেশ্যে। মেয়েটির চোখে-মুখে উৎসুক ভাব। ছটফটে। চলে যায় না। বাবার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে। সঙ্গে ওর চেয়ে কম বয়সী আরো দু'তিনটি মেয়ে, বাচ্চা ক'জন। কাছে ডাকি মৈলীকে। আসে। তাকে বলি,

–ঘরের দেয়ালের ওই ছবিগুলো কে এঁকেছে?

হাসে মৈলী। অন্ধকারে চকচক করে ওঠে সাদা দাঁতের সারি। এদের সবার দাঁত এত সাদা আর সুগঠিত, কেন যে কে জানে? মৈলী বলে-

–মোর মা, মহো অর্থাৎ সে আর তার মা এঁকেছে।

–লেখাপড়া শিখেছো?

–অল্প। নাম লিখতে পারি।

–আজকে যে খাসিটা খাওয়ালে ওটা কার?

–মোর।

–তোমার দিতে কষ্ট হয়নি?

–বাপ কহিলে। তুমরা খাবেন। সারাদিন কিছু খান নাই। যুদ্ধ করেছেন হামার জইন্যে। জয়বাংলা আনিবেন তুমরা।

অদ্ভুত! এই মেয়েটারও বিশ্বাস, জয়বাংলা আনার দায়িত্ব আমাদেরই! যেহেতু যুদ্ধের মাঠে-ময়দানে আছি এবং আমরা তা আনবই। আর তখুনি মৈলীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের গহিনে যেন কাঁপন জাগে। সর্দারকে বলি, মৈলী আর অন্যদের এখানে রাখা চলবে না সর্দার। চারপাশে বিপদ। ওদের সরিয়ে দাও।

দুলুও বলে, আমিও সেই কথা এদের বলেছি। কিন্তু দেশের মায়া কাটিয়ে যেতে চায় না।

–যাবে। সাকতি শরণার্থী ক্যাম্পে রংপুর-দিনাজপুর থেকে বহু সাঁওতাল চলে এসেছে। সেখানে এরাও যেতে পারবে।

সর্দার বলে,

–কেমন করি দ্যাশ ছাড়ি যাই কহেন দেখি?

কঠিন প্রশ্ন। তার কথার জবাব, একমাত্র জয়বাংলা এলেই দেয়া যাবে। কবে হবে সেটা আমাদের জানা নেই।

দুলু তাগিদ দেয়, উঠেন। হাঁটতে হবে অন্তত সাত-আট মাইল।

বৃষ্টিভেজা পথ-অপথ, খেতবাড়ি, খালের পানির পার হয়ে আমরা এগুতে থাকি। রাত একটা হচ্ছে 'এইচ আওয়ার'। সে সময় হবে সম্মিলিত আক্রমণ। রাত ন'টায়

আমরা মহেন্দ্র সর্দারের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছি। ওরা সবাই ছিল বিদায়ক্ষণে। তাদের মধ্যে চোখে-লাগা অপরূপ ভঙ্গিমা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে মৈলী। সর্দারকে বলি, যাই সর্দার।

সর্দার কাপড়ের খুঁটে চোখের পানি মোছে। অবাক ব্যাপার! লোকটা কাঁদছে? মৈলীকে বলি, যাই।

–আর আসিবেন না?

–আসব।

–কুনদিন?

–দেখি, যাদি বেঁচে থাকি। যুদ্ধ শেষ হলে।

সেই থেকে হাঁটছি। মৈলীর সঙ্গে আর দেখা হবে না জানি। মনে মনে বলি, যেখানেই থাক, এই নির্দোষ, উচ্ছলপ্রাণ মায়াময় মেয়েটি বেঁচে থাক।

হাড়িভাসা খালের কাছে এসে দলটি তিনভাগে ভাগ হয়ে যায়। এখন সবার ষোলআনা দায়িত্ব পালনের মধ্যেই রয়েছে দলের চূড়ান্ত সাফল্য।

বাজার থেকে শ'তিনেক গজে দূরে রাস্তার ঢালে পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছি। কাট-আপ পার্টি প্রথমে মাইন পুঁতবে রাস্তায়। তারপর ফায়ার ওপেন করবে। পিন্টুর পার্টি সঙ্গে সঙ্গে শুরু করবে কভার ফায়ার। তারই আচ্ছাদনে আমরা পৌঁছে যাব হাড়িভাসা। দুলু ঘুরপথে আমাদের নিয়ে তুলবে ইউনিয়ন অফিসের কাছাকাছি। তারপর অ্যাসোল্ট, চার্জ! গুলি ছুড়তে ছুড়তে ঝাঁপিয়ে পড়া। ভয়ানক বিপজ্জনক পরিকল্পনা। কী হবে কিছুই আগাম বলা যায় না।

সময় কাটে দ্রুত। দ্রিমি-দ্রিমি বুকের ভেতর ঢাক বাজে। মেরুদণ্ড বেয়ে শিরশিরে শীতল ঠান্ডা অনুভূতি প্রবাহ। অপেক্ষায় দুরূহ ক্ষণ। হঠাৎ করেই এ সময় গুলি শুরু হয়। পিন্টুর মর্টার উড়ে আসে। দুলু বলে, আসেন আমার সঙ্গে। আজ শালাদের খতম করে দেয়া হবে।

দ্রুত দুলুকে অনুসরণ। 'চার্জ' শব্দে সতেরজনের যোদ্ধা দল নিয়ে বাজারে প্রবেশ। প্রচন্ড গোলাগুলি। চারদিকে যুদ্ধের ডামাডোল। পিছিয়ে যায় খানেরা-রাজাকারেরা পঞ্চগড় রাস্তা ধরে। অন্ধকারে ধাওয়া করা কঠিন। তবে বটগাছের গুঁড়ির আড়ালে অবস্থান নিয়ে তাদের উদ্দেশে গুলির তুবড়ি ছুটিয়ে চলে ছেলেরা। আমার কাছে দুলু। উত্তেজনায় কাঁপছে। তাকে শক্ত করে ধরে রাখি। ফিসফিসিয়ে বলি,

–দেশটা স্বাধীন হলে, আপনাকে আমরা এই ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বানাব। চমৎকার মানাবে।

–কি যে কহেন!

–কহেনটহেন না। যা বললাম তাই ঠিক।

–সেটা দেখা যাবে। কিন্তু খানেরা যে পালান দিচ্ছে!

আবার সেই পালান দেয়ার কথা। অন্ধকারে তার দিকে চেয়ে হেসে ফেলি, বলি,

–পালন দিছে, দেউক। সামনেই ধরা খাবে। একরামুল আর শামসুল চৌধুরী আছে ওঁৎ পেতে ।

কথা শেষ হয় না। বুম্ শব্দধ্বনি দিয়ে প্রচন্ড বিস্ফোরণ। বোঝা যায় অ্যান্টি ট্যাঙ্ক মাইন। তাহলে তো খানেরা সত্যিকারভাবেই ধরা খেয়েছে।

একজন সুবেদার মারা গেছে। আহত বেশ ক'জন। পঞ্চগড় থেকে রি-ইনফোর্সমেন্ট এসেছে নতুন সৈনিকের একটা দল। তারা এলাকা চষে বেড়াচ্ছে। কম্বিং অপারেশনে নেমেছে। মুক্তিদের খুঁজে বের করে অবস্থান দখল করবে। একেবারে বিনাশ করে দেবে তাদের।

কিন্তু পাবে কই? আমরা এখন ভেতরগড়ের মতিনদের বাড়ির দহলিজে শুয়ে আছি। পাশে পিন্টু-দুলু। তারা গান ধরেছে, এই বাংলা, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি ...। চমৎকার সুরেলা গলায় দেশের গান ভেসে বেড়ায় ভেতরগড় নামে মুক্ত বাংলার এই অংশে। এখন এই এলাকা পুরোটাই শত্রুমুক্ত। মনের গহনে গভীর আনন্দচ্ছটা। সাফল্যের। শত্রুকে আমরা ঠেকিয়ে দিচ্ছি। হটে যাচ্ছে তারা এলাকা ছেড়ে। মুক্ত হচ্ছে দেশ। এই হারে চলত থাকলে সব দেশটা একদিন মুক্তাঞ্চল হয়ে যাবে। বুকের মধ্যে গভীর আশার ঝিলিক। সামান্য করে হলেও কিন্তু হচ্ছে। এগুচ্ছি আমরা। স্বাধীনতার পানে, জয় বাংলার দিকে। খুব সময় কি লাগবে? দেখা যাক!

পিন্টু গান ধরেছে। বাইরে ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ ভেঙে পড়ছে যেন। বিকেলের আলো সবটুকু শুষে নিয়ে সন্ধ্যার আধার ঘনিয়ে আসছে দ্রুত। তখন পিন্টুকে গানের নেশায় পেয়েছে। সুরেলা আর দরাজ কণ্ঠ ওর। উত্তরের খোলা জানালাটা দিয়ে বৃষ্টির ছিট আসছে। টিনের ছাদে একনাগাড়ে ঝমঝমানো শব্দ। সব প্রকৃতি ভিজে চলেছে নীরবে-নিশ্চিন্তে। পিন্টুর গলায় সন্ধ্যার মেঘমালার গান। পরিবেশটা যেন কেমন হয়ে ওঠে। স্যাঁতেসেঁতে ভিজে আর মন খারাপ করে। পুরো বর্ষাকাল চলছে এখন। বৃষ্টির অঝোর ধারা তাই জানান দিয়ে যাচ্ছে এর প্রকৃত রূপ। বৃষ্টিভেজা রাতে আমাদের তখন প্রতি নিশির যুদ্ধযাত্রা।

আজ রাতে আমরা জগদলহাট অপারেশনে যাব। পঞ্চগড়-তেঁতুলিয়া মহাসড়কের ওপর পাকবাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি, জগদলহাট। বর্ষা-বাদলের আড় নিয়ে আমরা সেই ঘাঁটিতে আজ আঘাত হানব। প্রায় ১৩ মাইল দূরত্ব পার হতে হবে সেখানে পৌঁছতে। ভাঙা পথঘাট, স্রোতস্বিনী খাল, নদী, ফসলের মাঠের আলপথ ধরে যেতে হবে আমাদের। সাথে হাতিয়ার থাকবে রাইফেল, এসএলআর, স্টেনগান, দুই ইঞ্চি মর্টার। থাকবে কোমরে জড়ানো গোলাগুলি আর গ্রেনেড। শত্রুর বাঙ্কার অবস্থান ওড়ানোর জন্য এক্সপ্লোসিভের পুঁটলি। বাছাইকৃত ছেলেদের নিয়ে দল তৈরি হয়েছে। সন্ধ্যার পর গোলাগুলি ইস্যু আর ব্রিফিং। এরপর খাবার বিরতি। কিছুক্ষণ বিশ্রাম। রাত আটটা নাগাদ যাত্রা শুরু।

যুদ্ধে এসে বিশেষত গেরিলা যুদ্ধে আমরা দু'টো আপ্তবাক্য শিখেছি। তা হচ্ছে 'জঙ্গল মানেই মঙ্গল' আর 'বৃষ্টি মানেই যুদ্ধে-যাওয়া'। জঙ্গলের মধ্যে সহজেই নিজেদের লুকিয়ে ফেলা যায়, আশ্রয় নেয়া যায়। বৃষ্টি হলেই শত্রসেনারা নিজেদের বাঙ্কার-ট্রেঞ্চের মধ্যে গুটিয়ে নেয়। খোলা জায়গায় তাদের পাহারাদারি থাকে না। টহলদারি থাকে না রাস্তাঘাটে। সুতরাং ধুম বর্ষা মাথায় নিয়ে দিব্যি হেঁটে হেঁটে চলে যাওয়া যায় তাদের অবস্থানের কাছাকাছি। আর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজটি সেরে নির্বিঘ্নে ফিরে আসা যায় নিজেদের হাইড-আউটে। বৃষ্টির দিনে শত্রুর অভিযান প্রায়

থাকেই না। শুধু একতরফাভাবে থাকে তাদের ওপর আমাদের অপারেশন। সেটা ছোট বা বড় যাই-ই হোক।

আজো বৃষ্টি ঝরছে অঝোরে। বর্ষামঙ্গলের গান নিয়ে। সেই সঙ্গে গলা মিলিয়েছে পিন্টু। নালাগঞ্জের পোড়ো এই টিনের বাড়িটিতে আমাদের হাইড-আউট। বাড়ির বাইরে জঙ্গল-ঝোপ-ঝাড়। বুনো ঘাসে প্রায় মুছে যাওয়া পথ। ভেতরবাড়ির আঙিনাটি কিন্তু অদ্ভুত রকমের সুন্দর। পরিষ্কার তকতকে আর প্রশস্ত। সেখানে ছেলেদের ফল-ইন করানোর জায়গা। এখন সেই আঙিনা বাড়িটি একেবারে সয়লাব পানিতে পানিতে। ছেলেরা নিজ নিজ মেঝের বিছানায় শুয়ে-বসে বিশ্রামরত। রাতের না-হওয়া ঘুম পুষিয়ে নেয়ার জন্য ঘুমিয়ে পড়েছে কেউ গভীরভাবে। জেগে আছে যারা, তারা উৎকীর্ণ হয়ে শোনে পিন্টুর গান। সন্ধ্যার মেঘমালার সঙ্গে পিন্টুর সুরেলা গলা ভেসে বেড়ায় হাইড-আউটজুড়ে। দু'চারজন এসে ভিড় জমায়।

আমার পাশে পিন্টু শোয়া। জানালার পাশে মুখ। মাটির মেঝেতে বিছানো শতরঞ্চি। মাথার নিচে ইট দু'টো করে বালিশ। সামান্য কিছু খড়টড় দিয়ে নরম করার প্রচেষ্টা। সেই ইটের বালিশে মাথা রেখে, এক হাত মাথার নিচে দিয়ে উদাসী পিন্টু হারিয়ে গেছে তার সুরেলা জগতে। তার পাশে একইভাবে শুয়ে থাকি আমি। অন্যরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে থাকে। কোথায় বাড়ি, কোথায় ঘর, কোথায় এই সীমান্ত-ঘেঁষা নালাগঞ্জ হাইড-আউট। বৃষ্টিভেজা এমন দিনক্ষণ। সামনে ওঁৎ পেতে থাকা শত্রু ভয়ঙ্কর। তাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ স্বাধীনতার। জয় বাংলার। হঠাৎ করেই আমরা যুদ্ধের মাঝে এসে পড়েছি। যুদ্ধ মানেই বিভীষিকা। ধ্বংশ আর মৃত্যু। এখন তার মাঝেই আমাদের দিনরাতের বসবাস।

মাথায় দু'টো কলপাতার আড় নিয়ে নিজেকে বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচানোর ব্যর্থ প্রয়াস। সেভাবে একজনকে দ্রুত পদচারণায় আসতে দেখা যায়। বুনো ঘাসে ছাওয়া পথটি মাড়িয়ে ঘরে ঢোকার মুখে কলাপাতা দুটো ফেলে দেয়। তারপর সোজা এসে দাঁড়ায় ঘরের মেঝেতে। সারা শরীর কাক-ভেজা। দরদরিয়ে পানি পড়ে মেঝে ভিজে যায়। সজিম উদ্দিন রেকি মিশনে বের হয়েছিল সেই সকালে। ফিরছে এখন। কিন্তু ওর চোখ-মুখের অবস্থা দেখে চমকে যেতে হয়। থমকে যেতে হয় ওর হতবিহ্বল ভাব দেখে। মনের ভেতর 'কু' ডেকে ওঠে। কোনো বিপদ কি?

সজিমউদ্দিন তখন একেবারে ভেঙে পড়ে। মেঝেতে বসে কেঁদে ওঠে শব্দ করে। হাহাকারের মতো শোনায় সে কান্না। জেগে ওঠে সব হাইড-আউট। ছুটে আসে ছেলেরা, সেন্ট্রিরা শক্ত হয়ে বসে তাদের অবস্থানে। যন্ত্রচালিতের মতো উঠে আসে হাতিয়ার সবার হাতে হাতে। শত্রু আসছে কি? কোথায়, কত দূরে? না অন্য কোনো বিপদ? একটা গোলমাল, এলোমেলো শোরগোল পড়ে যায় হাইড-আউটজুড়ে। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ছেলেদের মধ্যে।

পিন্টুর গান থেমে গেছে। সজিমউদ্দিনকে ধরে ঝাঁকুনি দিই আর জিজ্ঞাস করি, কী হয়েছে বল! সে কিছুই বলে না। শুধুই কেঁদে চলে হু-হু শব্দ তুলে। এই সজিমউদ্দিন জুলাইয়ের শেষ ভাগের এক গভীর রাতে পথহারা আমাদের পুরো দলটিকে নিয়ে গিয়ে

তুলেছিল তার নিজ বাড়িতে। সীমান্ত এলাকায় নয়। যতদূর সম্ভব ভেতরে ঢুকে, অধিকৃত বাংলাদেশে গেরিলা যুদ্ধ চালানোর জন্য নির্দেশিত ছিলাম আমরা। কিছুতেই আমাদের সম্ভাব্য হাইড-আউট খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। পঞ্চাশজন যোদ্ধা। সঙ্গে অস্ত্র-গোলাবারুদ আর পুরো সপ্তাহের রেশনের বিরাট বোঝা। দিকহারা দিশেহারা। প্রচণ্ড হতাশা নিয়ে বসে পড়েছিলাম বিরাট বাহিনীটা নিয়ে। রাত শেষ হওয়ার আগেই একটা আশ্রয় চাই। নিরাপদ এবং নিরূপদ্রব। কোথায় পাওয়া যাবে তেমন আশ্রয়? তখন এগিয়ে এসেছিল সজিমউদ্দিন। চলেন আমাদের বাড়িতে। কাছেই বদলুপাড়া গ্রামে। তার সম্ভাব্য বিপদ-আপদ এগুলো নিয়ে সে কিছুই ভাবেনি। আমাদেরও ভাবার মতো তেমন অবকাশ ছিল না। শেষ রাতে, সবার অগোচরে অলক্ষে আমরা গিয়ে চুপচাপ উঠেছিলাম তার বাড়িতে। মাত্র আধা মাইলের দূরত্বে, সেখান থেকে শত্রু বাহনীর ঘাঁটি বিসমনি ব্রিজের ওপর।

সে যাত্রায় শামসুল অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তার শয্যাপাশে নিয়ত সেবারত এক নারী। নরম-কোমল। দীপ্ত কমনীয় মুখ। দু'দিন পর ফেরার রাতে সেই নারী কাঁদছিল অঝোরে। সজিমউদ্দিনের তরুণী স্ত্রী। সজিমউদ্দিন আসতে পারছিল না তাকে ছেড়ে। মায়াবতী এই মেয়েটি দু'দিন দৌড়-ঝাঁপ করে আমাদের যত্ন-আত্তি করেছে। আমরা সজিমউদ্দিনকে তার কাছে রেখে যেতে মেয়েটিকে আমরা কিছুই বলতে পারছিলাম না। যুদ্ধ এদের শান্তিময় নিরিবিলি জীবনকে তছনছ করে দিয়ে গেছে।

তার ওপর আমরা থেকে গেলাম এখানে দু'দিন। ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে শত্রুর কাছে পৌঁছবেই। নেমে আসবে হয়তো এদের গোটা পরিবারটার ওপর শত্রুর ক্রুদ্ধ রোষ। ভয়ঙ্কর এক বিভীষিকা। সেই রকম সম্ভাব্য বিপদ তাদের সামনে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলাম সে রাতে।

তার ওপর আমরা থেকে গেলাম এখানে দু'দিন। ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে শত্রুর কাছে পৌঁছবেই। নেমে আসবে হয়ত এদের গোটা পরিবারের ওপর শত্রুর ক্রুদ্ধ রোষ। ভয়ঙ্কর এক বিভীষিকা। সেই রকম সম্ভাব্য বিপদ তাদের সামনে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলাম আমরা সে রাতে।

ঘটেছে কি তেমন কোনো বিপদ? বুকের গহিনে উঁকি দেয়া শঙ্কাবোধ থেকে সজিমউদ্দিনের সামনে থির হয়ে বসি। ইশারায় পিন্টুকে পাশে ডাকি। সরে যেতে বলি অন্যদের। ঘর খালি হয়ে গেলে জিজ্ঞাস করি, বল কী হয়েছে? উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি চোখেমুখে। কেমন ঘোরলাগা ভাব। সে অবস্থায় সে বলে, খানসেনারা এসেছিল আমাদের বাড়িতে।

–কবে?

–কাল।

–কী করেছে তারা?

–লুটপাট্ করছে, ধরেছে, মেরেছে, আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে পুরো গ্রাম।

–আর?

–ধরে নিয়ে গেছে বাবা-চাচাদের।

–তোর বউ?

এবার শূন্য দৃষ্টিতে তাকায় সজিমউদ্দিন। তারপর গামছা দিয়ে মুখ চেপে ধরে কাঁদতে থাকে ফুলে ফুলে।

–বল তোর বউ কোথায়?

মাথা নাড়ে সে, জানে না। তার মানে? তাহলে কি মায়াবতী সেই মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গেছে খান আর রাজাকার বাহিনী? বুকের ভেতর অনাগত আতঙ্ক হাতুড়ি প্রচণ্ড আঘাত করতে থাকে। সেই সঙ্গে বিরাট একটা অপরাধবোধ। তাদের বাড়িতে দু'রাতের হাউড-আউটে না থাকলে হতো না কোনো অঘটন। থাকতো ঠিক সবকিছুই। সেই বোধ থেকে জিজ্ঞাস করি,

–খোঁজ করিস নাই? কি জেনেছিস?

–সাতজন মেয়ে মানুষকে তারা নিয়ে গেছে সঙ্গে।

–কার কাছে জানলি?

–একজন গ্রামের মানুষ।

–তাদের মধ্যে তোর বউ ছিল?

–জানি না। মাথা নেড়ে জবাব দেয় সজিমউদ্দিন ভেঙে-পড়া মানুষের মতো। সেদিকপানে তাকিয়ে জিজ্ঞাস করি,

–খানসেনার দলটি এখন কোথায়?

–পানিমাছ হাটে ডিফেন্স তৈরি করে অবস্থান নিয়ে আছে তারা।

–ফিরে যায়নি?

–না।

এর বেশি আর কিছু এখন পাওয়া যাবে না সজিমউদ্দিনের কাছ থেকে। তাকে ছেড়ে দিই। লঙ্গর কমান্ডার মমতাজকে ডেকে তাকে গরম খাবার দিতে বলি। বলি তাকে কাপড়-জামা বদলে রেস্ট নিতে।

হঠাৎ করেই সামনে এক কঠিন মিশন এসে গেল। নির্ধারিত জগদলহাট মিশন আজ বাদ যাবে। যেতে হবে আজ পানিমাছহাটে সদ্য তৈরিকৃত পাক ডিফেন্সে। ধৃত সাত মহিলার মধ্যে অবশ্যই মায়াবতী সেই বধূটি রয়েছে। সজিমউদ্দিনের বউসহ অন্যান্য মহিলাকে উদ্ধার এবং পাকসেনাদের সেখান থেকে উৎখাত। কাজটি বড়ই কঠিন এবং ঝুঁকিপূর্ণ। নিতেই হবে ঝুঁকি, উপায় কি? দু'রাতের আশ্রয় এবং অন্নের ঋণ শোধ তো দিতেই হবে। নইলে নিজেদের ক্ষমা করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিই পিন্টুকে। তৈরি হয়ে নিতে বলি মুসা, একরামুল ও শামসুল চৌধুরীকে। বাইরে বর্ষামঙ্গলের গান চলতেই থাকে, সেই সঙ্গে চলতে থাকে হাইড-আউটের ভেতরে ছেলেদের ঝটপট প্রস্তুতি।

রাত বারোটার দিকে শুরু হয় আক্রমণ। প্রথমে ২ ইঞ্চি মর্টার। অতঃপর মেশিনগান, এসএলআর, রাইফেল। তিনদিক থেকে এগিয়েছি আমরা। হাড়িভাসার দিকে থেকে শামসুল চৌধুরী, বদলুপাড়ার দিক থেকে একরামুল, মুসা। আর সোজাসুজি আমি আর পিন্টু। ৪৫ জনের শক্তিশালী সম্মিলিত দল। সঙ্গে সব ধরনের হাতিয়ার আর গোলাবারুদ। বৃষ্টি মাঝখানে ধরে এসেছিল। আবার শুরু হয়েছে প্রবল বেগে। সেই বৃষ্টির আড়াল নিয়ে আমরা আসতে পেরেছি শত্রু অবস্থানের অতি কাছাকাছি।

২ ইঞ্চি মর্টারের প্রথম গোলা বিস্ফোরিত হয় শত্রু অবস্থানের কাছাকাছি, প্রচন্ড ধ্বনি আর বিজলি ছটার বিচ্ছুরণ নিয়ে। আরো কটা শেল ছুটে যায়। পরপর পড়তে থাকে সেগুলো শত্রুঘাঁটির ওপর। জেগে ওঠে শত্রু। শুরু হয় তাদের প্রতিরোধ। তিনদিক থেকে আক্রান্ত তারা। প্রথমে কিছুটা এলোমেলো বিশৃঙ্খলা। কিন্তু জাত সৈনিক তারা। সামলে ওঠে। শুরু করে মহাবিক্রমে প্রতিরোধ। পাঠাতে থাকে শত-সহস্র গুলির তুবড়ি। স্রোতের মতো ভেসে যেতে থাকে সেগুলো মাথার ওপর দিয়ে। বৃষ্টির পানিতে ভেসে যাওয়া ফসলের মাঠ, খেতবাড়ি, আলের উঁচু পাড়ে আড়াল নিয়ে শরীর কাঁদা-পানিতে ডুবিয়ে আমরা শত্রুর গুলির জবাব দিতে থাকি আর সেই সঙ্গে চেষ্টা করি একটু একটু করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে। ডানে-বাঁয়ে অবস্থান নেয়া শামসুল চৌধুরী-একরামুল-মুসারাও একইভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ত্রিমুখী আক্রমণের মোকাবিলা করতে গিয়ে খানসেনাদের হিমশিম খাওয়া অবস্থা। কিন্তু মাটি কামড়ে লড়ে চলে তারা। হাল ছেড়ে দিলেই নির্ঘাত পরাজয়, মানে অবধারিত মৃত্যু। সেই মৃত্যুভয় থেকে অস্তিত্বের লড়াই তাদের মরিয়া হয়ে ওঠে।

সামনে একটা ঝিলের মতো নিচু জলাভূমি। তার ওপারেই কালোমতো উঁচু জায়গাটি হচ্ছে পানিমাছ বাজার। হাড়িভাসা-পঞ্চগড় জেলা বোর্ডের রাস্তার ওপর। সেখানে পৌঁছতে হলে জলাভূমিটি পার হয়ে যেতে হবে। প্রথমে মনে হয়েছিল সেটা পাড়ি দেয়া যাবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, তা প্রায় অসম্ভব। মালেক, খলিল ওরা নেমে গিয়েছিল। কচুরিপানা, বুনো ঘাস এগুলো ছেয়ে আছে জলাভূমিটা। কিছুদূর এগুতেই অথৈ পানি। পুরো জয়গাটি সাঁতরে যেতে হবে কচুরিপানার জঙ্গল সরাতে সরাতে। সেটা সম্ভব নয়। অগ্রাভিযান থেমে যায় তাই জলাভূমির পাড়ে এসে। মোতালেবের এলএমজি এবং এসএলআরধারী ছেলেরা তাদের শত্রুমুখী গুলিবর্ষণ চালিয়ে যেতে থাকে একনাগাড়ে। তাদের সে কাজে রেখে আমি চেষ্টা করি কিছু একটা উপায় খোঁজার।

কিছুটা ঘুরপথে হলেও শত্রুঘাঁটি পর্যন্ত চড়াও হতেই হবে। বুকের ভেতর একটি ছবি বসে থাকে। ক্রন্দনরতা একটি ছিপছিপে গড়নের শ্যামলা মেয়ে। কেরোসিনের ডিবোয় আলোকিত একটি মায়াবতী মুখ। তার প্রিয় মানুষ চলে যাচ্ছে যুদ্ধ, তার জন্য ব্যাকুল কান্না। যুদ্ধ তার সাজানো সংসার এলোমেলো করে দিয়েছে। জয়বাংলা না হলে সেই সংসার সে আর সাজাতে পারবে না কিছুতেই। সেই ঘাঁটি ভাঙতে না পারলে তাকে উদ্ধার করা যাবে না। তাকে না পাওয়া গেলে সজিমউদ্দিনের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। পাগল হয়ে যাবে সে।

মধ্যরাতের পর মনে হয় খানসেনারা হাল ছেড়ে দিচ্ছে, পিছিয়ে যাচ্ছে তারা। নবউদ্যমে জেগে ওঠে সবাই। পেছনের অবস্থানের রাখা পিন্টুকে খবর পাঠাই ধমাধম মর্টার শেল পাঠাতে। মনে হয়, এই ধারা বজায় থাকলে খানেরা পিছুটান দেবে। জলাভূমির ডান দিক ধরে আমরা পৌঁছে যেতে পারব জেলা বোর্ডের সড়কে এবং তারপর তাদের ঘাঁটিতে। ভোর হওয়ার আগেই আমরা দখলে নিতে পারব তাদের ঘাঁটি।

কিন্তু তা আর হয়ে ওঠে না। বাঁয়ের দিকে হঠাৎ করে থেমে যায় শামসুল চৌধুরী। মুসা-একরামুলও থেমে যায় কিছুক্ষণের মধ্যে, শুধু যুদ্ধের ফ্রন্টকে একাই জিইয়ে রাখে মোতালেব আর তার বাহিনী।

রাত শেষ হয়ে আসতে থাকে। বৃষ্টিও ধরে আসে। ছেলেদের কাছ থেকে খবর আসতে থাকে গুলি শেষ হয়ে আসছে দ্রুত। আর বেশিক্ষণ কুলিয়ে ওঠা যাবে না। এ অবস্থায় এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কিছুতেই। এই বাস্তববোধ থেকে মোতালেবকে নির্দেশ দেই গুলি চালিয়ে যেতে। অন্যদেরও সেই গুলির কভার নিয়ে নিজ নিজ অবস্থান ছেড়ে পিছু চলে যেতে নির্দেশ দেই। ছেলেরা কাদায়-পানিতে মাখামাখি হয়ে ফিরতে থাকে। সবশেষে মোতালেবকে তুলে নিয়ে আমি ফিরে চলি, হামাগুড়ির ভঙ্গিতে পানি-কাদার ভেতর দিয়ে অনেকটা সরীসৃপ প্রাণীর মতো। মাথার ওপর দিয়ে তখনো ছুটে চলে শক্রর অবিরাম গুলির প্রবাহ হুইসেল বাজানোর শব্দধ্বনি নিয়ে। আমরা আর পেছনে তাকাই না। শক্রর ওপর আমাদের আঘাতটা ভালোই হয়েছে এটা ঠিক, কিন্তু ওদের পরাস্ত করা গেল না। আর গেল না বলেই সেখানে থেকে গেল সেই মায়াবতী মেয়েটি। মনের গভীরে এই দুঃখ বোধটা চেপে রেখেই ফিরে চলি আমাদের নিরাপদ আশ্রয় নালাগঞ্জ হাইড-আউটের দিকে।

মেঘ-ভাঙা রোদ উঠছে। চমৎকার! সারা সপ্তাহ গোমড়ামুখো আকাশ। একটানা বর্ষণ, সব প্রকৃতিকেই ভিজে স্যাঁতসেঁতে করে দিয়েছে। এর মাঝ দিয়েই চলেছে রাতের বেলায় যুদ্ধাভিযান। রাতভর কর্দমাক্ত পথঘাট, ফসলের মাঠ, খাল-বিল-নদী এগুলোর মধ্যে পদচারণা। পথ ছেড়ে অপথ দিয়ে শক্রর কাছাকাছি পৌছানোর চেষ্টা। ক্লান্তিময় কষ্টকর জীবন। সামনে অনিশ্চিত দিনক্ষণ। স্বাধীনতা। জয়বাংলা। সে তো ধরাছোঁয়ার বাইরে। যেন কষ্টকর দুঃস্বপ্ন একটা। সেখানে পৌছানো কবে যাবে? কিংবা আদৌ যাবে কিনা তা নিশ্চিত করে বলার উপায় নেই। একটা দানবতুল্য শক্তি দেশটা করে রেখেছে জোর করে বেদখল। ছিঁড়েখুঁড়ে খাচ্ছে তারা সবকিছু। বিষফোঁড়ার মতো গজিয়ে উঠেছে দেশময় তাদের বাঙ্কারের সারি। রাজাকার, আলবদর, আল শামস তাদের সহযোগী শক্তি। লুটপাট, অত্যাচার, হত্যা, মৃত্যু, রক্ত বিভীষিকাময় জীবন। মৃত মানুষের লাশের সারি। বাতাসে পচনযুক্ত মাংসের দুর্গন্ধ অসহনীয়। শেয়াল-কুকুরের কামড়াকামড়ি। মহাভোজ। সেই সঙ্গে বাতাসে পোড়া বারুদের ভারি গন্ধ। নিজ দেশে পরবাসী ভীত-বিহ্বল মানুষ। মৃত্যু তাদের পিছু ছুটছে। সদা পলায়নপর তারা মুক্তাঞ্চলের খোঁজে। প্রতিদিন শত-সহস্র মানুষের কাফেলা। শরণার্থী তারা। সীমান্ত পেরিয়ে যায় প্রতিদিন। নিজ বাসভূমি, সহায়-সম্পদ ফেলে।

আমরা তাদের যাওয়া ঠেকাতে পারি না। বলতে পারি না দেশে থেকে যেতে। করতে পারি না তাদের নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা। সীমিত শক্তি আমাদের। স্বল্পসংখ্যক অস্ত্র-গোলাবারুদ। অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ, লজিস্টক সাপোর্ট। চারদিকে বিশৃঙ্খল অবস্থা। যুদ্ধের কমান্ড-কৌশল ইত্যাদি গড়ে ওঠেনি এখনো সঠিকভাবে। সন্দেহ আর অবিশ্বাস সবখানে। এ রকম অবস্থায় আমাদের গেরিলা যুদ্ধ শক্র বাহিনীর সাথে। অসম এ যুদ্ধ। এ যুদ্ধে টিকে থাকা মুশকিল। শুধু অদম্য মানসিক শক্তি আর সাহস এ দু'টো দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেই আমরা এতো সব প্রতিকূল অবস্থায় টিকে আছি। যুদ্ধ করছি। কখনো সফলতা, কখনো ব্যর্থতা। সতীর্থ সহযোদ্ধা গোলাম গউস, আব্বাস ইতোমধ্যে হারিয়ে গেছে। আহত অবস্থায় যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়ে পেছনে চলে গেছে অনেকে চিকিৎসার জন্য। নিজ দেশে যেন

অপরিচিতজন। দিনে-দুপুরে বের হওয়ার উপায় নেই। শত্রুর চর চারদিকে। যে কোনো সময় ধরিয়ে দিতে পারে তারা। তাদের চোখ বাঁচিয়ে সবার অলক্ষে রাতের বেলায় লুকিয়ে-ছাপিয়ে আমাদের প্রতিদিনের অপারেশন যাত্রা। এ যাত্রা কবে শেষ হবে তার নিশ্চয়তা নেই। আমাদের ফেরার কোনো উপায় নেই। শুধু এগিয়ে যাওয়া ছাড়া। এই এগিয়ে যাওয়া চলবেই অক্লান্ত, জয়বাংলার সোনালি সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবছি আর পিন্টু-একরামুলদের নিয়ে গত রাতের যুদ্ধের হিসাব-নিকাশ নিয়ে বসেছি। প্রতিটি অপারেশন তথা যুদ্ধের পর হাইড-আউটে ফিরে এসে যে কাজটি করতে হয় তা হচ্ছে, হিসাব-নিকাশ মেলানো। কী পরিমাণ গোলাবারুদ খরচ হলো তা হিসাব করে বের করতে হয়। সেই সঙ্গে মেলাতে হয় ব্যালেন্স কী রইল, তা। নোট বইয়ে সেটা টুকে রাখতে হয় এবং উল্লেখ করতে হয় যুদ্ধের বিবরণ, তার ফলাফল, নিজেদের এবং শত্রুদের ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান।

বাইরে ঝলমলে দিন। গত রাতের যুদ্ধফেরত ছেলেরা ঘুমে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে যার যার জায়গায়। শরীরের কাদা-মাটি পরিষ্কার করারও সময় পায়নি। আমার নিজের চোখের পাতাও ভারি হয়ে আছে। মাথায় ভোঁ ধরা ভাব।

সামান্যক্ষণের জন্য শরীর এলিয়ে দেয়ার প্রচন্ড তাগিদ। কিন্তু তা করতে গেলেই অসীম ক্লান্তি নিয়ে ঝপ্ করে নেমে আসবে গভীর ঘুম। না, এখন তা হতে দেয়া যাবে না। চুলচেরা হিসাব-নিকাশ করে গত রাতের যুদ্ধের রিপোর্ট তৈরি করতে হবে। তা আগামীকাল পেশ করতে হবে কমান্ডিং অফিসারের কাছে।

সবার রেস্ট থাকলেও কমান্ডারের রেস্ট নেই। যুদ্ধ শেষের হিসাব-নিকাশের পাশাপাশি চলে অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান। আদেশ-নির্দেশের মধ্যে বড় অংশজুড়ে থাকে লঙ্গরখানার রেশনসামগ্রী। তিনবেলা আহারের নিশ্চয়তা ˙বিধানের দায়িত্ব কোয়ার্টার মাস্টার মিনহাজ আর লঙ্গরখানার কমান্ডার মমতাজের। তারা আসে সিদ্ধান্ত নিতে। সারাদিনের মেন্যু কি হবে। রেশনের মজুদ অবস্থা নিয়ে হিসাব-নিকাশ হয় এবং তার ওপর নির্ভর করে চাহিদাপত্র ঠিক করতে হয়। যুদ্ধ একটা কষ্টের ব্যাপার। এর জন্য চাই দু'টো সাপোর্ট। রেশন আর গোলাবারুদ সরবরাহের নিয়মিত নিশ্চয়তা। না খেয়ে যেমন যুদ্ধ করা যায় না, তেমনি গোলাবারুদের ঘাটতি নিয়েও যুদ্ধে যাওয়া যায় না। দু'টোর মজুদ যাতে ঠিক থাকে, এ নিয়ে তাই থাকতে হয় সদা সতর্ক।

গত রাত তথা ১৮ আগস্ট পানিমাছের যুদ্ধের খতিয়ান নোট বইয়ে তুলে নিই এভাবে-

18.8.71

Attacked the Panimash defence from 3 directions. 2" mortar shelling on the bunker of their defence. Fight continued upto late night. No perfect news of casualties. Total expenditure of ammns.

.303-	175+14=	289 Rds.
7.62-	50+21=	71 Rds.
9mm-	15+132=	283 Rds.
2" Mortar-	5	bombs

ঘুমে ঘুমে কেটে যায় দুপুর। বিকেলে কখন আকাশজুড়ে মেঘ করেছে টের পাওয়া যায় নি। বর্ষার মেঘ। মাথার ওপর ঘনায়মান হলো তো নামল ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির একটানা শব্দের ভেতর থেকে নাড়া দিয়ে যেন কেউ জাগিয়ে দেয়। দেখি, পাশে পিন্টু মন্ত্রমুগ্ধের মতো চেয়ে আছে। জানালা পথে বাইরে, বিমোহিত চোখমুখ। কেমন একটা ভালোলাগা অনুভূতি আমার নিজের মধ্যে ভর করে। আর সেই বোধ থেকে আমিও পিন্টুর মতো বাইরে একটানা ঝরে-যাওয়া বৃষ্টির রূপ দেখতে থাকি। কিন্তু বেশিক্ষণ এই ঘোরের মধ্যে থাকা হয় না। একটা হৈচৈ শব্দ ওঠে। গতকালের মতোই কাক-ভেজা হয়ে ঢুকতে দেখা যায় সজিমউদ্দিনকে। আজ তার চোখেমুখে অন্যরকম ভাব। সেই বিহ্বলতা নেই। তার বদলে সজীব হাসি আর ফুল্ল গলায় সে বলতে থাকে, তাকে পাওয়া গেছে!

–কাকে?

–আমার বউকে।

–বলিস কি! কোথায়?

–ভেতরগড় ওখানে গেল?

–কীভাবে ওখানে গেল?

–কাল রাতে যখন পানিমাছ আক্রমণ করা হয়, তখন ওরা শত্রু ঘাঁটি থেকে পালিয়ে যায়। গিয়ে ওঠে আমার মামার বাড়িতে। খোঁজ পেয়ে সেখানে যাই এবং তাদের দেখা পাই । এইসব বলে সজিমউদ্দিন কেঁদে ওঠে। থামে। হাসে, আবার কাঁদে। তার হাসি-কান্নার ভেতর বর্ণনা পাওয়া যায় কীভাবে অন্যান্য বন্দির সঙ্গে সজিমউদ্দিনের বউ পালাতে পেরেছে। আক্রমণ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা বিচলিত হয়ে দৌড়-ঝাঁপ করে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে নেমে যায়। বন্দিদের দিকে তাদের আর দৃকপাত থাকে না। সেই সুযোগে দ্রুত তারা বের হয়ে আসে শত্রুঘাঁটি থেকে। তারপর কর্দমাক্ত পথঘাট ভেঙে শুধুই ছুটে চলা। ভোরের আলো ফোটার মুহূর্তে পৌঁছে যায় ভেতরগড়। রেকি মিশন থেকে এই খবরটা সজিমউদ্দিন পেয়ে যায়। অতঃপর তারও ছুটে চলা ভেতরগড় পানে।

সেই ছিপছিপে গড়নের শ্যামলা মেয়েটি। মায়াবতী চেহারা। গ্রামবাংলার রূপ-লাবণ্যে ভরপুর এক গৃহবধূ, তরুণী নারী। আমাদের সজিমউদ্দিনের বউ। ক'দিনের জন্য হারিয়ে যাওয়া, সে তো নিদারুণ কষ্ট আর হীনম্মন্যতার ব্যাপার!

কেমন আছে মেয়েটি?

এই কথাটি জানার জন্য বুকের ভেতর গভীর আকুলিবিকুলি। তা জিজ্ঞাস করার সাহস পাই না। কিন্তু সজিমউদ্দিনের ঝলমলে মুখভাব, তার আনন্দের বহিঃপ্রকাশ দারুণভাবে আলোড়িত করে। সেই ভাবের মধ্য থেকে পিন্টু গতকালের সাধা গানটিই গেয়ে ওঠে, "তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা ''। তার গান ভেসে বেড়ায় আমাদের চারধারে অপূর্ব সুরের মায়াজাল তুলে। বিমুগ্ধচিত্তে বসে থাকি আমরা তার পাশে চুপচাপ।

রচনাকাল ১৯৯৯

সম্মুখ সমরে বাঙালি

মেজর জেনারেল আমীন আহমদ চৌধুরী (অব.) বীর বিক্রম

প্রবল পরাক্রান্ত মুঘল সম্রাট আকবর একদা বাংলার এক ক্ষুদ্র দুর্বিনীত ভূস্বামীকে দমন করার জন্য তার দরবারের শ্রেষ্ঠ সেনাপতি রাজা মানসিংহকে পাঠিয়েছিলেন এই বাংলাদেশে। গ্রামবাংলার সাধারণ কৃষককুল নিয়ে গঠিত বারো ভুঞার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর ঈসা খাঁর দুর্ধর্ষ বাহিনীকে দমন করতে গিয়ে রাজা মানসিংহের অপরাজেয় বাহিনী যত্রতত্র হেস্তনেস্ত হয়েছিল। সম্মুখ সমরে রাজা মানসিংহের তরবারি দ্বিখণ্ডিত করলেন ঈসা খাঁ। এতে বাঙালি মায়ের চেয়ে আফগান মাতা অনেক বেশি গৌরবান্বিতা হলেন সন্দেহ নেই। তথাপি ছোট ছোট নৌযানে ঈসা খাঁর সেই ক্ষুদ্র অথচ সুগঠিত বাহিনী কীভাবে বিশাল মুঘল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করেছিল ইতিহাসে তার অংশবিশেষ হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে। ইতিহাসে বাংলার সেই বীর সেনানীদের কথা খুব সামান্যই লেখা আছে। তবে কিংবদন্তি হয়ে আজো সেই কাহিনী সজীব হয়ে আছে। বিজ্ঞ মানসিংহ বাংলা জয়ের আশা পরিত্যাগ করে দিল্লিতে বার্তা পাঠালেন—সামরিক বাহিনী দিয়ে বাংলা জয় সম্ভব নয় বরং শুধু ভালোবাসা দিয়ে বাংলাকে জয় করা সম্ভব। মহামতি আকবর ভালোবাসা দিয়ে বাংলাকে অভিভূত করে ফেললেন। সেই থেকে বাংলার সঙ্গে দিল্লির ভালোবাসার লেনদেন শুরু।

মানসিংহ-ঈসা খাঁর যুদ্ধে প্রথমবারের মতো পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে তরবারির ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলার সাধারণ মানুষের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃতি পেল; কিন্তু ভাগ্যের ফের। কয়েক শতাব্দীর ব্যবধানে বাংলা সম্বন্ধে রাজা মানসিংহের সেই ঐতিহাসিক উপলব্ধি যা সম্রাট আকবর বিজ্ঞ রাজনীতিবিদের মতো সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, সেই উপলব্ধি 'ব্ল্যাক ডগ' পিপাসু অতিরিক্ত উর্বর মস্তিষ্কের অধিকারী জেনারেল ইয়াহিয়া খানের উষ্ণ স্নায়ুতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো। ইয়াহিয়া ইতিহাস থেকে উপযুক্ত শিক্ষা নেয়ার অবসর পেল না—সম্ভবত শরীরের নীল রক্তের গরিমায় গর্বিত আর বহুল প্রচারিত আমদানিকৃত প্রবাদ 'বাঙালিরা যোদ্ধা নয়' একে বেদবাক্যরূপে গ্রহণ করায়। ইয়াহিয়া তার আত্মম্ভরিতার জন্য প্রচণ্ডভাবে আক্কেলসেলামী দিল। ইয়াহিয়া ভুলে গিয়েছিল, শুধু বাংলার মাটিতেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের জন্ম হয়, যেমন করে জন্ম নিয়েছিল তোপের মুখে উড়ে যাওয়া শহীদ তিতুমীর আর ফাঁসির মঞ্চে ঝুলন্ত অমর সূর্যসেন। এ বাঙালিরা ধুঁকে ধুঁকে মরে না, মরে মাঠে-ময়দানে। পৌরুষের ব্যঞ্জনা এদের প্রতি অঙ্গে। এরা জাগ্রত জনতার মূর্ত

প্রতীক। অবহেলিত, নির্যাতিত মানুষের আলো—'পরশুরামের কুঠার'। এবারের মুক্তি সংগ্রামে শত্রুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই শুরু করি জুলাই '৭১-এর পর থেকে। এর আগে আমরা ছিলাম ডিফেন্সে আর শত্রুরা আমাদের ওপর আক্রমণ করত। বিলোনিয়া যুদ্ধের পর থেকে শত্রুরা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ভূমিকা গ্রহণ করে আর আমরা আক্রমণকারীর। আমাদের ব্রিগেডের (জেড ফোর্স) প্রথম আক্রমণ পরিচালনা করেন মেজর মইন-উল হোসেন চৌধুরী, (১ম ইস্ট বেঙ্গল)। ডেল্টা কোম্পানি নিয়ে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ ও ব্রেভো কোম্পানি নিয়ে ক্যাপ্টেন হাফিজ এ আক্রমণের ব্যূহ রচনা করেন। আর ক্যাপ্টেন মাহবুব (যিনি পরে সিলেটের রণাঙ্গনে শহীদ হন) কাট অফ পার্টি নিয়ে ওঁৎ পেতে বসে শত্রুর ডিফেন্সের পেছনে। আক্রমণ করাকালে একটি বস্তুর প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি, তাহলো সিংহ-হৃদয়। ডিফেন্সে যারা থাকে তারা বাঙ্কারে থাকে; ফলে স্বভাবতই ছোট ছোট হাতিয়ার এমনকি ডাইরেক্ট আর্টিলারি শেল থেকে রক্ষা পায়। সেজন্যই সাধারণত দেখা যায়, একটি ডিফেন্সকে আর্টিলারি থেকে শুরু করে ট্যাংক ও বিমান হামলা করে সেই ডিফেন্সটিকে তছনছ করে ফেলার পরও মাত্র দু'একজন সাহসী যোদ্ধা অকুতোভয় মনোবলে বলীয়ান হয়ে বাঙ্কার থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির মাঝে মাথা নিচু করে মুখ থুবড়ে পড়ে না থেকে আক্রমণকারীর ওপর পাল্টা গুলিবর্ষণ করে পায়ে পায়ে এগিয়ে আসা আক্রমণকারীর আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ করে দেয়। তার প্রধান কারণই হচ্ছে আক্রমণকারীর এসেম্বলি এরিয়া পর্যন্ত লুকিয়ে আসে কিন্তু এফইউপি'র পর থেকে সোজা দাঁড়িয়ে সঙ্গীন উঁচু করে লক্ষস্থলের দিকে এগিয়ে যায়। এই এফইউপি (ফর্মিং আপ প্লেস) সাধারণত লক্ষস্থল (টার্গেট) থেকে পাঁচশ' থেকে ছয়শ' গজ দূরে হয়ে থাকে। পদাতিক বাহিনী এই দূরত্ব তিন মিনিটে একশ' গজ এই হিসাবে অতিক্রম করে, ফলে বিশ থেকে ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত শত্রুর ছোট ছোট হাতিয়ার থেকে শুরু করে মাটিতে পোঁতা মাইন আর পেছন থেকে নিক্ষিপ্ত আর্টিলারি ফায়ার, এমনকি ট্যাংক ও বিমান হামলা সবকিছুর টার্গেট হয়েও পায়ে পায়ে এগুতে থাকে। তাই বুঝি বলা হয়, যে সৈন্যদল কমান্ডারের হুকুমে নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সাহস রাখে, আর সাহস রাখে বলেই যুদ্ধের ময়দানে আক্রমণকারী সৈন্যদল হলো সবার সমস্যা। লাল, নীল আর সবুজ রঙের বাহার সে সালামকে ভূষিত করা যায় না। সে সালাম রক্তাক্ত দেহের রঞ্জিত হস্তের সংগ্রামী সালাম। শহীদের রক্তের মতোই শাশ্বত অমর সে সালাম। অন্যদিকে, প্রথাগত প্রতিরক্ষা অবস্থান আক্রমণ করাতে ঝুঁকি আরো অনেক বেশি, কারণ শত্রু শুধু সব ধরনের আত্মরক্ষামূলক পদ্ধতিতে বলীয়ান নয় বরং সব ধরনের আক্রমণের মোকাবেলা করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। সেজন্যই সাধারণত একটি লোক ডিফেন্সে থাকলে তিনটি লোক তাকে আক্রমণ করতে যেতে হয় এবং তিনটি লোক আক্রমণ করলেই যে আক্রমণ সার্থক হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। বরং শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে লোকটি ডিফেন্সে থাকে তার মনোবল ভেঙে না পড়লে একের ওপর তিনের এ আনুপাতিক আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। অবশ্য মুক্তিযুদ্ধে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিকের অভাবে এ অনুপাত আমরা কোনোভাবেই রক্ষা করতে পারিনি।

ফলে অধিকাংশ সময় যেখানে কোম্পানি ডিফেন্সে থাকলে ব্যাটালিয়ন অ্যাটাক করা উচিত ছিল, সেখানে কোম্পানির ওপর কোম্পানি অ্যাটাক করেছে। সব ধরনের সুষ্ঠু আক্রমণই ব্যর্থ হয়ে যায়, যদি পূর্বাহ্নে পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হয়। আর সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেয়া তখনই সম্ভব হয়, যখন কমান্ডার নিজে চুপি চুপি শত্রু শিবির দেখে আসে—মিলিটারি ভাষায় এই চুপি চুপি দেখে আসার নাম হচ্ছে 'রেকি' অর্থাৎ গা-ঢাকা দিয়ে শত্রুর বাঙ্কার থেকে শুরু করে রসদপত্র আনা-নেয়ার রাস্তা, হাতিয়ারের ক্ষমতা, এসব কিছু জানলে আক্রমণের একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা যায়। অবশ্য প্রায় প্রত্যেক লড়াইতে দেখা যায়, সাধারণত কমান্ডার নিজ প্রাণের মায়ায় চুপি চুপি শত্রুর শিবির দেখা হতে বিরত থাকে।

বাংলা মায়ের দামাল ছেলে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ ছিলেন এক অভূতপূর্ব ব্যতিক্রম, অনন্য সাধারণ সৈনিক। পাকিস্তানের কোয়েটা থেকে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে পালিয়ে এসে তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেন। যোগ দেওয়ার পর থেকে শত্রুর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানার জন্য অস্থির হয়ে পড়েন। ময়মনসিংহের কামালপুর বিওপি ছিল শত্রুদের দুর্ভেদ্য ঘাঁটি কারণ জল ও স্থল উভয় পথে জামালপুর-ময়মনসিংহ-ঢাকা সড়কের প্রবেশদ্বারই ছিল এ কামালপুর। তাই শত্রুর এখানে বাঙ্কারগুলো অত্যন্ত মজবুত করে তৈরি করে। বাঙ্কারের প্রথম আস্তরে মাটি ও টিনের দেয়াল, তারপর ছয় ইঞ্চি থেকে এক ফুট ব্যবধানে রেলের লোহার বিম। এই একই প্রকার ব্যবধানে পাকা সিমেন্টের আস্তর। বাঙ্কারের ওভারহেড কাভারের বেলায়ও একই প্রকার প্রস্তুতি নেয়া হতো—প্রত্যেকটি বাঙ্কারই প্রায় ঘরের মতো উঁচু, অন্যদিকে সব ডিফেন্স টানেলের মারফত যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল; এদিকে মাইন, বুবিট্রেপ ও বাঁশের কঞ্চি ডিফেন্সটিকে দুর্ভেদ্য দুর্গের মতো করে রেখেছিল। পরপর দু'দিন রেকি করার পরও সালাহউদ্দিন স্বচক্ষে শত্রুশিবির দেখার জন্য লে. মান্নানকে সঙ্গে করে তৃতীয়বারের মতো রেকি পেট্রোল নিয়ে নিজে শত্রুশিবিরের দিকে গেলেন। বিওপির কাছে পৌঁছে জমির আইলের ওপর লে. মান্নান, সুবেদার হাসেম, নায়েক সফি ও দলের অন্য সবাইকে রেখে শুধু সুবেদার হাইকে সঙ্গে করে শত্রুর বাঙ্কারগুলো রেকি করতে গেলেন। বলাবাহুল্য, পাকিস্তানিরা রাতে সব সময় সেকেন্ড লাইন ডিফেন্সে চলে যেত। কামালপুর রণাঙ্গনে শত্রুরা সাধারণত দিনের বেলায় অনেক এলাকাজুড়ে ডিফেন্স নিয়ে থাকতো, কিন্তু রাতেরবেলায় দূরের বাঙ্কারগুলো ছেড়ে দিয়ে ছোট অথচ ঘন ডিফেন্সে চলে যেত। খালি বাঙ্কারগুলো দেখে সালাহউদ্দিন ও হাই আরো ভেতরে চলে গেলেন। এমতাবস্থায় দু'জন শত্রুসেনা সম্ভবত পেট্রোলিং করে ফিরে আসার সময় এদের দু'জনের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। একশ' পাঁচ পাউন্ড ওজন আর ৫'-৫'' উচ্চতা বিশিষ্ট ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছয়ফুট লম্বা খান সেনার ওপর, যার হাতে জি-থ্রি রাইফেল ছিল। খানসেনা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে 'সানু খালেদ হু' (আমি খালেদ) বলে নিজেকে সঙ্গীর কবল থেকে ছাড়াতে গিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারল যে, আসলে তারা মুক্তিবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে খান সেনা সালাহউদ্দিনের হালকা দেহ মাটিতে ফেলে দিয়ে গলা টিপতে শুরু করে। সালাহউদ্দিন 'মান্নান' বলে চিৎকার করে উঠলেন,

মান্নান ছুটে এলো। স্টেন ধরে জিজ্ঞাসা করল, 'উপরে কে'? সালাহউদ্দিন গোঙানীর স্বরে বলল 'উপরেই তো ওই শালা'। লে. মান্নান গাব গাছের নিচে তাড়াতাড়ি পজিশন নিলেন। এদিকে সুবেদার হাইকে 'হ্যান্ডস আপ' বলার সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে খানসেনার জি-থ্রি রাইফেল কেড়ে নিলেন, কিন্তু খানসেনা মুহূর্তের মধ্যে পেছনের বাঙ্কারে ঢুকে পড়লো। আর নায়েক শফি, যে এতক্ষণ ইতস্তত করছিল গুলি করবে কী করবে না (কেননা ঘুটঘুটে অন্ধকারে কার গায়ে গুলি লাগবে বলা মুশকিল), মুহূর্তের মধ্যে ধাবমান শত্রুর দিকে গুলি ছুড়ল, অবশ্য গুলি হাই এবং খানসেনার মাঝখান দিয়ে চলে যায়। এদিকে শত্রু বাঙ্কার থেকে গুলি ছুড়লো কিন্তু সম্ভবত অন্ধকারে ঠাহর করতে পারেনি বলে বাঁ পাশের দালানে গিয়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে হাই বাঙ্কার লক্ষ্য করে স্টেনের এক ম্যাগাজিন গুলি ছুড়লো। গুলি ছুড়ে জি থ্রি রাইফেলসহ ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনের দিকে এগিয়ে এলো। গাব গাছের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় মান্নান আস্তে জিজ্ঞেস করল 'কে'? ত্বরিত বেগে 'আমি হাই' বলে সালাহউদ্দিনের ওপরে অবস্থানরত খানসেনাকে স্টেনের ব্যারেল দিয়ে গুঁতো দিলো। ওপরের লোকটি সালাহউদ্দিনকে ফেলে দৌড়াতে শুরু করলো। সুবেদার হাই ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। অতঃপর রাইফেল দু'টি নিয়ে ত্বরিত বেগে শত্রুশিবির ত্যাগ করে। এদিকে রাইফেল চেক করে দেখা গেল যদিও জি থ্রির চেম্বারে গুলি ভরা ছিল না কিন্তু থ্রি নট থ্রি রাইফেলের চেম্বারে গুলি ভরা ছিল। সালাহউদ্দিন হেসে বলল, 'শালার বেটা ভড়কে না গেলে আমাকে অতি সহজেই মারতে পারতো।'

কামালপুর বিওপি আক্রমণ

নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এসে সালাহউদ্দিনের সাহস গেল আরো বেড়ে। এ রেকি পেট্রোল থেকে দু'টি জিনিস বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়; তাহলো সুবেদার হাই ও ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনের অদম্য সাহস ও অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্ন-মস্তিষ্ক। শফি ও লে. মান্নানের ঠাণ্ডা মাথায় অবস্থার মোকাবেলা করার সাহস। কিন্তু এতে আবার একটা গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয়তা প্রকাশ পায় যে, মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ আসন্ন, ফলে রাতারাতি শত্রু তাদের সৈন্য সংখ্যা বাড়িয়ে ফেললো। তাতে করে কামালপুরে পাক বাহিনীর ৩১ বেলুচ ব্যাটালিয়নের সৈন্য সংখ্যা দাঁড়ালো দুই কোম্পানি (রাজাকার ছাড়া)। এজন্য বলা হয়, রেকি পেট্রোলের সময় শত্রুর সামনাসামনি হওয়াকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতে হয়। দু'দিন পর ৩০-৩১ জুলাই প্রথম ইস্ট বেঙ্গল (সিনিয়র টাইগার) রাতের আঁধারে রওনা হলো। প্রথমে সালাহউদ্দিনের ডেল্টা কোম্পানি, ফলোআপ কোম্পানি হলো ক্যাপ্টেন হাফিজের 'ব্রাভো' যার পিছে হলো ব্যাটালিয়ন 'আর' গ্রুপ এবং 'আর' গ্রুপে ছিলেন মেজর মইন এবং সঙ্গে ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান। সম্ভবত ব্রিগেডের প্রথম অ্যাটাক সরেজমিনে তদারক করার জন্য মেজর জিয়া নিজেও অ্যাটাকিং ট্রুপসের সঙ্গে রওনা হন। আক্রমণের 'এইচ আওয়ার' ছিল ৩০/৩১শে জুলাইয়ের রাত ৩-৩০ মিনিট। কিন্তু গাইডের অভাবে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল এফইউপিতে সময়মতো পৌঁছতে পারেনি, যার ফলে ৩০-৫০ মিনিটে সময় টাইম প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমাদের নিজস্ব আর্টিলারি ফায়ার যখন

শুরু হয় তখনো আমাদের ছেলেরা এফইউপিতে পৌঁছার জন্য প্রাণপণ দৌড়াচ্ছে। কাদামাটিতে এতগুলো লোকের এই দৌড়াদৌড়ির ফলে যথেষ্ট শব্দ হয়, ফলে দুশমনের পক্ষে আক্রমণের দিক নির্ধারণ করা একেবারে সহজ হয়। নিমিষের মধ্যে তাদের আর্টিলারি ফায়ার এসে পড়তে থাকে। এদিকে প্লাটুন পর্যায়ে ডেপথ টু আপ হওয়ার ফলে লোক আগে-পিছে হয়ে যায়, ফলে কমান্ড ও কন্ট্রোল কায়েম করা ভয়ানক মুশকিল হয়ে পড়ে। অন্যদিকে এসেম্বলি এরিয়া থেকে পূর্বনির্ধারিত এফইউপিতে আসায় মাঝপথে আমাদের নিজস্ব আর্টিলারি ফায়ার শুরু হওয়াতে ১ম ইস্ট বেঙ্গল তৎক্ষণাৎ সে অবস্থাতেই কোনোক্রমে ফর্মআপ হতে থাকে, ফলে সে কী চিৎকার আর হট্টগোল। আবার দিকনির্দেশনার অভাবে অ্যাডভ্যান্স করাকালীন একে অন্যের ওপর চড়ে বসে। আর অপেক্ষাকৃত নিচু কর্দমাক্ত জমির ওপর আসার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানি ও আমাদের যুগ্ম আর্টিলারির ক্রস ফায়ারিংয়ের নিচে আসার ফলে আমাদের বেশকিছু ছেলে হতাহত হয়ে পড়ে। অন্যদিকে ওয়্যারলেস সেট জ্যাম হওয়াতে সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়, তাতে বিশৃঙ্খলা চরমে পৌঁছায়। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, হাটবাজার বসেছে আর নীলকর আদায়কারী উট সাহেবদের দেখে কে কোথায় পালাবে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এ অবস্থায় ১ম ইস্ট বেঙ্গলের পক্ষে আক্রমণের ব্যূহ রচনা করা আদৌ সম্ভব ছিল না। বরং সৈন্যদলের পক্ষে পিছিয়ে আসাটাই অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কারণ আক্রমণকারী সেনাদল যদি ঠিকমতো ফর্মআপ না হতে পারে তবে তাদের পক্ষে আক্রমণ করার প্রশ্নই ওঠে না। এদিকে মেজর জিয়াউর রহমান বাঘের মতো গর্জে উঠলেন 'কাম অন, এট এনি কস্ট উই উইল লঞ্চ দি অ্যাটাক'। মেজর মইন ওয়্যারলেস ছেড়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছিলেন। আর ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন ও হাফিজ একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। একদিকে ১ম ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটল প্রসিডিউরের চামড়া পর্যন্ত তুলে ফেলছে, অন্যদিকে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মেঘাফোনে বাংলা-ইংরেজি-উর্দুতে মিশিয়ে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল তার সৈন্যদলকে। কারো বা কলার ধরে লাইন সোজা করে দিচ্ছে আর কাউকে বা হাফিজ স্টেনের বাঁট দিয়ে মারছে। মুঘল রাজপুতের প্রথম যুদ্ধে আশিটি যুদ্ধবিজয়ী রানা সংগ্রাম সিংহের রণভিজ্ঞ সৈন্যবাহিনীকে দেখে আকারে ছোট মুঘল বাহিনী ভড়কে গিয়েছিল যুদ্ধের প্রারম্ভেই; কিন্তু ভেলকিবাজির মতো বাবর সে সৈন্যবাহিনীকে বাগে এনে বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন। তাই সামরিক নেতা হিসেবে ইতিহাসে বাবরের স্থান অতি উঁচুতে। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন ও ক্যাপ্টেন হাফিজের কৃতিত্ব বুঝি সেখানেই। চরম বিশৃঙ্খলার মাঝে শুধু মনের জোর ও অদম্য সাহসে বলীয়ান হয়ে সালাহউদ্দিন ও হাফিজ সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজ নিজ কোম্পানিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত করতে সক্ষম হন এবং নিঃসন্দেহে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য আক্রমণ সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। যুদ্ধের ময়দানে ফলাফলটা সব সময় সবকিছুর পরিমাপ নয়, বরং ঘটনাটি কীভাবে ঘটিত হলো সেটাই সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়।

এফইউপির চরম বিশৃঙ্খলা থেকে সামান্য রেহাই পেয়ে ১ম ইস্ট বেঙ্গল সবেমাত্র অগ্রসর হয়েছে, অমনি পাকিস্তানি আর্টিলারির সেলভো ফায়ার এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে

আমাদের হতোদ্যম সৈন্যরা মাটিতে শুয়ে পড়ল। শেষ মুহূর্তে বুঝি আর আক্রমণ করা সম্ভব হলো না দেখে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লেন। একদিকে সমগ্র বাঙালি জাতির মান-ইজ্জতের প্রশ্ন, অন্যদিকে ২শ' ছেলের জীবন। সালাহউদ্দিন তখন মারছে লাথির পর লাথি। কারো বা কলার চেপে ধরে অকথ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল 'বেশরম, বেগায়রত, শালা নিমক হারামের দল, আগে বাড়'। আবার সৈন্যদলের মন চাঙ্গা করার জন্য নিজের অবস্থা জাহির হয়ে যাবে জেনেও পাক বাহিনী লক্ষ্য করে মেগাফোনে উর্দুতে বলছিল, 'আভিতক ওয়াকত হ্যায়, শালালোক সারান্ডার করো, নেহিত জিন্দা নেহি ছোড়েঙ্গে'। তার পরের ইতিহাস প্রতিটি বাঙালির গৌরবের ইতিহাস। এ যেন শুধু ইতিহাস নয়, মুক্তিকামী মানুষের প্রাণবন্যার ইতিহাস। সৈন্যরা তখন ছুটছে 'ঝড়ের মতো করতালি দিয়ে স্বর্গমর্ত করতলে' বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালার মতো। ১ম ইস্ট বেঙ্গল মুহূর্তের মধ্যে ভাসিয়ে দিল পাক বাহিনীর ডিফেন্সের প্রথম সারির বাঙ্কারগুলো। রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো গুরুগর্জন করে সিনিয়র টাইগার 'জয় বাংলা' আর 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনিতে প্রকম্পিত করে তুললো যুদ্ধের ময়দানকে। বাঙ্কার অতিক্রম করে বিশ-পঁচিশটা ছেলে কমিউনিটি সেন্টারে ঢুকে পড়লো। যাদের ভেতর মাত্র দু'একজন আহত অবস্থায় ফেরত আসতে পেরেছিল আর বাকি সবাই হাতাহাতি যুদ্ধে শাহাদাৎ বরণ করেন। প্রচণ্ডভাবে তখন হাতাহাতি যুদ্ধ চলছে। বাঘের থাবাতে যত্রতত্র ভূপাতিত পাকসৈন্যরা। পেছনে তখন আমাদের পক্ষের লাশ আসা শুরু হয়ে গেছে। মেজর জিয়া তখন বলছেন, 'আই উইল একসেপ্ট নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট ক্যাজুয়ালটি—বাট প্রেস দেম আউট, মইন।' আহত ক্ষতবিক্ষত জওয়ানরা বলছে, 'স্যার নিয়ে এলেন কেন? আর সামান্য বাকি—কী হতো আমি না হয় মরে যেতাম' গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল। এদিকে মাইন ফিল্ডে ফেঁসে যাওয়া সুবেদার হাইয়ের প্লাটুনের ডানে অবস্থানরত ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন বুঝতে পারলেন, শত্রুরা মাইনই ফিল্ডের পেছনের বাঙ্কারগুলো ছেড়ে দিয়ে আরো পেছনে সেকেন্ড লাইনে সরে গিয়ে কাউন্টার অ্যাটাকের প্রস্তুতি নিচ্ছে। ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনের মেগাফোনে হাইকে বললেন, 'হাই প্লাটুন নিয়ে ডানে যাও'। প্রথম আক্রমণ শুরুকালে সুবেদার হাইয়ের লোকসংখ্যা ছিল ৪০ জন; কিন্তু লক্ষে পৌছা পর্যন্ত সংখ্যা দাঁড়াল ১৫ থেকে ২০ জনে। এদিকে মাইনের আঘাতে নায়ক সফির হাত উড়ে গেল আর ধাবমান শত্রুদের পিছু নেয়াকালে জওয়ানরা বারবার সালাহউদ্দিনকে অনুরোধ করল, 'স্যার পজিশনে যান'। সালাহউদ্দিন ধমকে উঠল, 'বেটা স্যার স্যার করে চিৎকার করিস না। শত্রুরা আমার অবস্থান টের পেয়ে যাবে, চিন্তা করিস না, তুই বেটা আমার কাছে এসে দাঁড়া, গুলি লাগবে না, ইয়াহিয়া খান আজো আমার জন্য গুলি বানাতে পারেনি'। দু'দিকে বৃষ্টির মতো গুলির মাঝে দাঁড়িয়ে একথা বলা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। তাই বুঝি আজো ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কেঁদে কেঁদে খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের প্রাণপ্রিয় সালাহউদ্দিনকে। দ্বিতীয়বার মেগাফোনে 'হাই' বলার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনের সামনে দু'তিনটি শেল এসে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে সালাহউদ্দিন ধরাশায়ী হলেন। তার দেহটা প্রথমে বামে, পরে আধাডানে ও শেষে দড়াম করে পেছনের দিকে পড়ে গেল।

আশপাশের জওয়ানরা ছুটে এসে বলে, 'স্যার কলেমা পড়ুন'। কিন্তু বাংলার একান্ত গৌরব সালাহউদ্দিন উত্তর দিল, 'কলেমা পড়ার দরকার নেই। খোদার কছম, যে পেছনে হটবি তাকে গুলি করবো'। তারপর বিড়বিড় করে আবার বলে উঠলেন, 'মরতে হয় এদের মেরে মর, বাংলাদেশের মাটিতে মর'। এমন মরণ দুনিয়ার ইতিহাসে যে বিরল তা নয়, তবে এ মৃত্যুতে আনন্দ আছে, গর্ব আছে, যা সহজে করা যায় না। উঁচু মাটির ঢিবিতে পড়ে থাকা সালাহউদ্দিনের লাশটাকে দু'জন সৈনিক শত্রুর এলাকা থেকে টেনে আনতে চেষ্টা করলো; কিন্তু ব্যর্থ হয়ে দু'জনই মৃত্যুবরণ করে। সালাহউদ্দিনের গায়ে তখনো সেই সাদা শার্টটি ছিল, যা তার খুলে ফেলার কথা ছিল, কারণ সাদা শার্ট রাতেরবেলায় বেশি দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত সালাহউদ্দিনের ঘড়ি, স্টেন ও অন্যান্য কাগজ নিয়ে আসা হয়। ওদিকে ক্যাপ্টেন হাফিজ বেঁচে গেলেন অলৌকিকভাবে। হাতের স্টেন তোপের মুখে উড়ে গেলেও সামান্য আহত হয়ে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ ফুটবলার বেঁচে গেলেন। মেজর মইন যুদ্ধের ময়দানে প্রচণ্ড গোলাগুলির মাঝে একটি গাছকে আড়াল নিয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী দিচ্ছিলেন। এফইউপি থেকে লেফটেন্যান্ট মান্নান এগিয়ে এলেন কমান্ডিং অফিসারকে সাহায্য করতে। হঠাৎ করে একটা গুলি লে. মান্নানের উরু ভেদ করে চলে গেল। এদিকে এফইউপিতে ব্যাটালিয়ন অ্যাডজুটেন্ট ফ্লাইং অফিসার লিয়াকত (পাইলট) সামান্যর জন্য আর্টিলারির শেল থেকে বেঁচে গেলেন। অন্যদিকে আহত ক্যাপ্টেন হাফিজের ওয়্যারলেস সেট নিরাপদ জায়গায় রেখে পুনরায় হাফিজকে উদ্ধারকল্পে ল্যান্স নায়েক রবিউল ছুটল শত্রু অভিমুখে। কয়েক কদম যাওয়ার পর দু'হাতেই গুলি এসে লাগল, তথাপি তার প্রাণপ্রিয় ক্যাপ্টেন হাফিজকে উদ্ধার সংকল্প থেকে এতটুকু টলাতে পারেননি। যথাস্থানে পৌঁছে দেখে হাফিজকে অন্য কেউ নিয়ে গেছে। পড়ে থাকা ওয়্যারলেস ও রকেট লঞ্চার ওঠাবার সময় ল্যান্স নায়েক রবিউলের বুকে গুলি লাগল। রবিউল মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। মুখ থেকে রক্ত পড়তে লাগল। পাশের জওয়ান সাহায্যের ভয়ে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রাগে-দুঃখে রবিউল গ্রেনেড হাতে নিয়ে (উদ্দেশ্য বন্দি হব না) জীবনের আশা ত্যাগ করে নিকটবর্তী আখ ক্ষেতের দিকে দিল ভোঁ দৌড়। বৃষ্টির মতো শত্রুর গুলি আসছিল। কিন্তু আশ্চর্য, রবিউলের গায়ে লাগল না। কোনোমতে টেনেহিঁচড়ে আখ ক্ষেতে গিয়ে পৌঁছলেই রবিউলের প্রতীতি জন্মালো সে সহজে মরছে না। আর অন্যের সাহায্য ব্যতীত সে বাঁচতে পারবে। বাঁ হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ডান হাতের হাড়টি বের হয়ে আছে। নাকে-মুখে রক্তের ছোপ—এ অবস্থায় পালিয়ে যেতে দেখে এগিয়ে এসেছিল গ্রামের গৃহবধূরা, যদিও গৃহস্বামীরা দরজায় দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছিল। নিজের সাথী যখন মুখ ফিরিয়ে চলে গেল তখন সে আর কারো সাহায্য প্রত্যাশী নয়। তাই গৃহবধূদের হাত ছাড়িয়ে সে এগিয়ে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু পরের ইতিহাস আজো তার কাছে ঝাপসা হয়ে আছে। তার বিশ্বাস, দুই রমণীর কাঁধে ভর দিয়ে সে এফইউপির এরিয়া পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে। এদিকে সালাহউদ্দিনের মৃত্যুর পর আমাদের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলেও সেই ছত্রভঙ্গ অবস্থায় ছোট ছোট গ্রুপে ওরা শত্রুর বাঙ্কারগুলোর ওপর আঘাতের পর আঘাত হানতে থাকে। বেলা তখন ৭টা

বাজে। অযথা লোকক্ষয় না করে পশ্চাদপসারণ করা শ্রেয় জেনেও মেজর মইন তার সৈন্যদলকে কিছুতেই পশ্চাদপসরণ করতে পারছিলেন না, আমাদের আর শত্রুর লাশে কমিউনিটি সেন্টার ভ:র গেল—শেষ পর্যন্ত বেলা সাড়ে ৭টার দিকে আমাদের সৈন্যদল পশ্চাদপসরণ করে। এ যুদ্ধে আমাদের একজন অফিসারসহ ৩২ জন নিহত কিংবা নিখোঁজ, আর দু'জন অফিসারসহ ৬৬ জন আহত হয়। শত্রুদের লাশের সংখ্যা ৩ ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যেতে গ্রামের লোকেরা দেখেছে। পরদিন হেলিকপ্টারে পাক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসাররা সম্ভবত জিওসি আসেন কামালপুর পরিদর্শন করতে। বলাবাহুল্য, ওইদিনই পাক বেতারে কামালপুর যুদ্ধের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়, প্রায় চারশ' দুষ্কৃতকারী নিহত হয়েছে। এক অপারেশনে এত বড় সংখ্যক দুষ্কৃতকারীর নিহত হওয়ার সংবাদ ইয়াহিয়া বেতারে আর কখনো প্রচার করা হয়নি।

বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণ

জেড ফোর্সের দ্বিতীয় আক্রমণ পরিচালনা করেন মেজর শাফায়াত জামিল (৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) ৩১ জুলাই ১৯৭১ সালে প্রায় ৩৫০ জন লোক নিয়ে দেওয়ানগঞ্জ-বাহাদুরাবাদ ঘাট আক্রমণের জন্য ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে রওনা হন। ওই অঞ্চলের একজন আইএ পাস ছেলে বরারামপুর গ্রামের নাসের ছিল এই আক্রমণের পথ প্রদর্শক। যার দূরদর্শিতার ফলে ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ৩টি বড় বড় নদী ক্ষিপ্রগতিতে সবার অগোচরে ১১টি নৌকাসহ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় এবং গানবোটে পাহারারত পাকসৈন্যদের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে পাশ কেটে ১৫/২০ মাইল পথ নিরাপদে অতিক্রম করে রাত তিনটার সময় পূর্ব নির্দিষ্ট এফইউপিতে পৌঁছতে সক্ষম হয়। ক্যাপ্টেন আনোয়ারের অধীনে আলফা কোম্পানি নৌকাঘাটে পাহারারত থাকে আর ১২ নাম্বার প্লাটুন ইপিআরের নায়েব সুবেদার আলী আকবরের অধীনে কাট অব পার্টির কাজ করে। ডি কোম্পানি লে. নুরুন্নবীর অধীনে বাহাদুরাবাদ ঘাটে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হয়। নায়েব সুবেদার বুলু মিয়া ১১ নাম্বার প্লাটুন নিয়ে যায় যাত্রীবাহী ট্রেনের দিকে। আর সুবেদার করম আলী ১০ নাম্বার প্লাটুন নিয়ে যায় রেলওয়ে ট্রেনের জেটির দিকে। তখন ভোর হয় প্রায়। রেললাইনের পাশে দুশমনরা তখন স্ট্যান্ড টুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। এদিকে একটি যাত্রীবাহী ট্রেন তখন রেললাইনের ওপর শানটিং করছিল। গাড়ি শানটিং করে পিছে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুবেদার করম আলী, প্লাটুনের রকেট লঞ্চারটি নিজে কাঁধে করে এগিয়ে প্রথম মালগাড়িতে অবস্থানরত জেনারেটর এবং পরমুহূর্তে অগ্রসরমান শানটিং গাড়ির ইঞ্জিনকে ফায়ার করে অকেজো করে দেন আর সঙ্গে সঙ্গে ডানে অবস্থানরত সুবেদার ভুলু মিয়ার প্লাটুন ফায়ার শুরু করে এবং গ্রেনেড পার্টি রেলের প্রত্যেক কামরায় গ্রেনেড ছুড়তে শুরু করে। প্রায় প্রত্যেক কামরাতেই ৩/৪ জন খাকি পোশাক পারহিত লোক শুয়ে ছিল। এদিকে অ্যাকশন পার্টি উইড্রলের সঙ্গে সঙ্গে ৩´´ মর্টর গর্জে ওঠে, ফলে স্থায়ীভাবে যে দু'টি ফার্স্টক্লাস কামরা আর্মি গার্ডের জন্য রাখা হয়েছিল তা ধসে পড়ে, এছাড়া রেলওয়ে বগি এবং ঘাটে অবস্থানরত মালগাড়ি বহনকারী স্টিমার এবং জেটির ছাদের ওপর দুশমনের

মেশিনগানের বাঙ্কার ভীষণভাবে বিধ্বস্ত হয়। স্টেশন এরিয়া থেকে উইড্র করাকালীন দুশমনের একটি গুলি নায়েব সুবেদার বুলু মিয়ার বাম বাহুতে লেগে পিঠ দিয়ে বের হয়ে যায়। এই আক্রমণকালে নায়েব সুবেদার বুলু মিয়া ছাড়া আমাদের পক্ষে কেউ হতাহত হয়নি। পরদিন সুবেদ র করম আলীর পার্শ্ববর্তী ব্রিজ উড়ানোর আওয়াজ শুনে দেওয়ানগঞ্জে অবস্থানরত পাক সৈন্যরা বাহাদুরাবাদ ঘাটের দিকে ধাবমান হলো। সঙ্গে সঙ্গে আলফা ও ডেল্টা কোম্পানি ক্ষিপ্রগতিতে দেওয়ানগঞ্জ বাজার, সুগার মিল ও রাজাকার হেডকোয়ার্টার পর্যায়ক্রমে আক্রমণ করে সেই এলাকা সম্পূর্ণভাবে তছনছ করে। তিনদিন বিজয়ের বেশে অবস্থান করার পর ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিজ ক্যাম্পে ফেরত আসে। এই আক্রমণটিকে একটি পরিপূর্ণ আক্রমণ না বলে রেইড বলা অধিক সমীচীন। এই সফলতার প্রধান কারণ হচ্ছে চৌকস গাইড ধীরস্থির ও সিংহ-হৃদয়ের অধিকারী মেজর শাফায়াত জামিলের সৃষ্ট পরিকল্পনা ও দক্ষ পরিচালনা এবং ৩য় ইস্ট বেঙ্গল, ইপিআর ও বেঙ্গল রেজিমেন্টের লোক অধিক সংখ্যায় থাকার জন্য ব্যাটেল প্রসিডিউর মোতাবেক কার্যক্রম বাস্তবায়িত করতে পেরেছিল বলেই। কিন্তু পূর্ববর্ণিত ১ম ইস্ট বেঙ্গলের কামালপুর আক্রমণ সার্থক আক্রমণ বলা চলে না, কারণ এলাকা দখল করে নিজেদের কব্জার মধ্যে রাখার প্রয়াস আমরা করিনি বরং ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিনের মৃত্যুর পরপরই শত্রুরা ডিফেন্স ছেড়ে দিয়ে আমাদের পাল্টা আক্রমণ করে, ফলে আমাদের হতোদ্যম ক্ষত-বিক্ষত সৈন্যরা আরো ভড়কে যায়, যার ফলে সালাহউদ্দিনের লাশটাও ফেরত আনা সম্ভব হয়নি—এমন প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েও অতি অল্পসময়ের মধ্যেই শত্রদের এই পাল্টা আক্রমণ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। এ ধরনের আত্মরক্ষামূলক মনোভাবকে মিলিটারি ভাষায় 'এগ্রেসিভ ডিফেন্স' বলা হয়। প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের আক্রমণ, যেহেতু ডেলিবারেট ছিল সেহেতু আর্টিলারি ফায়ার ছিল টাইম প্রোগ্রাম অনুযায়ী। কিন্তু আক্রমণকালে এ জিনিসটা প্রকট হয়ে উঠেছিল যে, ইঙ্গিতে বা 'অনকল' রাখাই যেন ভালো ছিল। তাতে করে মনে হয় মাঝপথে আর্টিলারির ক্রসফায়ারে যে হতাহত হয়েছিল তা এড়ানো যেত। এতদসত্ত্বেও কামালপুর আক্রমণ বাংলাদেশের ইতিহাসে এক চমকপ্রদ অধ্যায়ের সূচনা করে। এই আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত রেইড ও অ্যাম্বুশ করা ছাড়া বাঙ্কারে বসে থাকা শত্রুর বিরুদ্ধে পরিপূর্ণভাবে মুখোমুখি লড়াইতে আমরা অবতীর্ণ হইনি। কিন্তু এই আক্রমণেই প্রমাণিত হলো, বাঙালিরা ব্রিজ উড়াতে কিংবা রাতের আঁধারে রেইড ও অ্যাম্বুশ করতে যেমন পারদর্শী তেমনি হাতাহাতিযুদ্ধেও সমপারদর্শী। ওই সময় এমন একটি অ্যাকশনের দরকার ছিল—কারণ তখন পর্যন্ত খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত হয়ে আমরা পিছু হটতে হটতে সীমান্তের ওপারে চলে যেতে বাধ্য হই। ফলে স্বভাবতই মনোবল কিছুটা ভেঙে পড়ে। তাই মনোবল চাঙ্গা করার জন্য বিশেষ করে আমাদের স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছেলেদের মনে সাহস বাড়ানোর জন্য এবং এ বিশ্বাস জন্মানোর জন্য যে খানসেনাদের বাঙ্কার থেকে তাড়ানো তেমন কষ্টসাধ্য নয়, যদি কেউ গুলিকে ভয় না করে। সালাহউদ্দিন নিজের জান দিয়ে আমাদের মনে এ প্রতীতি জন্মিয়েছিলেন। নির্যাতিত, অবহেলিত ও পদদলিত মানবতার প্রতীক স্পার্টাকাস

হয়তোবা নিজে মরে যায় কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে জন্ম নেয় নিস্পেষিত মানব আত্মার লেলিহান বহ্নিশিখায় ইতিহাসের অমর বীরেরা। তাই বুঝি সালাহউদ্দিনের মৃত্যু বাংলাদেশের অগ্রগামিতার অভিযানের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়—আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল।

নকশি বিওপি আক্রমণ

জেড ফোর্সের আক্রমণ পরিচালনা করেন মেজর আবু জাফর মোহাম্মদ আমিনুল হক। ব্যূহ রচনার দায়িত্বে নিয়োজিত হই আমি নিজে। অবশ্য ২ আগস্ট তারিখে আক্রমণ রহিত করা হয়। ৩ আগস্ট আমি ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্রাভো ও ডেল্টা—এ দুই কোম্পানি যোদ্ধা নিয়ে আক্রমণ করি নকশি বিওপি। এর আগে আমি তিনদিন পুরো বিওপি রেকি করেছি। নকশি বিওপির পূর্বতন সুবেদার হাকিম ও তার সাথীরা আমাকে এ বিষয়ে সক্রিয় সাহায্য করেছেন। তার কারণ এই বিওপি তাদের নখদর্পণে ছিল। প্রথম দিন আমি নিজে সুবেদার হাকিমসহ নকশি বিওপির আশপাশ রেকি করি। একটি উঁচু টিলা থেকে। বাইনোকুলারে সুবেদার হাকিম আমায় বলেছিল কোথায় শত্রুদের বাঙ্কার, কাঁটাতার, বাঁশের কঞ্চি, মাইন ফিল্ড, কুক হাউস, মসজিদ ও বিওপির প্রবেশপথ, কোথায় কত শান্ত্রী থাকতে পারে। তারপর গারো পাড়ায় গিয়ে চুপি চুপি দেখা করলাম শত্রুশিবিরে আমাদের প্রেরিত বাবুর্চির সঙ্গে। বাবুর্চি বলল, ৪৫ জন আর্মির লোক আসছে এবং গোটা ৫০/৬০ জন রাজাকারও বিভিন্ন ডিউটিতে আছে। দ্বিতীয় দল প্লাটুন কমান্ডারকে নিয়ে আমি আবার স্বচক্ষে হালছটি গ্রাম, শালবন ও নালা পথ রেকি করে কোথায় কোন হাতিয়ার হবে এবং কোথায় এফইউপি হবে সবাইকে পায়ে পায়ে দেখিয়ে দিলাম। ১ আগস্ট আমি সব সেকশন কমান্ডারদের পুরো সেকশন কমান্ডারকে নিয়ে পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায় আবার দেখিয়ে দিলাম যাতে করে রাতের আঁধারে ভুল না করে। এদিকে সাপোর্টিং হাতিয়ার মেশিনগান, ১০৬ মি.মি. ও ৭৫ মি.মি. আর আর এর জন্য বাঙ্কার বানানোর জন্য ২৫টি আড়াইমনি চটের বস্তা নিয়ে এলাম। এত প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয়েছিল শালবনের ঘন আড়ালের জন্যই। অবশ্য পাকিস্তানিরা উত্তরদিকে বিওপির চারিপাশে প্রায় ৬০০ গজ এলাকায় সব গাছপালা, জঙ্গল পরিষ্কার করে কিলিং জোনের ফিল্ড অব ফায়ার একেবারে সাফ রেখেছিল। তৃতীয় দিনে রেকি করাকালে হালছটি গ্রামের নালার পাশে আমরা একটি আমগাছের মাথায় লাল ফুলকে মানুষ মনে করে থমকে দাঁড়ালাম। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে একগাল হাসি হাসতে যাব এমন সময় ঝুপ করে একটি শব্দ হলো, মনে হলো একটি লোক নালার ভেতর দিয়ে পালাচ্ছে। আমার সেকশন কমান্ডাররা জড়সড় হয়ে একে অপরমুখী হয়ে পজিশনে গেল। দেখে পিত্তি জ্বলে গেল। আসলে তাদের আরো ছড়িয়ে পড়ে একে অপরের বিপরীত দিকে মুখ করে (ডায়মন্ড ফর্মেশন) অলরাউন্ড ডিফেন্স নেয়া উচিত ছিল। বুঝলাম আরো অনেক ট্রেনিংয়ের দরকার। ভাগ্যিস এই ঝুপ আওয়াজ হয়েছিল নালাতে পাড় ভেঙে ধসে পড়া মাটি থেকে, তা না হলে গোলগাল বসে থাকা আমার দলটিকে নিমিষের মধ্যে শেষ করে দেয়া একজন শত্রু-সৈন্যের পক্ষেই যথেষ্ট ছিল। ফেরত আসার সময় একটি গারো মেয়ে আমাকে দেখে ঝুপ করে পাহাড়ের গাছের সঙ্গে

মিশে রইল। আমি ধারণাই করতে পারিনি যে, অমন ফাঁকা জায়গায় কোনো মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে। আমি মেয়েটিকে পাশ কেটে চলে যাওয়ার পর যখন সুবেদার হাকিম ইশারায় আমায় দেখালো, আমি তো 'থ'। ভাবলাম জঙ্গলে চলতে হলে এই জংলীদের থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

২ আগস্ট বিকেলে মেজর জিয়াউর রহমান স্বচক্ষে আমার প্ল্যান অনুযায়ী হাতিয়ারের অবস্থানগুলো দেখলেন। রাতে রাস্তা থেকে গাড়ি পড়ে যাওয়াতে যখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় তখন ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে ১ম ইস্ট বেঙ্গলের ক্যাপ্টেন মাহবুব (যিনি পরে ৮ ডিসেম্বর '৭১ সালে সিলেট রণাঙ্গনে শহীদ হন) আমাকে বলেন, 'স্যার মনে কনফিউশন থাকলে অ্যাটাক করতে যাবেন না'। আমি হেসে বললাম, 'বেওকুফের মতো মরতে আমি রাজি নই'। ৩ আগস্ট রাত ১২টার দিকে এসেম্বলি এরিয়া হতে রওনা হবো। দেখি বাহাদুরাবাদ ঘাট বিজয়ী বীর মেজর শাফায়াত জিপ নিয়ে হাজির, 'আমিন রিমেম্বার, ডোন্ট গো ফর ইমপসিবল টাস্ক অল বাই ইওরসেলফ। অল দি বেস্ট।' বলাবাহুল্য, আর্মিতে ইংরেজিতে কথোপকথনটা একটু বেশি বৈকি, যদিও মরার আগে আমরা বরাবরই বাংলায় চিৎকার দিয়েছি। এসেম্বলি এরিয়া হতে অত্যন্ত সাবলীল গতিতে আমার সৈন্যরা এফইউপিতে পৌঁছায়। এমনকি মাঝপথে নালা ক্রস করার সময়ও কোনো শব্দ করেনি, কারণ পূর্ববর্তী দু'রাত বিনা শব্দে পানির ওপর চলার প্র্যাকটিসও করেছিলাম। অন্যদিকে একই সময় দুই প্লাটুন রাঙ্গাটিয়াতে যায় কাটঅফ পার্টি হিসেবে। যদিও ইপিআর গাইড ছিল, তথাপি মনে হয় এফইউপি মার্কিং করলে যে সামান্য বিশৃঙ্খলাটুকু হয়েছিল তাও হতো না। সৈন্যরা যখন এফইউপিতে যাচ্ছে আমি তখন ৮/১০ জন গণযোদ্ধা নিয়ে মেশিনগান ও আরআর-এর এমুনেশন বাঙ্কারে পৌঁছিয়ে দিই। উদ্দেশ্য ওদের মনে সাহস জোগানো, কারণ যুদ্ধেও ফলাফল এদের ওপর অনেকখানি নির্ভর করছিল। বাঙ্কারের পেছনে অবস্থানরত সুবেদার হাকিম তখন রীতিমতো ক্ষেপে গেছেন। কারণ ইনি নিজে তো খাবার পাননি নিজের ছেলেরা যারা সারারাত ওই আড়াইমনি বস্তায় বালি ভরে বাঙ্কার বানিয়েছে ওরাও পায়নি। দেমাক ঠাণ্ডা রেখে বললাম, 'সাব ভুলি নাই তবে আপনাদের রুটি পেছনে এসেম্বলি এরিয়াতে রয়ে গেছে, কাউকে পাঠিয়ে দিয়ে নিয়ে আসেন'। এফইউপিতে আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিন একাকী শত্রুমুখে ঠেলে না দিয়ে আমার সঙ্গে উনি নিজেও যেতে চাইলেন। আমি সেই দুঃসাহসিক বীরযোদ্ধাকে ইকোনমির কথাটা বুঝাতে চাইলাম। নিছক ভাবালুতাতে কাজ হবে না এক সঙ্গে দু'জন অফিসার হারানো মুক্তিবাহিনীর জন্য নিছক বোকামি। রাত ৩টা ৩৫ মিনিটে এফইউপিতে পজিশন নিলাম। আমার ডানে ১২ নং প্লাটুন আর আমার এক ভাগ্নে আইএ ক্লাসের ছাত্র জহিরুল আনোয়ার ওরফে সানু সাধারণ সৈনিক হিসেবে আমার পাশেই ছিল। যুদ্ধের ময়দানে আমার ভাগ্নের উপস্থিতি আমি টের পাইনি। স্বাধীনতার পর জার্মানি থেকে চিকিৎসা সেরে ফেরত আসার পর পরিচয় ঘটে অষ্টম বেঙ্গলের সেই সৈনিকের সঙ্গে চৌমুহনী পোস্ট অফিসে, যে পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টার ওর পিতা একেএম শফিকুর রহমান।

এফইউপিতে পজিশনে গিয়ে ৩টা ৪৫ মিনিটে ওয়্যারলেসে বললাম 'জোরে মার' সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর্টিলারি গর্জে উঠল। বুঝতে পারলাম আর্টিলারির আওয়াজের ধমকে আমার স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকরা এফইউপিতে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে। মাটি কামড়ে পড়ে থাকাটা আরো প্রকট হয়ে উঠল যখন নিজের প্রিয় এইচ আওয়ার আর্টিলারি গোলাবর্ষণকালে দু'তিনটি রাউন্ড ভুলবশত ঠিক আমাদের এফইউপিতে এসে পড়ে। যদিওবা টার্গেট থেকে এফইউপি ছিল প্রায় এক হাজার গজ দূরে। মনে হয় এফইউপি শত্রুশিবির ও আমাদের আর্টিলারি পজিশন এক লাইনে ছিল বলে সহজে আর্টিলারির গোলা এসে এফইউপিতে পড়েছিল। অবশ্য পূর্বাহ্নে আর্টিলারির কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে সন্দিহান হলে আমি হয়তো ডানে হালছটি গ্রামের শালবনকে এফইউপি বানাতাম। হালছটি গ্রামের শালবনটি শত্রুশিবির থেকে মাত্র তিনশ' গজ দূরে ছিল। কিন্তু যেহেতু আমাদের আক্রমণের বেশ কিছুদিন আগে ওই শালবনকে এফইউপি বানিয়ে এফএফ কোম্পানি বিওপির ওপর আক্রমণ করেছিল, তাই আমি ওই শালবনটিকে এফইউপি বানাইনি। অন্যদিকে পূর্বদিন (২ আগস্ট) আমার পরিকল্পনা ছিল সামনের নালাকে এফইউপি বানিয়ে আর্টিলারির ফায়ার অনকল রেখে (দরকার মতো ব্যবহার করা) আক্রমণ করা। তাতে করে রাতের আঁধারে শত্রুর অজান্তে আমরা শত্রুশিবিরে দু'তিনশ' গজ ভেতরে পৌছে যেতাম আর নিজস্ব আরআর ও মেশিনগান দিয়ে শত্রুকে আচম্বিতে ঘায়েল করে শত্রুর ব্যূহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারতাম বলে আমার বিশ্বাস। আর বিশেষ দরকার মতো আর্টিলারি তো ছিলই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবস্থার চাপে পূর্ব পরিকল্পনা বদল করে প্রি-এইচ আওয়ার গোলাবর্ষণের কার্যক্রম নিতে বাধ্য হলাম। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, আমার ছয়টি ছেলে ঘটনাস্থলে গুরুতরভাবে আহত হয়, ফলে পুরো প্লাটুন আহতদের শুশ্রূষার নামে এফইউপিতেই থেকে যায়। এতে যথেষ্ট শোরগোলও হয়। অপরদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলির মাঝে (আমাদের আর্টিলারি গর্জে ওঠার মিনিট খানেকের ভেতর পাকিস্তানি আর্টিলারি গর্জে ওঠে) একবার মাটিতে শুয়ে পড়ে তারপর আবার দাঁড়িয়ে অগ্রসর হওয়া যথেষ্ট সাহসের কাজ বৈকি, বিশেষ করে আমার দুই কোম্পানির জন্য। কারণ আমার দুই কোম্পানিতে তিনশ' জনের মধ্যে তখন মাত্র দশ জন সামরিক বাহিনীর লোক গোটা আটেক ইপিআর এবং দু'তিনজন পুলিশের লোক ছাড়া বাকি সবাই সাতদিনের ট্রেনিংপ্রাপ্ত গ্রামবাংলার একান্ত সাধারণ মানুষ। প্রি-এইচ আওয়ার গোলাবর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে আমার ডানে অবস্থিত মেশিনগান ও আরআর প্রচণ্ডভাবে গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে হালছটি গ্রাম থেকে ইপিআরের প্লাটুনটি ভাঁওতা দেয়ার জন্য আক্রমণের ব্যূহ রচনা করে শত্রুদের ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিলো। এই কার্যক্রমগুলো অত্যন্ত সুষ্ঠু ও সাবলীল গতিতে হতে থাকে। ইপিআরের আক্রমণ চলাকালীনই আমরা চুপি চুপি এক্সটেন্ডেড লাইন ফরমেশন করে পায়ে পায়ে এগুতে থাকি। ৫০০ গজ আগে নালার কাছে পৌছে শুধু ২" মর্টার ওয়ালাদের নালাপাড়কে আড়াল রেখে ৩৩০ গজ আগে শত্রুশিবিরের ওপর ফায়ার করার নির্দেশ দিলাম। এই নির্দেশ না দিলেই যেন ভালো হতো, কারণ আমার এই নির্দেশের সুযোগে আমার স্বল্প ট্রেনিংপ্রাপ্ত সৈনিকরা নালাতে আড়াল নিয়ে নেয়, তাতে কমান্ড ও কন্ট্রোল একেবারে

শিথিল হয়ে পড়ে। নায়েব সুবেদার কাদের ও বাচ্চুর অধীনে ৫ ও ৬ নং প্লাটুন বিওপির গেটের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করার কথা ছিল কিন্তু তারাও নালার ভেতরে আড়াল নিয়ে মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করতে শুরু করে। সম্ভবত এজন্যই এফইউপি ত্যাগ করার পর 'ফায়ার এন্ড মুভ' পদ্ধতিতে আক্রমণ করা মিলিটারি একাডেমিতে (পাকিস্তান) বিতর্কের বস্তু ছিল এবং প্রায়ই বলা হতো এফইউপি ছাড়ার পর ডোন্ট গো টু দি গ্রাউন্ড এগেইন। নালাতে আমার সৈন্যদের এমন কাণ্ড দেখে শত্রুশিবিরের নিকটবর্তী এসেও আমি চিৎকার না করে পারিনি, এমনকি কাউকে কাউকে লাথি পর্যন্ত মেরেছিলাম। শেষ পর্যন্ত উপায়ান্তর না দেখে কলার চেপে ধরে আমি জোর করে আগে পাঠাতে শুরু করি। আমার বামে হাবিলদার নাছির তার সেকশন নিয়ে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ক্ষিপ্তগতিতে এগুতে থাকে এবং আমি নিজে নায়েক সিরাজকে সঙ্গে করে ডানে বাঙ্কারের দিকে এগুতে থাকি। আমাদের এই মনোবল দেখে শত্রুরা তখন পলায়নরত—ইতোমধ্যে আমরা এসল্ট হুংকার দিই এবং পর মুহূর্তে 'ইয়া আলী' বলে আমার সৈন্যরা সঙ্গীন উঁচু করে বেয়নেট চার্জের জন্য রীতিমতো দৌড়াতে শুরু করে। এদের উত্তেজনাকে বাড়ানোর জন্য নায়েব সুবেদার মুসলিম 'নারায়ে তাকবির' ধ্বনি করলে সৈন্যরা ঘন ঘন 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি করলে পুরো যুদ্ধের ময়দান প্রকম্পিত করে তোলে। আনন্দের আতিশয্যে আমার সিগন্যালম্যান ওয়্যারলেস সেট আমার সামনে এনে ধরলে আমি ধমকে উঠলাম 'তুমি নিজেই যা পার বলে পাঠাও'। পিছু পিছু সে ওয়্যারলেসে জোশের সঙ্গে বলে বেড়াচ্ছিল, হয়ে গেছে আর একটু বাকি বাঙ্কারে বাঙ্কারে যুদ্ধ হয় ইত্যাদি। ঠিক এমন সময় শত্রুদের আর্টিলারি শেলভো ফায়ার (এয়ার ব্রাস্ট) এসে পড়ল আমাদের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন ঢলে পড়ল, যার ভেতর সম্ভবত হাবিলদার নাসিরও ছিল। আমাদের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, আমার ডান পায়ে এসে একটা শেল লাগল—আঘাতটার গুরুত্ব উপলব্ধি করার আগেই জোশের সঙ্গে এগিয়ে আরো ৫০ গজ সামনের শত্রু বাঙ্কার থেকে মাত্র কিছু পথ বাকি, আমাদের গুটিকয়েক ছেলে তখন পলায়নরত শত্রুদের মারছে। কেউ কেউ তখনো মাইন ফিল্ডে ফেঁসে আছে এবং শত্রুর মাইনে উড়ে যাচ্ছে, কেউবা শত্রুর গুলি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় অনার্স স্টুডেন্ট শামছুল আলম মাইন কিংবা শত্রুর তোপের মুখে উড়ে গেল। ওই বিশ-পঁচিশটা ছেলের মন চাঙ্গা রাখার জন্য জোরে জোরে চিৎকার করে উঠলাম 'বিওপি একেবারে তছনছ হয়ে গেছে, আগে বাড়ো'। যদিও বিওপির মাটির দেয়াল আগের মতোই খাড়া ছিল। এমন সময় আমার বাম পায়ে বাঁশের কঞ্চি বিঁধল, আমি পড়ে গেলাম। সম্ভবত পড়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে আহত এক খানসেনা এলে সঙ্গীন নিয়ে বাচ্চা ছেলে সালাম (অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র এবং এক সুবেদার মেজরের ছেলে) আগেই খতম করে দিল খানসেনাকে। এদিকে যারা মাথা নিচু করে পেছনের নালা থেকে আন্দাজে ফায়ার করছিল তাদের ফায়ারে আমাদের দু'টি ছেলে জখম হলো। করার কিছুই নেই তখন। এর আগে এফইউপি থেকে এডভান্স করাকালীন নালাতে অবস্থান করাকালে অমন মাথা নিচু করে আন্দাজে ফায়ার করার জন্য আমি একটি ছেলের কাছ থেকে রাইফেল কেড়ে নিয়ে পেছনে পাঠিয়ে দেই। মাটিতে পড়ে গিয়ে আমি দু'জন

ধাবমান শত্রুকে গুলি করে ডানদিকের বাঙ্কারে অবস্থানরত শত্রুসেনাকে গুলি করার জন্য বিহারি ছেলে হানিফকে ঘন ঘন নির্দেশ দিচ্ছিলাম। ওই একটি বাঙ্কারে অবস্থিত শত্রুর নিখুঁত গুলিবর্ষণ আমাদের ভীষণভাবে ঘায়েল করছিল, তা না হলে আর কোনো বাঙ্কারে কোনো শত্রু ছিল না, বরং শত্রু তখন বিওপির পেছনের দেয়ালকে আড় করে সম্ভবত কাউন্টার অ্যাটাকের প্রস্তুতি নিচ্ছিল অথবা পলায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। অবশ্য হানিফ তখন ভীষণভাবে অনুরোধ করছে, 'স্যার আব পিছে চলা যায়ে, মাই কভারিং ফায়ার দে রাহাহু'। বলাবাহুল্য, বিহারি ছেলে ইপিআরের জওয়ান হানিফ ছিল আমার ব্যক্তিগত প্রহরী। বরিশালের এক বাঙালি মেয়েকে বিয়ে করেছিল হানিফ—বেশ কয়েকটা অপারেশন করার পরও সন্দেহভাজন হয়ে মুক্তিবাহিনী তাকে বন্দি করে। বন্দিশিবিরে স্পষ্ট বাংলায় সে আমাকে বলল, 'স্যার' আমি বেইমান না, একটা চান্স দিন, জান দিয়ে প্রমাণ করব' পিট চাপড়িয়ে আমি বললাম, হানিফ তুমি আজ থেকে আমার পার্সোনাল গার্ড। পারবে, 'স্যার' আমার জান থাকতে আপনার গায়ে গুলি লাগবে না, প্রত্যয় ভরা মুখে উত্তর দিল হানিফ। সত্যিই সে জীবিত থাকাকালীন আমার গায়ে গুলি লাগেনি (যদিও শেল লেগেছে)। হানিফকে দ্বিতীয়বার নির্দেশ দেয়ার আগেই হিস শব্দ হলো, হানিফ ঢলে পড়ল, মনে হয় ওর মাথায় গুলি লেগেছিল আর তার মাথার স্টিল হেলমেট ছিল না। ক্রল করে ওর হেবারসেকে ধাক্কা দিয়ে ক্ষীণস্বরে বলে উঠলাম 'হানিফ' কোনো সাড়া এলো না। প্রাণটা কেঁদে উঠল—সঙ্গে শত্রুর গুলিতে পাশের মাটি উড়ে গেল, বুঝতে পারলাম শত্রু আমায় দেখে ফেলেছে। সাইডরোল করে সরে যাওয়ার চেষ্টা করাকালীন বাম দিক থেকে একটা গুলি এসে আমার ডানহাতের কনুইতে লাগে। ঝা করে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলো। হাতের স্টেনটা ছিটকে পড়ল, বাঁ হাতে তা কুড়িয়ে নিলাম। কবজিটা বেঁকে নিচের দিকে ঝুকে পড়ল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। ফিল্ড ড্রেসিংটা বের করব, একঝাঁক গুলি এসে পাশের জমির আইলটা উড়িয়ে দিল। বুঝতে পারলাম শত্রুর পাঁচ গজের ভেতর থাকা সম্ভব না। আমাদের দু'ধারে শুধু লাশ আর লাশ। কারণ এর আগের মুহূর্তে শত্রুর এসওএস (সেভ আওয়ার সোল) এয়ার ব্রাস্ট আর্টিলারি ফায়ারে আমাদের যে আট-দশজন লোক শত্রু বাঙ্কারে ঢুকে পড়েছিল তারা ধরাশায়ী হলো। তার মধ্যে নায়েক সুজা মিয়াও ছিল। পাশে তাকিয়ে দেখি একটি কচি ছেলের লাশ। ছেলেটি কিছুক্ষণ আগে শত্রুর গুলিতে হতচকিত হয়ে শত্রুর ডান বাঙ্কার এড়িয়ে কোনাকুনি আরো ডানে অধিকতর নিরাপদ স্থান হালছটি গ্রামের দিকে যেতে চেষ্টা করছিল। ওর কলার চেপে ধরে বাঙ্কারের মুখোমুখি করে আঙ্গুল দিয়ে টার্গেট দেখিয়েছিলাম।

শত্রুশিবিরে পাঁচ গজের ভেতর থেকে বের হওয়ার জন্য ফিল্ড ড্রেসিং বের না করে সাইড রোল শুরু করলাম। উদ্দেশ্য ডানের ঢালু জমি দিয়ে অধিকতর নিরাপদ রাস্তাতে পশ্চাদপসরণ করা। কিছুক্ষণ সাইড রোল করার পর তাকিয়ে দেখি আসলে ডানে না গিয়ে আমি কোনাকুনি শত্রুশিবিরের দিকেই যাচ্ছি। মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে হবে—তাই একটু দম নিয়ে পেছনে তাকিয়ে লক্ষ্য ঠিক করে নিলাম। শরীর গরম থাকতে থাকতেই আমার হাজার গজ দূরে শালবন এলাকায় পৌঁছতে হবে। ক্রল শুরু করব, এমন সময়

দেখি বাচ্চা ছেলে সালাম যে পঞ্চাশ গজ ক্রল করে পিছে হটে গিয়েছিল হঠাৎ করে আবার দৌড়ে এসে পড়ে থাকা একটি এলএমজি নিয়ে 'জয় বাংলা' বলে হুঙ্কার দিয়ে শত্রু বেষ্টনীর দিকে ধাবিত হলো। ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়া শত্রু তখন পুনরায় কাউন্টার অ্যাটাক করার জন্য মাটির দেয়ালের পিছে জমায়েত হচ্ছিল এবং ঘন ঘন 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি করছিল। 'তোরা আমার মা-বাপ সবাইকে মেরেছিস, আমি ছেড়ে দিব?'। বিড় বিড় করে পাগলের মতো সালাম শত্রু বেষ্টনীর মধ্যে ঢুকে পড়ল। অতিকষ্টে একবার ডাক দিলাম 'সালাম চলে এসো'। কিছুক্ষণ আগে যে আমার জীবন রক্ষা করেছিল সেই সালামকে আর ফিরিয়ে আনতে পারিনি। অথচ বাচ্চা বলে এবং তার সংসারে একমাত্র জীবিত ব্যক্তি বলে আমি তাকে যুদ্ধে শামিল করিনি, কিন্তু সে পালিয়ে এসে এসেম্বলি এরিয়াতে আমাদের সঙ্গে চুপি চুপি যোগ দেয়। বাংলার শ্যামল গালিচার দূর্বাদলের মাঝে এমনি করে লুকিয়ে আছে হাজারো সালাম। গোটা যুদ্ধক্ষেত্রটা তখন মহাশ্মশান। আমাদের পক্ষে ৬৫ জন আহত হয় অথবা নিখোঁজ হয়, যার ভেতর যুদ্ধের ময়দানে ১২ জনের লাশ থেকে যায় এবং ৩৫ জনকে গৌহাটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মৃতদেহ ছাড়া আর কোনো জ্যান্ত মানুষ নেই—বৃষ্টির মতো গুলিবর্ষণ হচ্ছে দু'দিক থেকে। শালবনে অবস্থানরত আমার মেশিনগান তখন ঘন ঘন গর্জে উঠছে, সম্ভবত আমার ক্ষতবিক্ষত পশ্চাদপসারণকারী সৈন্যদের কাভারিং থেকে বাঁচার জন্য ডানে অপেক্ষাকৃত নিচু ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে এগুতে শুরু করি, এমন সময় কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'এরে আঁই বাঁচতে চাই—তোরা কেউকি আঁর কথা শুঁনতাছ না—এরে আঁরে লই যা'। প্রাণটা কেঁদে উঠল, যদিও করার কিছুই ছিল না, তবুও দাঁত খিচিয়ে বললাম, 'বেটা চিৎকার করিস না'। তবে ওর কাছে যাওয়ার কথা চিন্তা করার আগেই ওই এলাকা বরাবর একটি আর্টিলারি শেল এসে পড়ল। মাথাটা নিচু করে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকাকালে আঁচ করলাম, স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলিতে আমার পাশের মাটি উড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি বাঁ হাতে ঠেলে ঠেলে (কারণ এক হাতে ও এক পায়ে ক্রল করা সম্ভব হচ্ছিল না) নিজের আহত শরীরটাকে নালার দিকে নিয়ে গেলাম। ইতোমধ্যে আর কোনো চিৎকার চিৎকার শুনিনি। নালার কাছে পৌঁছে সব শক্তি নিয়োগ করে খাড়া হয়ে টলতে টলতে কেমন করে জানি নালাটা পার হয়ে গেলাম—আজ বলতে পারব না—মনে হচ্ছে বাঁচতে হবে এই জোরেই বুঝি নালাটা পার হয়েছিলাম আর পাড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ধপ করে পড়ে গেলাম। তবুও স্বস্তি বোধ করলাম এই মনে করে যে, শত্রু থেকে অনেক দূরে এসে গেছি এবং অপেক্ষাকৃত ঢালু জায়গায় এসেছি, তাতে শত্রুর স্মল আর্ম ফায়ার থেকে প্রায় বেঁচে গেলাম। শরীরটা ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল, তাই বুঝি সমস্ত জোর দিয়ে খাড়া হয়ে দৌড় দিতে চেষ্টা করলাম। দু'এক কদম যাওয়ার আগেই একঝাঁক গুলি আমার পায়ের কাছের মাটি উড়িয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে ধপ করে মাটির ওপর গিয়ে পড়লাম আবার। শত্রুর আর গুলি আসছে না। দেখে আবার একটু স্বস্তি বোধ করলাম; কিন্তু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার আগেই টের পেলাম ১০/১২ জন শত্রুসেনা এগিয়ে আসছে আমার দিকে। পিছে নালার ওপারে আমার এক হতভাগ্য আহত জওয়ানকে পেয়ে একগাল হাসি হেসে ওরা গুলি করল।

তারপর কিছুক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ পেলাম না। মাঝে মাঝে এগুনোর আওয়াজ পাচ্ছিলাম। তারপর হঠাৎ করে শত্রুর দল থেকে এক বাঙালি আরেক বাঙালি বলে উঠল, 'মকবুল এদিকে আয়, পাওয়া গেছে'। বোধহয় ঠেলে ঠেলে আসার ফলে কর্দমাক্ত মাটিতে রাস্তা হয়ে গিয়েছিল আমার পালানোর পথ। সঙ্গে হাতের ও পায়ের রক্ত আরো বেশি করে চিহ্নিত করেছিল সেই পথকে। সেই থেকে শত্রুর সঙ্গে শুরু হলো আমার লুকোচুরি ধানক্ষেতের আড়ালে আড়ালে। প্রায় ৩০০ গজ আসার পর ধানক্ষেত শেষ হয়ে গেল। এরপরের ২০০ গজ সম্পূর্ণ খোলা ময়দান। ওইদিকে কর্দমাক্ত মাটিতে কোমর পর্যন্ত কাদাপানিতে থাকার ফলে শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে প্রায়। ভীষণ শীত করছিল, ভাবলাম আর বোধহয় বাঁচা সম্ভব নয়। আমাদের তরফ থেকে কোনো জন-প্রাণীর চিহ্ন নেই। যে মেশিনগান এতক্ষণ ধরে প্রচণ্ড বেগে ফায়ার করছিল সেও চুপ হয়ে গেছে। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি একটা গরুর গাড়ি বিওপিতে ঢুকছে। সম্ভবত ওদের লাশ নেয়ার জন্য। আমার নিজস্ব কোনো ঘড়ি ছিল না। আক্রমণের আগে রকেট লঞ্চারওয়ালা তার নিজের ঘড়িটা আমায় দিয়েছিল। সেই ঘড়িটার দিকে এবার তাকালাম। কর্দমাক্ত ঘড়ি, এমনকি কাঁচের ভেতরেও পানি ঢুকছে। বেলা তখন ৮টা ১০ মিনিট। রোদটা পিঠে লাগছিল। তৃষ্ণায় বড় কাতর হয়ে পড়েছি। জীবন-মরণ 'টাগ অব ওয়ারের শেষ মুহূর্তে এসে হেরে যাওয়ার দুঃসহ জ্বালায় আমি তখন বিহ্বল, বড় অসহায়। জীবন-রস ঘর্মাক্ত কলেবরে নির্গত হচ্ছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, আমার একটা জওয়ান যদি একটা কভারিং ফায়ার দেয় তবেই আমি রক্ষা পাই। শত্রু তখন পঞ্চাশ গজ দূরে আমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে। ক্রমেই আমি তলিয়ে যাচ্ছি। শেষবারের মতো টেনেহিঁচড়ে বিক্ষত দেহটাকে আর্টিলারি শেলে সৃষ্ট একটি কালো মাটির গর্তে নিয়ে গেলাম। শত্রু যাতে সহজে দেখতে না পায়, গলা পর্যন্ত ধীরে ধীরে লেপে দিলাম বাঁ হাতের কর্দমাক্ত কালো মাটি দিয়ে। স্টিল হেলমেটের মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে রইলাম। অপেক্ষায় রইলাম চরম মুহূর্তের। চোখটা আপনা থেকেই বুজে আসছে। ভেসে উঠল মায়ের মুখচ্ছবি। এলোমেলো চিন্তা দু'টি অসহায় যুবতী বোনের সজল চাহনি, একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। যুদ্ধে যোগ দেয়ার আগে মা'কে দেখে আসা একান্ত উচিত ছিল। আজ মা, বাপ, ভাই-বোন, কে কোথায় কেমন আছে জানি না। তারাও জানালো না আমি কেমন করে মরে যাচ্ছি। ভাবনা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে জোর করে চোখ খুলে চাইলাম। স্টেনটা বাঁ হাতে ধরা। বন্দি হবো না কোনোক্রমেই বরং মেরে মরব। তবুও মনেপ্রাণে মরার কথাটা চিন্তা করতে পারিনি। কেন জানি মনে হচ্ছিল এত অল্প বয়সে মরে যাব। নিশ্চয়ই বেঁচে যাব। আশ্চর্য্য! এত বিহ্বলতার মাঝেও একটা কথা বারবার মনে পড়ছিল, আহ-হা, কেউ যদি আমার হারিয়ে যাওয়া ডায়েরিটা পেত (বিশেষত ২ মার্চ '৭১ থেকে ১০ জুলাই '৭১ সাল) কিংবা এখানে-ওখানে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আমার লেখাগুলো। চোখ দুটোকে আর খুলে রাখতে পারছিলাম না। ঠিক এমন সময় আমার কমান্ডিং অফিসার মেজর আমিনের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো শালবন থেকে, 'আমিন, আস্তে আস্তে আসার চেষ্টা করো'—আহত হওয়ার তিন ঘণ্টা পর এই প্রথমবারের মতো সক্রিয় সাহায্য পেলাম। বস্তুত আমার নিহত বা নিখোঁজ

হওয়ার সংবাদে মেজর জিয়াউর রহমানের নির্দেশে মেজর আমিন তখন কমান্ডো প্লাটুন নিয়ে আমার মৃতদেহ খুঁজতে বের হয়েছিলেন। আমার কাছে ক্রল করে আসতে ইতস্তত করছিল দেখে মেজর আমিন নিজেই খালি হাতে ক্রল শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাবিলদার তাহের মেজর আমিনের পিছু নিলো। আমার কাছে এসে উভয়ে পর্যায়ক্রমে আমার পা ধরে মৃতদেহের মতো টানতে শুরু করল। পিঠের চামড়া উঠে যাচ্ছে বিক্ষত ডান পায়ের ব্যথায় ঢুকরে উঠলেও দাঁত কামড়ে রইলাম। সম্ভবত আনন্দের আতিশয্যে ব্যথা ভুলে গেলাম। লেফটেন্যান্ট মোদাসসের তখন চিৎকার করছে শালবন থেকে, 'তাড়াতাড়ি করেন স্যার'। তার দুই এলএমজিওয়ালা তখন দুই গাছের ওপর উঠছে। শত্রুরা তখন আমাদের ২০/২৫ গজ পেছনে একজন আহত জওয়ানকে হত্যা করে পায়ে পায়ে এগুচ্ছে। আমাদের দুই এলএমজিওয়ালা কেঁদে কেঁদে বলছে, 'আপনাদের ধরে ফেললো যে স্যার' দাঁত খিঁচিয়ে আমরা বললাম, 'বেটা ফায়ার কর'। আমাদের ওপর দিয়ে ফায়ার করতে হবে তাই আমাদের জওয়ান ইতস্তত করছিল। শত্রু তখন আমাদের ওপর চার্জ করে আর কী। সঙ্গে সঙ্গে এলএমজি গর্জে উঠল। ছয়-সাতটি খানসেনা তৎক্ষণাৎ লুটিয়ে পড়ল। মকবুল আর তার সাথী দালালকে আমরা হাতেনাতে ধরে ফেললাম। দুটি খানসেনা পালিয়ে বাঁচল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শত্রুর আর্টিলারি ফায়ার এসে পড়তে লাগল। বৃষ্টির মতো আর্টিলারির গোলার মাঝে মেজর আমিন আমায় কাঁধে নিতে চেষ্টা করলেন; কিন্তু পরিশ্রান্ত মেজর আমিন নিজেই আমায় নিয়ে নালাতে পড়ে গেলেন, 'স্যার প্লিজ আপনি চলে যান, তাহের আমায় নিয়ে আসবে' আমি বলে উঠলাম। শেষ পর্যন্ত জোর করে আমি তাহেরের দিকে হাত বাড়ালাম, 'স্যার প্লিজ চলে যান' আবার বললাম। আর বৃষ্টির মতো আর্টিলারি ফায়ারের মধ্যে হাবিলদার তাহের আমায় কাঁধে নিয়ে দিল এক ভোঁ দৌড়। ভীষণভাবে হাঁপাচ্ছিল তাহের—হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে, 'চিন্তা করবেন না স্যার, মরলে দু'জন একসঙ্গে মরব'।

প্রেমিক শাহজাহান স্মৃতির মর্মর প্রস্তরে রেখে গেলেন তার প্রেম কাহিনী। আমি সম্রাট নই, নেই কোনো সাম্রাজ্য যে তাজমহল গড়ব, তবুও বলবো, পৃথিবীতে কোথাও যদি স্বর্গ থাকে, তা এখানে, তা এখানে এবং তা এখানেই।

রচনাকাল ১৯৭১

একাত্তরের রণাঙ্গন

মাহাবুব এলাহী রঞ্জু, বীরপ্রতীক

মুক্তিযুদ্ধ আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্মৃতিময় অধ্যায়। লাখো শহীদের রক্তস্নাত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠতম অর্জন। হাজার বছরের ইতিহাসসমৃদ্ধ একটি জাতি দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়েছিল শত সংগ্রাম এবং সর্বোচ্চ ত্যাগ-তিতিক্ষা ও লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে। পাকিস্তানের বর্বর সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির বীরত্ব এবং গৌরবময় বিজয় অর্জন সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। আমি একজন গর্বিত মুক্তিযোদ্ধা। দেশমাতৃকার টানে সেদিন মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম, বিজয়ী হয়েছিলাম। আমরা সত্যিই সৌভাগ্যবান সেদিন আমাদের জীবনে সুযোগ এসেছিল দেশের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার।

যুগ-যুগান্তর ধরে অবহেলিত, বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ উত্তর জনপদের সংগ্রামমখুর এলাকার নাম গাইবান্ধা। আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তিযুদ্ধে গাইবান্ধাবাসীর অবদান চিরস্মরণীয়। একাত্তরের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণার পর সমগ্র বাংলাদেশের মানুষ যে উদ্যম নিয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেছিল গাইবান্ধাবাসী সে ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে ছিল না। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শুরুতে রাজশাহীতে থাকলেও নানা ঝড়-ঝঞ্ঝা এড়িয়ে ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার পরপরই গাইবান্ধা চলে আসি এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করি। ২৫ মার্চ পাকিস্তানিরা ঢাকায় নিরীহ বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে শুরু হয় সশস্ত্র সংগ্রাম ও প্রতিরোধ। সে ক্ষেত্রে আমরা গাইবান্ধাবাসী বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকার তুলনায় কোনোভাবেই পিছিয়ে ছিলাম না।

অসহযোগ আন্দোলনের অগ্নিঝরা দিনগুলোতে আন্দোলনের পাশাপাশি চলছিল সশস্ত্র প্রস্তুতি। গাইবান্ধা কলেজের ইউওটিসির ডামি রাইফেল দিয়ে কলেজ মাঠে রাতের বেলা ট্রেনিং শুরু হয়েছিল। ২৫ মার্চের পর প্রায় ত্রিশ জনের একটি বাঙালি সেনাদল সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে হাবিলদার আফতাবের (আলতাফ নামে সমধিক পরিচিত) নেতৃত্বে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে গাইবান্ধায় আশ্রয় নেয়ার উদ্দেশ্যে আসে। তাদের কেন্দ্র করে ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছাত্র-যুবকরা গাইবান্ধা ট্রেজারিতে আনসার বাহিনীর গচ্ছিত রাইফেল নিয়ে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। গাইবান্ধায় পাকিস্তানিদের ঢোকার দু'টি পথ। একটি পলাশবাড়ী হয়ে, অপরটি মাদারগঞ্জ-সাদুল্লাপুর হয়ে। দু'টি পথেই প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলা হয়েছিল। রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে কয়েকদফা পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। আমাদের প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করতে

পারেনি। শেষ পর্যন্ত আমরা ওদের সঙ্গে পেরে উঠিনি। ১৭ এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী গাইবান্ধায় ঢুকে পড়লে আমরা শহর ছেড়ে প্রথমে শহরের পূর্ব প্রান্তে বাঁধে এবং শেষ পর্যন্ত রাতে শহর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার পূর্বদিকে কঞ্চিপাড়ায় আমাদের সঙ্গী সাইফুলের আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে রাতযাপন করি। তারপর মানস নদ পার হয়ে কালাসোনারচর গিয়ে দেখি সেখানে হাবিলদার আফতাব তার বাহিনী নিয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আমরা একত্রে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি গিয়ে একটানা কয়েক ঘণ্টা হেঁটে এড়ণ্ডাবাড়ি চরে হযরত আলী চেয়ারম্যানের বাড়িতে উপস্থিত হলাম। সেখানে রাতযাপন করার পর হাবিলদার আফতাব এবং তার বাহিনীর অন্য সদস্যের সঙ্গে আলোচনায় আমাদের মতের এবং সিদ্ধান্তের অমিল দেখা দিল। আমরা আবার ফিরে এলাম কঞ্চিপাড়ায়। সেখানে ফিরে দেখা হলো নজরুল ভাইয়ের সঙ্গে (পরবর্তীতে শহীদ)। আরার আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে সংগঠিত হওয়ার আশা নিয়ে রওনা হলাম। প্রথমে কামারজানি, তারপর শরণার্থীদের নৌকায় রাতারাতি বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে মোল্লারচর, নয়ারচর, কোদালকাটি হয়ে রৌমারী। সেখানে রাত কাটিয়ে ভারতের মানকারচর চেকপোস্টে উপস্থিত হলাম। শুরুতেই বিএসএফ কমান্ডারের নির্দেশে আমাদের রাইফেলগুলো জমা দিতে হলো।

ভারত ভিন্ন দেশ, তাদের জনগণ, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদি প্রশ্নে অস্ত্রসহ আমাদের গ্রহণ করলেও অবাধ বিচরণ সম্ভব ছিল না। আমরা যখন চেকপোস্টের ক্যাম্পে, তখনই সারা মানকারচর বন্দরে খবর পৌঁছে গেছে মুক্তিফৌজ এসেছে। আমাদের এক নজর দেখার জন্য সাধারণ মানুষের ঢল নামল। এর মধ্যেই গাইবান্ধা, সাঘাটা-ফুলছড়ি এলাকার নির্বাচিত তৎকালীন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য মোঃ লুৎফর রহমান এবং সাদুল্লাপুর এলাকার পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য মোঃ তালেব মিঞা এসে আমাদের সাহস বাড়িয়ে দিলেন। দু'একটা দিন বেশ ভালোই কাটলো সেখানে। কয়েকদিনের মধ্যেই অবস্থার পরিবর্তন হয়ে গেল। শরণার্থীর সংখ্যা প্রতিদিন বাড়তে লাগলো। মানকারচরের রাজনৈতিক ব্যক্তিরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সহায়ক কমিটি নামে সংগঠিত হয়ে আমাদের সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। এক মাড়োয়ারির গদিঘর এবং গুদামঘর মিলে ক্যাম্প স্থাপিত হলো। সংখ্যায় আমরা চল্লিশ বা পঞ্চাশের বেশি নয়। ভৌগোলিক কারণে রৌমারী-রাজীবপুরসহ ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব পাড় এলাকাটি ছিল সম্পূর্ণ পাকিস্তানি সৈন্যমুক্ত। তখন পর্যন্ত পাকিস্তানি বাহিনী ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব পাড়ে কোথাও আক্রমণ করেনি। সে সুবাদে রৌমারীতে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প স্থাপিত হলো। আমরা সবাই চলে এলাম রৌমারীতে। সেখানে কয়েকদিন ট্রেনিং হতে না হতেই নানা সমস্যা এসে গেল। অস্ত্র, রসদ ইত্যাদির কোনো জোগান নেই। তারপর সবসময় পাকিস্তানিদের আক্রমণভীতি। আবার আমরা ভারতের কাছাকাছি ইপিআর ক্যাম্পকে আমাদের ক্যাম্প বানিয়ে কাজ শুরু করলাম। ক'দিন পর সেটাও থাকলো না। এবার স্থাপিত হলো কাকড়িপাড়া ইয়ুথ ক্যাম্প, মানকারচর থেকে দক্ষিণে ৪ কিলোমিটার দূরে। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এই ক্যাম্পটি ছিল। আমরা এই ক্যাম্পে থেকেই একদিন উচ্চতর ট্রেনিংয়ের জন্য গিয়েছিলাম। উল্লেখ্য, ভারতের সেদিনের সাহায্য এবং সহযোগিতা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিল।

আমরা প্রথম ব্যাচ তুরাতে প্রশিক্ষণ শেষ করে মধ্য জুলাইয়ে মানকারচরে ফিরে এলাম। পূর্ণ সামরিক নিয়মকানুন মেনে চলতে হতো নতুন যে ক্যাম্প স্থাপিত হলো সেখানে। এবার নতুন করে শপথ নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর আক্রমণ ও নির্মূল করার পালা। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় সমগ্র যুদ্ধ এলাকাকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল এবং একেকটি সেক্টরকে ভাগ করা হয়েছিল কয়েকটি সাব-সেক্টরে। আমরা ছিলাম ১১ নং সেক্টরের অধীন। আমাদের এলাকা ছিল সমগ্র গাইবান্ধা, উলিপুর, চিলমারী, রৌমারী, রাজীবপুর ইত্যাদি। ১১ নং সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন তৎকালীন মেজর আবু তাহের। তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বন্দিশিবির থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। শত্রুর বিরুদ্ধে অদম্য সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করে তিনি তার সহযোদ্ধাদের কাছে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠেন। কামালপুরে শত্রুর শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থানের ওপর নভেম্বর মাসের ১৪ তারিখে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় মেজর আবু তাহের মারাত্মকভাবে আহত হন এবং একটি পা হারান। আমাদের সাব-সেক্টর কমান্ডার ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ খান। তিনি বিমান বাহিনীর একজন সুদক্ষ অফিসার। তিনি খুব দ্রুত সেনাবাহিনীর যুদ্ধকৌশল রপ্ত করতে পেরেছিলেন। বিভিন্ন সময় নির্দিষ্ট কোনো যুদ্ধে যাওয়ার আগে বিভিন্ন প্রকার সতর্কতামূলক আলোচনার মধ্যে তিনি তার জ্ঞান এবং মেধার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। আমাদের প্রথম অভিযানের পরিকল্পনা ঠিক হলো। গাইবান্ধা-ফুলছড়ি সড়কের বাদিয়াখালী সেতু উড়িয়ে দেয়া ছিল আমাদের প্রথম অভিযানের লক্ষ। পনেরোজন সহযোদ্ধা, আমি তাদের কমান্ডার। ২৫ জুলাই মানকারচরের আমাদের ক্যাম্প থেকে রওনা হলাম ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে বাদিয়াখালী সেতু আক্রমণ করতে। তখন পর্যন্ত ইতিহাসের কলঙ্ক কুখ্যাত রাজাকার বাহিনী সংগঠিত হয়নি। বাংলাদেশের অন্য প্রান্তে যা-ই ঘটুক আমাদের এলাকায় মোজাহিদ নামে একটি বাহিনী এবং দালাল শান্তি কমিটি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দোসর হিসেবে ইতোমধ্যে কাজ করছিল। সেই মোজাহিদরা সেতুটি পাহারা দিচ্ছিল। সামান্য যুদ্ধে ওরা পরাস্ত হলো, কেউবা পালিয়ে বাঁচল। সেতু ধ্বংস করার জন্য বিস্ফোরক লাগিয়ে উড়িয়ে দিলাম কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধা ও আমার সহযোদ্ধাদের ভুল রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সেতুটির আংশিক ক্ষতি হলো ঠিকই, সম্পূর্ণ সফল হলো না। আমরা পেছনে ফিরে এসে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ এবং প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। অস্ত্রবল, ট্রেনিং সবই অপ্রতুল, শুধু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে অদৃশ্য সাহসিকতাই যেন সম্বল। ইতোমধ্যেই কুখ্যাত রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়ে পাকবাহিনীর সহযোগী হিসেবে বাঙালি সন্তান হয়েও বাঙালির ওপর অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করেছে। আমরা ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়ে কালাসোনার চরে যে রাতে পুনরায় এসেছি, তার পরের দিন (১০ আগস্ট) সকালে খবর এলো মানস নদের পশ্চিম তীরে রতনপুর, উড়িয়া গ্রামগুলোতে এসে রাজাকাররা লুটতরাজ করছে। নদীর অপর প্রান্ত থেকে ব্যাপারটি নিশ্চিত হয়ে আমরা লুকিয়ে ছোট ছোট ডিঙ্গিতে করে মানস নদের পশ্চিম তীরে পৌছলাম। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে শত্রুরা আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসলো।

আমাদের পাল্টা আক্রমণে ওরা পরাস্ত হয়ে পালানোর চেষ্টা করতে লাগলো। আমরা এক এক করে ১২ জন রাজাকারকে হাতেনাতে ধরে ফেললাম। দু'জনকে স্থানীয় জনগণ ক্রোধের বশে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে খণ্ডিত করে ফেলল। আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম গোলাবারুদসহ ষোলটি রাইফেল। রাজাকার শয়তানগুলোকে দড়ি দিয়ে বেঁধে সঙ্গে করে পশ্চিম তীর থেকে পূর্ব তীরে নিয়ে গেলাম কালাসোনার চরে। শয়তানগুলোকে পাঠিয়ে আমরা পরবর্তী নিশ্চিত যুদ্ধের জন্য তৈরি হতে লাগলাম। আমাদের ধারণাই ঠিক ছিল। পাক বাহিনী রসুলপুর ক্যাম্প থেকে বিকেলে ছুটে এলো রাজাকার ধরার স্থানে। ছোট মানস নদের এপার-ওপার গুলিবিনিময় হওয়ার পর আমরা পূর্ব পাড় থেকে ডিঙ্গি নৌকা দিয়ে পশ্চিম পাড়ে পার হলাম। পাক সৈন্যরা পালানোর সময় দু'জন আহত হলো, বাকিরা তাদের নিয়ে পালিয়ে গেল। কালাসোনার চরে ফিরে পরদিন জনগণের ওপর নির্যাতন-অত্যাচার নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকলাম। অনুমানে এতটুকুও ভুল ছিল না। পরদিন (১১ আগস্ট) সকাল থেকেই শুরু হলো বর্বরতা, হৈ-হল্লা, চিৎকার, আর্তনাদের নারকীয় দৃশ্য। প্রথমে লুটতরাজ তারপর বাড়িঘরে আগুন দিয়ে লুট করা মালামাল দুটি নৌকায় বোঝাই করে নৌকার ছৈয়ের ওপর গুন টানিয়ে পাকিস্তানিরা উজানে রসুলপুর ক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হলো। পনেরো-বিশজন নৌকার ছৈয়ের ওপর অস্ত্র উঁচিয়ে বসে, বাকিরা পায়ে হেঁটে। যুদ্ধের কৌশলগত দিক থেকে আমরা মোটেও ভালো অবস্থানে ছিলাম না। আমাদের অবস্থান শত্রুকে আক্রমণ করার পক্ষে ছিল না। সমান্তরালভাবে আমরা চরের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলাম। সকাল থেকে শুরু করে দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে, একটু পানি পর্যন্ত খাওয়ার সুযোগ করা যায়নি। এবার আমাদের সামনে বিরাট বাধা এসে গেল। সামনে একটি নালা। পার হওয়ার উপায় নেই, উপরন্তু পার হলে শত্রু দেখে ফেলবে। উল্লেখ্য, কলাইয়ের বড় বড় গাছের কারণে নদীর তীর যেন ঘন বনাঞ্চলের মতো দেখাচ্ছিল। এতক্ষণ সুবিধা ছিল। কিন্তু এখন আর উপায় নেই। একটাই পথ খোলা। তা হলো, আক্রমণ করে শত্রুকে পরাস্ত করা এবং নিজেদের বাঁচানো। মুহূর্তের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। প্রথম চোটেই ছৈয়ের ওপর বসা সৈন্যরা পাখির মতো পানিতে পড়তে লাগল। আর যারা পাড় দিয়ে সন্তর্পণে হাঁটছিল তারা গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালানোর চেষ্টা করতে লাগল। অনেকক্ষণ গুলিবিনিময় হওয়ার পর ওদের কয়েকজন জীবন নিয়ে পালিয়ে গেল। আমরা পার হয়ে নৌকার কাছে গিয়ে হতবাক হয়ে গেলাম। তিন-চারজন যুবতীর আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠল, প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি ছাগল, খাসি, বাক্স, ট্রাংক, চাল, ডাল ইত্যাদি দিয়ে নৌকা বোঝাই ছিল। গ্রামবাসী ছুটে আসতে লাগলো। বেদনা এবং বিষণ্নতার মাঝেও আনন্দের বন্যা। মুরব্বিজনদের হাতে মালামাল দিলাম ফেরত দেয়ার জন্য। আমরা পাকিস্তানি সৈন্যের একটি চাইনিজ সাব-মেশিনগান ও তিনটি রাইফেল হস্তগত করলাম আর পেলাম রাজাকারদের বেশ কয়েকটি থ্রি নট থ্রি রাইফেল। দখলকৃত অস্ত্র, গোলাবারুদ এবং রাজাকারদের নিয়ে যখন শত্রুমুক্ত এলাকায় ফিরলাম তখন যেন আনন্দের উৎসব। জনতা ওদের হত্যা করতে চায়। আমরাই প্রথম বন্দি রাজাকারদের নিয়ে আমাদের ক্যাম্পে ফিরলাম। বাঙালি সন্তান ভুল করে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় নেমেছে—এই বিশ্বাস সেদিন ওদের ক্ষমা করেছিলাম। মজার বিষয় হচ্ছে, ওই রাজাকারসহ আরো অনেক রাজাকার

চূড়ান্ত বিজয় পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই ছিল। এ অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধে এ যুদ্ধেই প্রথম পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যা করে চীনা অস্ত্র দখল করা হয়।

আমাদের এসব অভিযানের ফলে আমাদের সাব-সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল বেড়ে গেল। মানকারচর সাব-সেক্টরে আর একজন অদম্য সাহসী মুক্তিযোদ্ধার নাম খন্দকার রুস্তম আলী। সাঘাটা-ফুলছড়ি থানা এলাকায় তিনি তার বাহিনী নিয়ে যুদ্ধরত ছিলেন। তিনিও আমাদের পরপরই একটা অত্যন্ত সফল অভিযানে জয়ী হলেন। ভরতখালী রেলস্টেশনের কাছে এন্টি-ট্যাংক মাইন দ্বারা ট্রেন অ্যাম্বুশ করার এ যুদ্ধটি এ অঞ্চলের একটি মাইলফলক যুদ্ধ।

আমাদের সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টারসহ মুক্ত এলাকায় স্থাপনাগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষিত হলো। ইতোমধ্যেই আবার অন্যদিকে মুক্ত এলাকা সংকুচিত হয়ে এসেছে, কেননা প্রায় এক ব্রিগেড পাক বাহিনী গানবোট, বিভিন্ন ধরনের নৌযান নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব তীরে রৌমারী থানার কোলকাটিতে ঘাঁটি স্থাপন করেছে। রৌমারী, রাজীবপুর এলাকা যেহেতু নদীনালায় ভরা, নেই কোনো রাস্তাঘাট, তাই পাক বাহিনীর পক্ষে ওই নদী পাড়ের কোদালকাটি ও সংশ্লিষ্ট এলাকা ছাড়া বাকি সমগ্র এলাকা দখল করা সহজতর ছিল না। ইতোমধ্যে হাবিলদার আফতাবের বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মুক্ত এলাকাতেই সংগঠিত হয়ে তিন-চারটি ক্যাম্প স্থাপন করে পাক বাহিনীর মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে তিনি লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। আগস্ট মাসের শুরুতেই আমাদের দলগুলোকে পুনর্গঠিত করা শুরু হলো। খুব সুষ্ঠুভাবে কমান্ড স্থাপিত হলো সেক্টর হেডকোয়ার্টার, সাব-সেক্টর হেডকোয়ার্টার এবং কয়েকটি যুদ্ধরত কোম্পানি গঠনে কোম্পানি কমান্ডারদের মধ্যে ছিলেন খন্দকার রুস্তম আলী, মাহবুব এলাহী রঞ্জু, এমএন নবী লালু, আমিনুল ইসলাম সুজা এবং খায়রুল আলম (প্রকৃত নাম নজরুল ইসলাম) প্রমুখ। আরো একজন কোম্পানি কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন কিন্তু তার বিতর্কিত ভূমিকার কারণে গাইবান্ধার ৫ কিলোমিটার পশ্চিমে নান্দিনায় যুদ্ধে প্রায় ত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এককেটি কোম্পানির সেনাবল ছিল একশ' জনের বেশি; কিন্তু শেষ পর্যায়ে তা তিনশ' ছাড়িয়ে গিয়েছিল। নতুন নতুন অভিযানের পরিকল্পনা গৃহীত হলো। আক্রমণ জোরদার করার সিদ্ধান্ত তো আছেই। গাইবান্ধা শহর থেকে সুন্দরগঞ্জ যাওয়ার রাস্তায় দাড়িয়াপুর সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি উড়িয়ে দিলে সমগ্র উত্তর এলাকায় শত্রুরা পর্যুদস্ত হবে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার সুযোগে শত্রু ক্যাম্পে আক্রমণ জোরদার করা যাবে। পরিকল্পনামাফিক আমার অধীনস্থ কোম্পানির প্রায় একশ' জন সদস্যকে নিয়ে মোল্লারচর স্কুলের অস্থায়ী ক্যাম্পে জড়ো হলাম। সেদিনই রাতে ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়ে উজানে গিয়ে প্রথমে গেলাম পূর্ব শ্রীপুরে। সেখানে সারাদিন কাটিয়ে রাতেই সেতু উড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করলাম। আজো মনে পড়ে সেই রাতটি ছিল শবেবরাতের রাত, ২৭ সেপ্টেম্বর। আমাদের পথঘাট দেখানোসহ অভিযানে আগ্রহী একজন লোক আমাদের সঙ্গে এসেছেন। তিনি রাজেন বাবু। তার বাড়ি ছাপড়হাটিতে; কিন্তু তখন তিনি শরণার্থী। পিতৃতুল্য এই ব্যক্তির আদর, সহানুভূতি, সহযোগিতা এবং তার সাহসী ভূমিকা চিরকাল মনে থাকবে। দাড়িয়াপুর সেতুর উভয় প্রান্তে শত্রুর ঘাঁটি

ভীষণ মজবুত। সেতুর প্রহরীদের ঘায়েল করে আগে সে দুটি শক্রমুক্ত করা, তারপর উড়িয়ে দেয়া। সেতুর উভয় প্রান্তে একসঙ্গে আক্রমণ করে বসলাম। দীর্ঘ সময় ধরে গুলিবিনিময় হওয়ার পর আমাদের প্রবল চাপে ওরা পালাতে শুরু করল। পূর্ব অভিজ্ঞতার কারণে এবার ভুল এড়ানোর জন্য সতর্কতার সঙ্গে বিস্ফোরক বসানো হলো। বিকট শব্দে দাড়িয়াপুর সেতু অসহায়ভাবে ভেঙে পড়লো। একটি সফল অভিযান, উত্তর-দক্ষিণ সম্পূর্ণ সেতুটি পানিতে তলিয়ে গেল। এত বড় একটি সেতু ধ্বংস হয়ে পানিতে পড়ার দৃশ্য ইতোপূর্বে আমি নিজেও কখনো দেখিনি। যা হোক, উল্লাস করতে করতে আমরা নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরছিলাম। এমন সময় আমরা দাড়িয়াপুর সেতুর উত্তরে মাছের হাটে পৌঁছলে আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা হলো। আমাদের কাছে সেই মুহূর্তে সঠিক তথ্য না থাকায় এমনটি হয়েছিল সেদিন। গুলিবিনিময় হতে হতে ভোর হয়ে গেল। আমরা কিছুটা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। আমাদের তিনজন গুরুতর আহত হলো। আহত যোদ্ধাদের দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে এনে পরে মুক্ত এলাকার ক্যাম্পে পাঠানো হলো। আহতদের মধ্যে সুন্দরগঞ্জের রাজা বেশি গুরুতর। সে কয়েক মাস ধরে ভারতে চিকিৎসারত ছিল। কিছুটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে আমদের কোম্পানি বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। সবাই আবার মোল্লারচরে একত্রিত হলাম। ইতোমধ্যে মুক্তি বাহিনীর প্রবল আক্রমণের তোড়ে প্রায় এক ব্রিগেড সেনাশক্তি থাকার পরও পাকিস্তানিরা কোদালকাটি ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হলো। আমাকে পরবর্তী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে অংশগ্রহণ করার জন্য মানকারচরের হেডকোয়ার্টারে ডেকে পাঠানো হলো।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসখ্যাত চিলমারী এলাকার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য আমাকে ডেকে আনা হয়েছে। এটি একটি বিশাল অভিযান। ব্রহ্মপুত্র নদের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত চিলমারী থানা হেডকোয়ার্টারে পাকিস্তানি বাহিনীর ঘাঁটির পতন ঘটাতে হবে। তাতে করে চিলমারী এবং উলিপুর বিশাল এলাকা দখলদারমুক্ত হবে। তাই আমাদের সব শক্তি নিয়োগের সিদ্ধান্ত হয়েছিল। খায়রুল আলম কোম্পানির কমান্ডার, তার কোম্পানি নিয়ে উলিপুর অবস্থান করছিলেন। তার সেনাশক্তি প্রায় ২শ' জনেরও বেশি। যুদ্ধের গুরুত্ব বিবেচনা করে সাময়িকভাবে আমাকে সেই কোম্পানির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হলো। সেক্টর কমান্ডার মেজর আবু তাহের স্বয়ং এই অভিযানের কমান্ডারের দায়িত্বে। ১৫ অক্টোবর মানকারচর ইপিআর বাহিনীর কাছ থেকে প্রাপ্ত মোটরলঞ্চে মেজর আবু তাহের, সাব-সেক্টর কমান্ডার স্কোয়াড্রন লিডার হামিদুল্লাহ খান, ক্যাম্প অ্যাডজুটেন্ট এবং সাব-সেক্টরের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড শফিউল্লাহসহ প্রথমে রৌমারী, তারপর ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বতীরের ছালিয়াপাড়ার চরে পৌঁছি। তারপর আমি ভিন্ন নৌকায় দ্রুত ক'জন মুক্তিযোদ্ধাসহ উলিপুর রওনা হলাম। বিকেল নাগাদ উলিপুর পৌঁছেই কোম্পানি কমান্ডার খায়রুল আলমের সঙ্গে দ্রুত আলোচনা সেরে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। একটার পর একটা নির্দেশসহ এগিয়ে গেলাম। আমাদের ওপর দায়িত্ব ছিল চিলমারীর বিভিন্ন পাকিস্তানি অবস্থান আক্রান্ত হওয়ার পর যেসব পাক সেনা ও রাজাকার চিলমারী, উলিপুর, কুড়িগ্রামের রাস্তা এবং রেলপথ দিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে তাদের পরাস্ত করা বা বন্দি করা ও বন্দিদের মুক্ত এলাকায় নিয়ে আসা।

সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৬ অক্টোবর ভোর ঠিক ৪টায় ছালিয়াপাড়া চর থেকে পশ্চিম তীরের চিলমারীর বিভিন্ন ঘাঁটি এবং ক্যাম্পের ওপর মর্টারের গোলা নিক্ষেপ শুরু হয়ে গেল। সারারাত ধরে আমাদের ছলিয়াপাড়া অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে ছেলেরা পশ্চিম তীরে চিলমারীর উদ্দেশে পার হয়ে এসেছে। এবার মর্টার গোলার সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণ রচনা করা হলো। কৌশলগতভাবে পাক বাহিনীর অবস্থান সুদৃঢ়। পাক বাঙ্কারে ওদের অবস্থান, অস্ত্রবল, জনবল কোনোটার ঘাটতি নেই। দীর্ঘ সময় ধরে গুলিবিনিময়, গ্রেনেড চার্জ, বেয়নেট চার্জ এমনকি কোনো কোনো বাঙ্কারে হাতাহাতি লড়াই পর্যন্ত হয়েছিল। ওরা পর্যুদস্ত এবং ছিন্নভিন্ন হয়ে, কেউ মরে, কেউ পালিয়ে গেল। শত শত রাজাকার কেউ আত্মসমর্পণ করল, কেউ বন্দি হলো। আমাদের অভিযান সফল হলো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ওই বিজয় বেশি সময় ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। পাক বাহিনী পুনরায় রংপুর, কুড়িগ্রাম থেকে শক্তি বৃদ্ধি করে এসে চিলমারী দখল করে ফেলে। যা হোক, আমি বেশ ক'জন বন্দি রাজাকার নিয়ে উলিপুর থেকে ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব তীরের পাখিমারার চরে এলাম। সেখানে আমাদের অস্থায়ী ক্যাম্প স্থাপিত হয়েছিল ইপিআর বাহিনীর সুবেদার হাকিমের নেতৃত্বে। আমাদের সবাই সফল পশ্চাদপসরণ করে ফিরে এলো।

কোনো বিশ্রাম না নিয়েই আমার কোম্পানির সহযোদ্ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পরের অভিযান সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। বিশ্রাম এবং প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে সময় কাটিয়ে সবাই যেন চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। এক রাতে একটু-আধটু ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে রওনা হলাম কালাসোনার চরের উদ্দেশে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ছয়টি বড় নৌকায় আমরা বিভক্ত ছিলাম। ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিচ্ছিলাম। মাঝনদীতে এমন ঝড়-বৃষ্টি শুরু হলো যে, নৌকা ভাসিয়ে রাখা দায়। আমরা রাতের অন্ধকারে ঝড়ের কবলে পড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। পরের দিন বিকেল নাগাদ দুশ্চিন্তা এবং শঙ্কামুক্ত হয়ে আবার সবাই একত্রিত হয়ে কালাসোনার চরের অস্থায়ী ক্যাম্প থেকে পূর্বোল্লিখিত বাদিয়াখালী সেতু উড়িয়ে দেয়ার জন্য রওনা হলাম। শত্রু সেতুটির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইতোমধ্যেই সেটি সংস্কার ও মেরামত করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য দুর্ভেদ্য ঘাঁটি বানিয়েছে। আমরাও আমাদের কৌশল পাল্টালাম। দক্ষিন প্রান্ত থেকে আক্রমণ করে সফল হয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিস্ফোরক লাগিয়ে সেতুটি সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিলাম। সফল অভিযান, ফিরে এলাম কালাসোনার চরে। রসুলপুর স্লুইস গেট সংলগ্ন পাক বাহিনীর ক্যাম্প দিনে ও রাতে কয়েকবার আক্রমণ করে ওদের আমরা আতঙ্কিত ও ভীতসন্ত্রস্ত করে চললাম। রসুলপুর-কামারজানী বাঁধে কয়েক দিন আমাদের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ হলো। ধীরে ধীরে কালাসোনার চরে আমাদের অবস্থান সুদৃঢ় হয়ে উঠল। আমাদের সাফল্যে এলাকার জনগণ ইতোমধ্যে সাহসী হয়ে উঠেছে। পাক সেনাদের চলাচল ও বিচরণ ক্ষেত্র সীমিত হয়ে এসেছে। আমাদের আক্রমণের চাপে পাকিস্তানিরা দিশেহারা হয়ে কামারজানী ক্যাম্প গুটিয়ে নিল। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই আমাদের আক্রমণে কাইয়ারহাট এবং কেতকীরহাট রাজাকার ক্যাম্পের পতন ঘটেছে। বিপুল অস্ত্র ও গোলাবারুদ আমরা সংগ্রহ করেছি। ওদের কেউ আত্মসমর্পণ করেছে, বাকিরা জীবন নিয়ে পালিয়েছে। আমাদের অবস্থান কিন্তু মোটেও নিরাপদ ছিল না। উত্তর-দক্ষিণ কয়েক মাইল বিস্তৃত কালাসোনার চর প্রস্থে খুব বেশি ছিল না, পূর্বদিকে বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিম দিকের

ছোট মানস নদের সমান্তরাল বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ। বাঁধের ওপর শত্রুর কয়েকটি ক্যাম্প বিপজ্জনক অবস্থায় ছিল। রণকৌশলগত বিবেচনায় কালাসোনার চরে আমাদের অবস্থান। তার ওপর পাক বাহিনীর দোসর দালাল, শান্তি কমিটি, আলবদর, রাজাকারদের উৎপাত। আমার কোম্পানির পাঁচটি প্লাটুন নিয়ে কালাসোনার চরের বিভিন্ন স্থানে কিছুটা স্থায়ী প্রতিরক্ষা গড়ে তোলার চেষ্টা করছিলাম। একটি প্লাটুনের সেনা ছিল প্রায় ত্রিশ থেকে চল্লিশ জনের মতো। অদম্য সাহসী জুবেল, নুরুন্নবী, হোসেন আলী, মকবুল প্রমুখ আমার প্লাটুন কমান্ডার। অক্টোবরের শুরু থেকেই পাক বাহিনীর রতনপুর ক্যাম্পের ওপর আক্রমণ জোরদার করেছিলাম। যুদ্ধে যুদ্ধে দিন-রাত অতিবাহিত হচ্ছিল। পাক সেনা হত্যা, রাজাকার বন্দি, অস্ত্র ও গোলাবারুদ দখল হয়ে উঠল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। একদিন এক পাক সেনাকে বন্দি করে মুক্ত এলাকায় নিয়ে এলাম। রাজাকার বন্দি করে অস্ত্রশস্ত্র দখলের ঘটনার প্রথম দিকে জনগণসহ সবাই যেভাবে হতবাক হতেন, পাক সেনা বন্দি করার ঘটনায়ও সবাই সেভাবেই হতবাক ও উল্লসিত হলেন। মুক্ত এলাকার জনতার সেই উল্লাস আমার স্মৃতিতে চিরজাগরূক থাকবে। সবারই চেহারায় গৌরবের দীপ্তি—আমাদের ছেলেরাও পারে। ৩ নভেম্বর ভোরবেলা আমরা পাক বাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে পড়ে গেলাম। বালাসীঘাটের কাছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ছিল। পাকিস্তানিদের সেই বাঁধে অবস্থান, তখন আমরা ধানক্ষেত দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। কৌশলগতভাবে ওরা আমাদের তুলনায় অনেক ভালো, উঁচু অবস্থানে। আমরা তাড়াহুড়া করে জমির আইলে অবস্থান নিলাম। গুলিবিনিময় চলতে থাকলো। ভোর থেকে প্রবল যুদ্ধ শুরু হলো। সকাল থেকে সূর্যের এবং রণাঙ্গনেরও উত্তাপ উভয়ই বাড়তে থাকলো।

আমাদের ফজলু অবস্থান বদল করে একটু ভালো অবস্থানে যাওয়ার চেষ্টা করতেই গুলিবিদ্ধ হলো। যত্ন-আত্তির সুযোগ তো দূরের কথা, ভালো করে তার দিকে তাকিয়ে দেখার অবকাশও পাচ্ছিলাম না। যে ছেলে চলে যাবে তাকে বিদায় জানাতে হবে না? আমি তার কমান্ডার। হায় অসহায়ত্ব! বৃষ্টির মতো গুলি আসছে বাঁধের ওপার থেকে। মাথা তোলা যাচ্ছে না। গুলির জবাব দিতে আমাদের ছেলেরাও ব্যস্ত। গোলাগুলির প্রচণ্ড শব্দে পাশের সহযোদ্ধাদের কণ্ঠস্বরই শোনা যায় না। এর মধ্যে ফজলুর ক্ষীণকণ্ঠ শুনতে পেলাম 'পানি' 'পানি'। মনটা ডুকরে কেঁদে উঠলো। পানি কই? পানি কই? আমাদের কারো কাছেই খাবার পানি নেই, অথচ পানিতে দাঁড়িয়ে আর শুয়ে যুদ্ধ করছি। ফজলুকে দু'চুমুক পানি দেই কোত্থেকে, কীভাবে দেই? অসীম সাহসের মান্নান এলো পাশ থেকেই। ফজলুর পানি পানের ক্ষীণকণ্ঠের মিনতি মান্নানের কানে পৌঁছেছে নিশ্চয়ই। মান্নান নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে পরম মমতায় সহযোদ্ধা ফজলুকে পিঠে তুলে নিল। গুলি আসছে ঝাঁকে ঝাঁকে। একটু দূরেই আবাদি জমিতে সেচের পানি দেয়ার কুয়ার মতো গর্ত। সেখানে পরিষ্কার পানি। মান্নান ফজলুকে নিয়ে যাবে সেখানে। ফজলুকে পিঠে নিয়ে লাফ দিতেই গুলি লাগলো। না, মান্নানের শরীরে না, ফজলুর পাঁজরে। ফজলু চলে গেল। পাকিস্তানিরাও পালিয়ে গেল। আমরা জিতে গেলাম।

আমাদের জিতিয়ে দিয়ে ফজলুরা চলে যায়। ফজলুদের চলে যেতে হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য। মান্নানরা নীরবে, নিঃশব্দে ডুকরে ডুকরে কাঁদে। সে কান্নার শব্দ শুনতে নেই, শোনার প্রয়োজনও নেই কারো।

মান্দারতলার যুদ্ধ

কর্নেল মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ (অব.), বীর প্রতীক

কুষ্টিয়াতে অবরুদ্ধ পাকিস্তান আর্মির ২৭ বালুচের শেষ অংশকে ঝিনেদা-শৈলকুপার মাঝামাঝি নির্মূলের অভিযান চলাকালেই যশোর ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে একটি বিশেষ সশস্ত্র অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কুষ্টিয়া শত্রুমুক্ত হয়ে মুক্তিবাহিনীর হাতে আসার পর গোয়ালন্দ থেকে চুয়াডাঙ্গা-মেহেরপুর পর্যন্ত বিরাট অঞ্চল জয়বাংলার উল্লাসধ্বনিতে মুখরিত। চারপাশ থেকে পরস্পর যোগাযোগশূন্য বিক্ষুব্ধ জনতা নিরাপদ দূরত্বে যশোর ক্যান্টনমেন্ট অবরুদ্ধ করে রেখেছে। জনতার আছে মনোবল, হাতে লাঠিসোটা, দা-কুড়ালের দেশি অস্ত্র। তাদের আগ্নেয়াস্ত্র নেই বললেই চলে। আপোসে পাকিস্তান আর্মি যশোর ক্যান্টনমেন্ট ছেড়ে যাবে না তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এ অঞ্চলে পাকিস্তানিদের শক্তির উৎস ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে না পারলে আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হতে বেশিক্ষণ লাগবে না। ক্যান্টনমেন্ট দখলের অগ্রযাত্রার প্রাথমিক প্রস্তুতিরূপে কোম্পানি প্রেরণের স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন চুয়াডাঙ্গার ইপিআরের মেজর আবু ওসমান চৌধুরী। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এ ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানের ভার আমার ওপর ন্যস্ত করলেন। আমি তখন ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের বাংলার অধ্যাপক। মার্চের প্রথম থেকে কুষ্টিয়া দখল পর্যন্ত একাধিক সামরিক ও সাংগঠনিক কাজে আমার তৎপরতা স্থানীয় সামরিক ও রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম বলে হয়তো আমার ওপর তার এ গুরুদায়িত্বের ভার অর্পণ করলেন।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আমাকে দুটি প্লাটুন প্লাস দেয়া হলো। কুষ্টিয়ার ২৭ বালুচ রেজিমেন্টের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা অস্ত্র, চুয়াডাঙ্গার ইপিআরের অস্ত্র, যশোর ক্যান্টনমেন্টের মরণফাঁদ থেকে সশস্ত্র পালিয়ে আসা ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্ত্র, স্থানীয় আনসার-মোজাহিদদের অস্ত্র দিয়ে তাদের সজ্জিত করা হলো। বালুচ রেজিমেন্টের ছিনিয়ে আনা একটি রিকয়েললেস রাইফেল (আর আর)[১], একটি ভারী মেশিনগান, কয়েকটি চায়নিজ এলএমজি, ব্রিটিশ এলএমজি এবং থ্রি নট থ্রি রাইফেল ছিল প্রধান অস্ত্র। একটি ৩″ মর্টারও ছিল। মান্দারতলা থেকে সেটি প্রথম দিকে উইথড্র করে গোয়ালন্দ পাঠানোর নির্দেশ নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পালন করতে হলো। চুয়াডাঙ্গার ইপিআর, যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা ১ম ইস্ট

---

[১] রিকয়েললেস রাইফেল : ধাক্কাবিহীন ট্যাংক বিধ্বংসী অস্ত্র।

বেঙ্গলের সৈনিক, ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের পাঁচজন বাঙালি এনসিও, স্থানীয় আনসার-মোজাহিদ দিয়ে কোম্পানি তৈরি হলো। ১ম ইস্ট বেঙ্গলের সুবেদার ফিরোজ, ইপিআরের সুবেদার মজিদ মোল্লা, সুবেদার মুকিত, ঝিনেদার আনসার কমান্ডার মাকসুদ আলী, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার আজহার উদ্দিন এ কোম্পানির শক্তি, সাহস ও প্রেরণার উৎসরূপে প্রস্তুতিতে এগিয়ে এলেন।

স্থানীয় যোদ্ধাদের লঙ্গর ও প্রশাসনের দায়িত্বে ছিলেন প্রাক্তন ছাত্রনেতা ও নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য নুরে আলম সিদ্দিকীর পিতা নুরুন্নবী সিদ্দিকী। তিনি দিলেন দেড়দিনের রেশন। চাওয়া হলো সাত দিনের। খিটমিট লেগে যাওয়ায় তিনি অভিযোগ করলেন উর্ধ্বতন অপারেশন কমান্ডার এসডিপিও[২] মাহবুবকে। তড়িৎগতিতে এসে মাহবুব রেশন ও গাড়ির ব্যবস্থা করে ট্যাক্‌টফুল হয়ে স্থানীয় সম্পদের ওপর নির্ভর করে অগ্রাভিযানের নির্দেশ দিলেন।

ঝিনেদা থেকে কোম্পানিসহ কালিগঞ্জে এসে বিরূপ সংবর্ধনা পেলাম। কেউ যেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় না। কালিগঞ্জের দারোগা লতিফকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কী'? তিনি জানালেন, আমাদের আগেকার বিশখালী যুদ্ধের সময় পাকিস্তান আর্মির গোলাগুলির সময় তিনি মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে থানায় ছিলেন। পাকিস্তান আর্মি তাকে প্রাণে মারেনি। পাকিস্তান আর্মি ভুল করেই হোক বা যেভাবেই হোক স্থানীয় কয়েকজন গণ্যমান্য মুসলিম লীগের লোককে হত্যা করে টেবিল উল্টে দিয়ে গেছে। ঢাকা-খুলনা মূল সড়কের কালিগঞ্জ ব্রিজ উড়াতে এসে স্থানীয় লোকজনের বাধার মুখে মাহবুবের পাঠানো লোকজনের পক্ষে তা সম্ভব হয়নি। কালিগঞ্জের ব্যবসায়ীরা অনুকূল ও প্রতিকূল হাওয়া আঁচ করার তালিমে আছেন। যশোর, খুলনা ও ঢাকার বাঙালি নিহতদের খবর আসছে। আহতদের কয়েকজন এখানে ফিরে এসেছেন। যশোরে দোকানপাট ও মাল-সম্পদ হারিয়ে অনেক স্থানীয় ব্যবসায়ী দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। দারোগা শুধু বললেন, তার শক্তি-সাহস কিছুই নেই। তবু নির্দেশ পালনে তিনি এগিয়ে এলেন।

স্থানীয় আর্মির রিটায়ার্ড মাওলা মিয়া এ সময় আমার সঙ্গে এসে মিলিত হলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে কালিগঞ্জের কালিমা দূর করার জন্য একটি সেকশনের সাহায্যে থানাব হাজতটি পূর্ণ করে ফেললাম। হাজতের চাবি আমার কাছে এনে আর্মির সশস্ত্র গার্ড দিলাম। এক ঘণ্টা পর আর্মির গার্ড উইথড্র করে নিয়ে দারোগা লতিফকে ডেকে বললাম, 'আপনার আর কি চাই?' তিনি শুধু বললেন, 'আর কিছুর প্রয়োজন নেই, বাকিটা আমি পারব, আপনার এখন কোনোকিছুর অভাব হবে না।' দারোগাকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হলো কাউকে মারপিট বা হত্যা করা থেকে বিরত থাকার জন্য। এক ঘণ্টার মধ্যেই সবাইকে ছেড়ে দেয়া হলো। পুরা ব্যাপারটাই জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করল। এরপর পুরো অভিযানে কোনো কিছুরই অভাব হয়নি।

কালিগঞ্জের পর দুলাল মুন্দিরা-মোবারকগঞ্জ চিনির কল পেছনে ফেলে সামনে কেয়াবন পর্যন্ত এগিয়ে একটা বাজারের কাছে বিকাল নাগাদ থামলাম। সবাইকে সন্ত্রস্ত

---

[২] এসডিপিও : সাব-ডিভিশনাল পুলিশ অফিসার বা মহকুমা পুলিশ প্রশাসক।

ও বিরূপ দেখে রাস্তার পাশে এক ভাঙা টিনশেডের সামনে এক সুবেশধারী নাদুস-নুদুস ছাত্র ধরনের যুবককে অকস্মাৎ রাইফেলের বাঁট দিয়ে কয়েক ঘা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন রাজত্বে আছো বাবা, বুঝ না?' ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল। আশপাশের অন্য কয়েকজন হতাশা ও উদ্বেগের সঙ্গে দৌড়ে পালিয়ে না গিয়ে ফ্যাকাশে মুখে ধীরপায়ে আমার পাশে এগিয়ে এলো। যুবকটি শেডের তালা খুলে আমাকে ডাকলো। শেডের ভেতরে মুখ বাড়িয়ে এবার বেকুফ বনার পালা আমার, ডাব, ছোলা, চিড়া, গুড়-মুড়ির পাহাড়। আসল গোলমাল লাগিয়েছে আমাদের সৈন্যদের পাকিস্তান আর্মির ইউনিফর্ম, তাই আসল-নকল বোঝার ব্যাপারে স্থানীয় জনগণের পরীক্ষা। আমাদের অগ্রযাত্রার খবর আগেই পৌছে গেছে। তারই প্রশাসনিক বন্দোবস্ত। জনগণের কাছে নিজের রূঢ়তার জন্য ক্ষমা চাইতে তারা ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, 'আপনার স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে জানাশোনা না থাকায় এমন সেমসাইড হওয়াই স্বাভাবিক।' বিশখালী ও ভাটুই হাটের যুদ্ধে আমার ভূমিকা ও কালিগঞ্জ থানার কার্যকলাপ আমার ব্যাপারে তাদের সন্দেহ মুক্তি ঘটিয়েছে। স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মীরা জানালেন, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দূর থেকে তারা আমাদের ছায়ার মতো অনুসরণ করে আসছেন। আমাদের সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সব ভাবনা মুক্ত হয়ে এবার সামনে এগুনোর প্রেরণা পেলাম।

যশোর ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখী ঢাকা-খুলনা মূল সড়ক ধরে কেয়াবন থেকে বারোবাজার পর্যন্ত কোম্পানি নিয়ে সন্ধ্যার আগে পৌছা গেল। মূল হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে বারোবাজার, কালিগঞ্জ, ঝিনেদা পর্যন্ত টেলিফোন যোগাযোগ স্থাপন করা হলো। সন্ধ্যার পর পূর্বদিকে বারোবাজারের মাইল দুয়েক দক্ষিণে মান্দারতলা থেকে লেবুতলা-সীমাখালী পর্যন্ত স্ক্রিনিং ফোর্সের মতো একটা প্লাটুন মাইনাস পেট্রোল পাঠানো হলো। কারণ লেবুতলা দিয়ে যশোর শহর ও ক্যান্টনমেন্টের পাশ দিয়ে ঢাকা অভিমুখে মাগুরা যাওয়ার রাস্তা ছিল। বারোবাজার থেকে একটা প্লাটুন নিয়ে পেছনে কেয়াবনে ফিরে এলাম। সুবেদার ফিরোজসহ গ্রামের পথে পাকা সড়কের পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ দিকে যশোর ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে ফাইটিং পেট্রোল নিয়ে অগ্রযাত্রা চললো। কারণ যশোর থেকে পশ্চিম দিক দিয়ে চৌগাছা, কোটচাঁদপুর দিয়ে উত্তরে বারোবাজার, কালিগঞ্জ, ঝিনেদা, ঝিনেদা-চুয়াডাঙ্গা রোডে সাধুহাটি পর্যন্ত যাওয়ার রাস্তা ছিল। পশ্চিমে শীর্ণকায়া ভৈরব নদী, বাঁওড় ও অন্যান্য জলাশয়ের স্বভাবিক প্রতিবন্ধকতা ছিল।

রোমাঞ্চকর এই অভিযান। যাত্রার শেষ নির্দেশ দেয়ার পরও দেখি রাতের আলো-আঁধারিতে খেজুর বনে সবাই নিশ্চুপ, কেউ নড়ছে না। নিজেদের নিঃশ্বাস ছাড়া অন্য কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। গাঁয়ের কুকুরগুলো পর্যন্ত কোনো প্রকার শব্দ না করে আমাদের অনুসরণ করে যাচ্ছে। সুবেদার ফিরোজ পর্যন্ত লজ্জিত ও লা-জবাব। বেঙ্গল রেজিমেন্টের দু'জন তরুণ সৈনিক অস্ত্র হাতে স্তব্ধতা ভেঙে আমার দিকে এগিয়ে এলো। সুবেদারের ভ্রুকুটিকে তারা গ্রাহ্য করল না। অভাবনীয় নাটকীয় কিছুর আন্দাজ করে হাতের অস্ত্র মাটিতে রেখে সোজা হওয়ার আগে দেখি তড়িৎগড়িতে এবাউট টার্ন

হয়ে অস্ত্রসুদ্ধ অর্ধচন্দ্রাকারে তারা আমাকে ঘিরে আছে। ভয় বা উদ্বেগের কোনো কিছু তখন আমার মধ্যে নেই। নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছি। আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে তাদের বললাম, 'বন্ধুরা, আপনাদের কমান্ড করার যোগ্যতা আমার নেই, আপনাদের দেয়া অস্ত্র আপনারা নিয়ে নিন।' হুঙ্কার ছেড়ে গর্জে উঠলেন সিলেটের সুবেদার ফিরোজ। 'কী কতায় কী কইন, উল্টা বুঝলেন স্যার। হারামজাদারা আইজও আপনারে চিনে নাই। মরণেরে কাছে পাইয়া এইবার হুস হইছে। এই কয়দিনে আপনার সামনে হুওরেরা বহুত বেয়াদবি কইরা ফালাইছে, এইবার মাপ চাইবার চায়।' আমার কিছু বলার ও বোঝার আগেই বাঁধভাঙা বন্যার মতো প্রথমে মোজাহেদ, পরে অন্য সৈনিকরা পা ছুঁয়ে সালাম করে ক্ষমা চেয়ে দোয়া চাইলেন। রাস্তার দুই পার্শ্বে বিন্যস্ত হয়ে আমাকে মাঝে রেখে এবার চলল অগ্রাভিযান। সারারাতের পেট্রোলিংয়ের পর সূর্যোদয়ের আগে উভয় দল নিয়ে বারোবাজারে ফিরে এলাম। পূর্বাহ্নে সৈনিকদের ফাইটিং পেট্রোলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে পুরোপুরি ব্রিফ না করার কারণেই গোলযোগ দেখা দিয়েছিল।

সারাদিন চলল বিভিন্ন দিকে খোঁজখবর ও রেকি। বিকেল নাগাদ আরো এগিয়ে সামনে মান্দারতলার কোম্পানি মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। রাতের মধ্যে কোম্পানিকে মান্দারতলায় সরিয়ে আনা হলো। কোম্পানিকে এবার তিন প্লাটুনে বিন্যস্ত করে সুবেদার ফিরোজের নেতৃত্বে এক প্লাটুন যোদ্ধা, আরআর এবং ভারী মেশিনগানসহ মূল পাকা সড়কের ওপর ডানে-বামে রাস্তার পাশ ধেয়ে মোতায়েন করা হলো। পূর্বে ডানদিকে লেবুতলায় সুবেদার মুকিতের নেতৃত্বে রাখা হলো এক প্লাটুন। পশ্চিমে বামদিকে ভৈরব নদী, বাঁওড়, চৌগাছা-কোটচাঁদপুর সড়কের তাহিরপুর পর্যন্ত সুবেদার মজিদ মোল্লার অধীনে দেয়া হলো প্লাটুন মাইনাস। প্রতিদিনই সশস্ত্র ও নিরস্ত্র যোদ্ধারা এসে কোম্পানির শক্তি বৃদ্ধি করতে লাগলেন।

ফ্রন্টলাইনের খুবই কাছাকাছি পাকা সড়কের ডানে গ্রামের ভেতরে লঙ্গর স্থাপন করা হলো। কয়েকদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেল, যদিও সব দিক থেকে সরবরাহ খুবই সুবিধাজনক, তবুও ফ্রন্টলাইনের এত কাছাকাছি লঙ্গর রাখা নিরাপদ নয়। কারণ আমাদের পশ্চাদপসরণ, ডানে-বামে সরে যাওয়া ও অগ্রাভিযানের কারণে এ স্থানে লঙ্গর নিরাপদ নয়। তাই মূল লঙ্গর পাকা সড়কের ডানে বারোবাজারের পেছনে গ্রামের এক অবস্থাপন্ন লোকের পাকা বাড়ির কাছাকাছি আঙিনায় স্থাপন করা হলো। এখানে পানির বন্দোবস্ত, টিউবওয়েল ও পাকা ঘাটওয়ালা পরিষ্কার বিশুদ্ধ পানির পুকুর ছিল। এখান থেকে রান্না করা খাবার গাড়িতে করে ফ্রন্টে মান্দারতলায় নেয়া হতো। সুবেদার মুকিত ও মজিদ মোল্লাকে এখান থেকে খাবার পাঠানো যেতো না। তাদের চিনি, চা, গুঁড়াদুধ ও বিড়ি-সিগারেট জাতীয় কিছু জিনিসপত্র জিপে করে মাঝে মাঝে দিয়ে আসা হতো। স্থানীয়ভাবেই তাদের খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। খাবার-দাবারের ব্যবস্থার জন্য স্থানীয় জনগণই ছিলেন ভরসা। তারা আমাদের বহু অসুবিধা দূর করেছিলেন।

মান্দারতলায় ঢাকা-খুলনা মূল পাকা সড়কের ডানদিকে সামান্য দূরত্বে রেললাইন। প্রাইমারি স্কুলের সামনে দিয়ে পূর্বদিকে একটি কাঁচা রাস্তা লেবুতলার দিকে চলে গেছে।

সে কাঁচা রাস্তায় জিপ, পিকআপ চলাচল করতে পারে। মান্দারতলা থেকে পেছনে উত্তরদিকে গিয়ে বারোবাজারের কাছাকাছি একটি কাঁচা রাস্তা পশ্চিমে চৌগাছা-কোটচাঁদপুর সড়কের সংযোগকারী কাঁচা রাস্তায় জিপ চলতে পারে।

পাকা রাস্তার পূর্বে ডানদিকে স্কুল সংলগ্ন আম বাগান। তার পেছনে উত্তরে খেজুর বাগান। পাকা রাস্তার পশ্চিমে বামদিকে রেললাইন পার হয়ে তিন-চারশ' গজ সামনের দিকে এক দুর্ভেদ্য সুবিস্তৃত বহির্মুখী বিশাল খেজুর বন। এ খেজুর বনের সঙ্গে সামনে প্রায় বিশুষ্ক নদী, বিল-বাঁওড়ের প্রতিবন্ধকতা। এ খেজুর বনের সামনে যশোর ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখী ঝনঝনিয়ার ফাঁকা মাঠের প্রায় চার হাজার গজের ফিল্ড অব ফায়ারের সুবিধা ছিল।

রাস্তার ডানে স্কুলের পাশের আম বাগানে পাকা রাস্তা নিশানা করে ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী আরআর স্থাপন করা হলো। আরআরের নিকট দূরত্বে দক্ষিণে ফিল্ড অব ফায়ারের খালি মাঠ নিশানা করে ভারী মেশিনগান মোতায়েন করা হলো।

মান্দারতলা ও লেবুতলার মাঝে দূরত্ব ছিল প্রায় এগারো হাজার গজের মতো। এ দূরত্বটাকে কভার করার জন্য স্থানীয় আনসার-মোজাহেদদের দিয়ে দুটো সেকশনকে আনসার কমান্ডার মাকসুদের নেতৃত্বে মান্দারতলার মাইল দেড়েক দূরে মান্দারতলা-লেবুতলার মাঝে এক খেজুর বাগানে স্থাপন করা হলো।

স্থানীয় জনগণের কোদাল-টুকরি চেয়ে নিয়ে সব পজিশনে উপযুক্ত বাঙ্কার, ওভারহেড কভার, ক্যামোফ্লাজ ইত্যাদি তৈরি করা হলো। এসব অঞ্চলে অধিকাংশ জায়গায় বালু মাটি। মাটি খুঁড়লে সহসা পানি পাওয়া যায় না। ফলে বাঙ্কার বা মরিচা খোদাইতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না। ইতোমধ্যে শত্রু যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে উত্তরে ঝিনেদার দিকে আসার রাস্তা বন্ধ করার জন্য হায়বাতপুর ব্রিজটি পঁচাত্তর পাউন্ড বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

আমাদের ফাইটিং পেট্রোল যশোর ক্যান্টনমেন্ট অভিমুখে হায়বাতপুর ব্রিজ পর্যন্ত পেট্রোলিং শুরু করল। লেবুতলার পজিশন থেকে সুবেদার মুকিতও যশোর ক্যান্টনমেন্টের দিকে পেট্রোল পাঠানো আরম্ভ করলেন। পাকিস্তানিরা লেবুতলার দিকে পেট্রোল পাঠাতে থাকল। লোক মারফত বিলম্বে খবর পেয়ে মান্দারতলা থেকে পেট্রোল নিয়ে লেবুতলা পর্যন্ত এগিয়ে সম্মিলিতভাবে পাকিস্তানিদের ধরার বা মোকাবেলা করার চেষ্টায় কয়েকবারেই অল্পের জন্য ব্যর্থ হতে হলো।

প্রায় অর্ধশত গাড়িতে করে পাকিস্তানিরা কী মনে করে যশোর প্রায় খালি করে খুলনা চলে গেল। ঝিনেদার মাহবুব মানব তরঙ্গ দিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখলের এক আত্মঘাতী দুর্বার পরিকল্পনার কথা আমাকে বলেছিলেন। লাখ লাখ বিক্ষুব্ধ জঙ্গি জনতা দিয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে দখলের পরিকল্পনার কথা আমরা ভাবতাম। লক্ষাধিকের আত্মোৎসর্গের বিনিময়েও বিদেশী রাজ্য সংলগ্ন একটা ক্যান্টনমেন্ট ও এয়ারপোর্ট আমাদের দখলে থাকলে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসই ভিন্ন খাতে বইবে, এমন উচ্চাশায় আমরা উৎসাহী ছিলাম। কয়েক লাখ জনতার বিসর্জনে অন্তত কয়েক হাজারও যদি যশোর ক্যান্টনমেন্ট দখল করতে পারে তবে জয় আমাদের সুনিশ্চিত।

বিক্ষুব্ধ জঙ্গি জনতাকে সংগঠিত করা তখন মোটেই কষ্টকর ছিল না। কিন্তু পুরো পরিকল্পনায় রাজনৈতিক অনুমোদন না পাওয়ায় তা করা গেল না। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অবস্থার মূল্যায়নে ব্যস্ত। প্রাথমিকভাবে পরের ওপর বেশি ভরসা ও আশাবাদের ওপরই শুরু হলো বিপর্যয়ের সূচনা। যশোর ক্যান্টনমেন্ট মানব তরঙ্গ দিয়ে দখলের পরপরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া দখল কায়েম রাখার ব্যাপারে রাজনৈতিক সংশয় দেখা দিল। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাহায্যের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের রূপরেখা 'নিই-নিচ্ছি' করে সময় দ্রুত বয়ে চলল। পাকিস্তানিরা সংহত হতে থাকলো। ভারতের প্রত্যক্ষ সামরিক সাহায্যের জবাব সুস্পষ্ট না হলেই সম্ভবত সর্বোত্তম হতো। বাংলাদেশিরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রথমেই শেষ লড়া লড়তে পারত, ফলাফল যা-ই হোত না কেন। মেজর ওসমানও ক্যান্টনমেন্টের ওপর আত্মঘাতী মরণ আঘাতের অনুমতি দিতে দ্বিধায় পড়ে গেলেন। এভাবেই মূল উদ্দেশ্য বাস্তবে মুখ থুবড়ে পড়লো।

পাকিস্তানিরা আবার খুলনা থেকে গাড়ি গাড়ি নতুন শক্তি ও সংখ্যায় যশোর ফিরে এলো। ঢাকা থেকে একটা সামরিক বিমান অনেক ওপর দিয়ে এসে প্রতিদিন এক বা একাধিক ফ্লাইটে অস্ত্র, গোলাবারুদ, রসদ, সাজ-সরঞ্জাম ও সৈন্যদল পৌঁছে দিয়ে যেতে থাকলো। মান্দারতলা ও লেবুতলার মাঝামাঝি স্থান দিয়ে প্লেনটি উড়ে আসত। বহু চেষ্টা করেও অতিরিক্ত একটি এলএমজি জোগাড় করে মান্দারতলা ও লেবুতলার মাঝামাঝি স্থাপন করে প্লেনটিকে ঘায়েল করা গেলো না। এলএমজির রেঞ্জের মধ্যে প্লেনটিকে আনা যেতো বলে বিশ্বাস ছিল। কারণ যশোর এয়ারপোর্ট সেখান থেকে বেশি দূরে ছিল না।

লেবুতলার ব্যবস্থাপনার অসুবিধার জন্য মাগুরার এসডিও[১] অলিউর রহমান এলেন। সেদিন আমিও রসদ নিয়ে লেবুতলা গেছি। এসডিও সাহেব আমাদের জন্য একটি গরু জবাই করলেন। গরুর চামড়া ছিলানো হলো, এমন সময় পাকিস্তানিদের অগ্রবর্তী পেট্রোলের সঙ্গে পড়ন্ত বেলায় ভীষণ গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। আমার আনন্দ যে বিপর্যয়ের সময় প্লাটুনটির পাশে থাকতে পারলাম। ইপিআররা আমাকে শুধু বললেন, 'স্যার আপনি আমাদের ছেড়ে যাবেন না।' আমাকে আগে বাড়তে না দিয়ে প্লাটুন কমান্ড পোস্টে বসিয়ে সুবেদার মুকিত সিংহবিক্রমে পাকিস্তানিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসায় পাকিস্তানিরা পিছিয়ে গেল। তাদের ক্ষয়ক্ষতি নির্ধারণ করা গেল না। আমাদের কয়েকজন সামান্য আহত হলো। একটা চটপটে তরুণ ছেলেকে গালেমুখে কিছু আঘাতের দাগসহ আমাদের মাঝে সন্ধ্যা নাগাদ পাওয়া গেল। দক্ষিণে যশোরের দিকে তিন মাইল দূরে এক বাজারে এ তরুণ ছেলেটির সাইকেল কেড়ে নিয়ে তাকে আমাদের পজিশন দেখে গিয়ে রিপোর্ট করতে বলেছে পাকিস্তানিরা। তাকে কিছু উত্তম-মধ্যম দিয়ে পাঠিয়েছে। ফিরে গিয়ে আমাদের অবস্থানের কথা বললে তাকে তার সাইকেল ও টাকা দেবে বলেছে। স্নেহের হাত বুলিয়ে তাকে কাছে ডেকে বললাম, 'যাও দেখা তো হলো, এবার তোমার সাইকেল ও টাকা নিয়ে এসো।

---

[১] এসডিও-সাবডিভিশনাল অফিসার বা মহাকুমা প্রশাসক।

আমাদের তো তোমাকে দেয়ার কিছু নেই।' রুদ্ধ আবেগে ছেলেটি ফোঁসাতে থাকলো। আমাদের একজন যোদ্ধা বাড়ল।

গুলে-হরিবোল গরুর মাংস লাপাত্তা। স্থানীয় মুসলিম লীগাররা নিয়ে গেছে বলে এসডিও সাহেব দোষারোপ করলেন। সেদিন যোদ্ধাদের না খেয়ে রোজার কাফফারা দিতে হলো। এসডিও সাহেবকে বলা হলো, 'পেছন থেকে লজিস্টিক সাপোর্ট দেবেন, ফ্রন্টলাইন আপনার কর্ম নয়।' বাঙ্কারে সবাইকে বিনিদ্র রজনী কাটাতে হলো। মূল লঙ্গর থেকে নিয়ে যাওয়া চা-চিনি, পাউডার মিল্ক ও বিড়ি-সিগারেট নিয়েই সবাইকে তুষ্ট থাকতে হলো। পাকিস্তানিরা মুক্তিবাহিনীর পজিশন জেনে গেছে বিধায় রাতে বা উষালগ্নে ভোররাতে আক্রমণের সম্ভাবনায় সেখানেই থেকে যাওয়া স্থির করলাম। রাতে প্লাটুনটিকে সারপ্রাইজ চেকের ইচ্ছে ছিল। নিজের অবস্থান সম্পর্কে কাউকে সুস্পষ্ট কিছু না বলা মারাত্মক ভুল হয়েছিল। রাতে পার্শ্ববর্তী জীর্ণশীর্ণ দশার একটি পাকা বাড়িতে উঠলাম। টিমটিমে কুপি হাতে একটি ছোট ছেলে কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে এলো। মাসিমা বলে ডাক দিতে এক প্রৌঢ়া মহিলা এগিয়ে এলেন। তার কাছে খাবার ও আশ্রয় চাইতেই দুঃখ ও অভিমানে এ হিন্দু মহিলা কেঁদে ফেললেন। একদিন তার সবই ছিল, স্বামী নিখোঁজ, বড় ছেলে পাগল হয়ে নিরুদ্দেশ, ছোট ছেলেকে নিয়ে তিনি স্বামীর সংসার আগলে পরপারের দিন গুনছেন। প্রস্থানের উদ্যোগ নিতেই 'বালাইষাট' বলে ঝটপট তিনি চিড়া-গুড়-নারিকেল খেতে দিলেন। এমন তৃপ্তির স্নেহময় হাতের খাবার জীবনে কমই খেয়েছি। শ্রান্তিতে-ক্লান্তিতে কখন যে মাসিমার স্নেহময় হাতের কোমল বিছানায় ঘুমিয়ে গেছি জানি না। ঘুম ভাঙলো কাকডাকা ভোরে। তাকে পাঁচটা টাকা দিতে গেলে 'নারায়ণ, নারায়ণ' বলে তিনি জিব কাটলেন। জোর করেই সে টাকা তার ছেলের হাতে গুঁজে দিয়ে এলাম। জানি না আজ আমার লেবুতলার মাসিমা কোথায় হারিয়ে গেছেন।

এদিকে ইপিআর প্লাটুনে তুলকালাম কাণ্ড। 'প্রফেসর গেল কই'? রসিকতা করে কেউ বলছেন, 'সেপ্টিপিন পালাইছে'। মুকিতের কথা, 'ড্রাইভার আছে, গাড়ি আছে, অফিসার কই? আসল বিপদের সময় যে সঙ্গে ছিল, এখন সে কই? রাস্তাঘাট চেনে তো? পাকিস্তানিদের কমান্ডোদের শিকার হয়নি তো? হয় অফিসারকে বের করে দিতে হবে, নয় হারামজাদাদের একদিন কী আমার একদিন' বলে সবাইকে তিনি স্ট্যান্ড টু করে রাখলেন। তাদের নাকের ডগায় আমি ছিলাম। সকালে আমাকে পেয়ে সব রসিকের চোখ ছানাবড়া।

পশ্চিমে সুবেদার মজিদ মোল্লার প্লাটুনে গিয়ে দেখি আশপাশের স্বেচ্ছাসেবকরা মুরগি ও খাসির গোস্তের সুখাদ্য নিয়ে ব্যস্ত। ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের কয়েকজন পিয়ন-দারোয়ানকেও এখানে গোস্ত-পরোটায় ব্যস্ত দেখলাম। যুদ্ধপ্রস্তুতি বাদ দিয়ে হালুয়া প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মজিদকে ভীষণভাবে শাসিয়ে রান্না করা গোস্ত কড়াইসুদ্ধ ক্রুদ্ধ আক্রোশে ল্যাট্রিনে ফেলে দিলাম। লড়াই এই না মাত্র শুরু। হালুয়ার গ্রুপ ভাগ। ছাত্র-জনতা আর এমন হবে না বলে ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

যুদ্ধক্ষমতার সুবিধার জন্য মান্দারতলায় রাখা হলো বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিকাংশ সৈন্য। সর্বশেষ পূর্ব-পশ্চিমে ছিল মূলত ইপিআররা। মান্দারতলা ও লেবুতলার

মাঝখানে রাখা ছিল আনসার ও মোজাহেদদের। ক্যাপ্টেন এআর আজম চৌধুরী ব্যাটল ম্যাপসহ ফ্রন্টলাইনে এসে উপদেশ দিয়ে গেলেন। এসডিপিও মাহবুব প্রায়ই ফ্রন্টলাইনে এসে যোদ্ধাদের দেখে যেতেন। তিনি সবাইকে দেয়ার জন্য পাঁচ হাজার টাকা দেন। কয়েকদিনের ব্যবধানে লেবুতলা ও মান্দারতলার মধ্যে পাকিস্তানিদের সঙ্গে বেশকিছু খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেল। দু'দলের কারোরই এলাকা দখলে রাখার যুদ্ধের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গেল না।

গাড়ি, রসদ প্রভৃতির জোগাড়ে প্রায়ই পেছনে বারোবাজার ও কালিগঞ্জে আসতে হতো। মান্দারতলায় আরআরের অবস্থান পর্যন্ত টেলিফোন লাইন ছিল। ১২ এপ্রিল দুপুরে ক্যাপ্টেন আজম মান্দারতলার ফ্রন্টলাইনে মূল পাকা সড়কে বসে ব্যাটল ম্যাপ দেখছিলেন। তখনই দূর-দূরান্ত থেকে গোলাগুলির ও ব্লেনডিসাইডের আওয়াজ আসছিল। ব্যস্ততার সঙ্গে তিনি ম্যাপ গুটিয়ে সুবেদার ফিরোজের সঙ্গে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় ও কথাবার্তা বলে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে চলে গেলেন।

ফিল্ড অব ফায়ারের ফাঁকা স্থানের অধিকতর সুবিধা পাওয়া যাবে ভেবে ১২ এপ্রিল সন্ধ্যার পরপরই ভারী মেশিনগানটি রাস্তার পূর্ব পার্শ্ব থেকে স্থানান্তর করে পশ্চিমে খেজুর বাগানে সরিয়ে নেয়া হলো। এভাবে একস্থানে স্থির থেকে ডানে-বামে পেট্রোলিং করে কাজের কিছু হবে না। পাকিস্তান আর্মি রেকি, পেট্রোল ও অন্যান্য সূত্র থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের খবরাখবর নিচ্ছে। তাদের গোলাগুলি ও আনাগোনা যেন একটা বিশেষ কিছু হতে যাচ্ছে ধরনের বিশ্বাস মনে সৃষ্টি হলো। পুরো ব্যবস্থাপনায় কিছু পুনর্বিন্যাস আরম্ভ করলাম।

রাতে স্থানান্তরিত পশ্চিম পাশের খেজুর বনের ভারী মেশিনগান সেকশনকে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে তাদের সামনের ফাঁকা মাঠের ফিল্ড অব ফারার বরাবর নির্দিষ্ট আওতার ভেতর শত্রু না আসা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকার জন্য তাদের কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে দেয়া ছিল। মূল পাকা সড়কে যা-ই ঘটুক তার ব্যাপারে ভারী মেশিনগানকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকার নির্দেশ দিলাম। মূল পাকা সড়ককে সামলানোর জন্য আরআর রিকয়েললেস রাইফেল ও পূর্ব পার্শ্বের প্লাটুনই ছিল যথেষ্ট। প্রয়োজনে পূর্ব পার্শ্বে নিয়োজিত মান্দারতলা ও লেবুতলার মাঝের মাকসুদের প্লাটুনের সাহায্য পাওয়া যাবে।

১৩ এপ্রিল রসদ, গাড়ি, গাড়ির তেল সংগ্রহ জাতীয় কাজে সকাল ৯টার দিকে মান্দারতলা থেকে বারোবাজার হয়ে কালিগঞ্জ পৌছার সঙ্গে সঙ্গেই সুবেদার ফিরোজের উদ্বিগ্ন টেলিফোন পেলাম। পাকিস্তানি সৈন্য মূল পাকা সড়ক ধরে গাড়ির কলাম নিয়ে এগিয়ে আসছে। কালিগঞ্জ থেকে সে সংবাদ টেলিফোনে ঝিনেদাকে জানানো হলো। ঝিনেদা সে সংবাদ টেলিফোন ও ওয়্যারলেসে মেজর ওসমানকে চুয়াডাঙ্গায় পাঠায়। এভাবে যুদ্ধের গতিধারা সম্পর্কে সর্বক্ষণ ঝিনেদা ও হেডকোয়ার্টার চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমানকে অবহিত করা হচ্ছিল।

বারোবাজারের লঙ্গর পর্যন্ত কোনো টেলিফোন লাইন দেয়া ছিল না। ভুলবশত তাদের সঙ্গে কোনো সুনির্দিষ্ট বার্তাবাহক মারফতও সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা ছিল না। ফলে যুদ্ধের গতিধারা সম্পর্কে তাদের না জানার ফল হয়েছিল মারাত্মক।

সুবেদার ফিরোজকে রেঞ্জের ভেতরে আসার আগে আরআরের গোলা ছুড়তে নিষেধ করলাম। শত্রুর অগ্রগামী ভ্যানগার্ড গাড়িটি আমাদের আরআরের তিন নম্বর গোলার সঠিক নিশানায় ঘায়েল হলো। সম্পূর্ণ গাড়িটিতে আগুন ধরে গেলো। আগুনের লেলিহান শিখা আকাশে অনেকদূর ঊর্ধ্বে শিখা বিস্তার করলো। পেছনের দু'নম্বর গাড়িটি আকস্মাৎ তাল সামলাতে না পেরে সৈন্যসামন্তসহ রাস্তার পাশে কাত হয়ে পড়ে গেলো। গাড়ির কনভয়ের কলাম রাস্তায় হল্ট হলো।

ঝিনেদাকে শত্রুর আগমনের খবর দিতে ঝিনেদার ওয়াপদা থেকে ক্যাপ্টেন আজম বললেন, 'আরআরের পাল্লায় এখনো আসেনি, তারা তো অনেক দূরে'। পরে আমাদের আরআরের গোলায় শত্রুর গাড়ি বিধ্বস্ত ও অগ্রাভিযান থেমে যাওয়ার সংবাদ দিতে টেলিফোনেই তাদের আনন্দ-উল্লাসের আওয়াজ পেলাম। চুয়াডাঙ্গায় সে সংবাদ মেজর ওসমানের কাছে পৌঁছাতেই তড়িঘড়ি কন্ট্রোল হেডকোয়ার্টারে স্বয়ং এসে তিনি ওয়ারলেসে কোম্পানিকে মোরারকবাদ ও প্রফেসারের (আমার) জন্য অভিনন্দন বাণী পাঠান। জীবনে এমন আনন্দঘন উদ্বেগে আকুল অবস্থার সম্মুখীন বেশি হইনি।

শত্রু এবার গাড়ি থেকে নেমে পূর্বদিকে অধিক সংখ্যায় গোলাগুলির বন্যা সৃষ্টি করে পায়েদল যাত্রা আরম্ভ করলো। দু'দলে তুমুল লড়াই শুরু হয়ে গেলো। মান্দারতলা ও লেবুতলার মাঝে মোতায়েন মাকসুদের আনসার-মোজাহেদ প্লাটুনও বীরবিক্রমে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সম্ভবত সর্বক্ষণ নিশ্চুপ থাকার কারণে মাকসুদের প্লাটুনের ব্যাপারে শত্রু অবহিত ছিল না, তাই পূর্বদিকে বিস্তৃত (এক্সটেনডেড) লাইনে এগুতে গিয়ে শত্রুকে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির স্বীকার হতে হলো। নিজ পক্ষেও বেশ কয়েকজন হতাহত হলো।

হেডকোয়ার্টার বারোবাজার থেকে কালিগঞ্জ সরিয়ে আনা হলো। মান্দারতলায় ফ্রন্টলাইনে আমার যাওয়ার প্রস্তাবে ফিরোজ বিশেষভাবে আপত্তি করলেন। সংকটের সন্ধিক্ষণে সাথীদের ছেড়ে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থানের অপবাদ থেকে মুক্তির জন্য মান্দারতলা যাত্রার জেদাজেদিতে ফিরোজ হয় জেনারেল উইথড্রল, না হয় তার নিজের চলে আসার অনুমতি চাইলেন। তিনি আমাকে বললেন, 'স্যার, আপনি অনেক কিছু এখনো বুঝেন নাই, মন খারাপ কইরা লাভ নাই, আপনি পিছের যোগাযোগ ও আমার সাপ্লাই ঠিক রাখেন। আমি আপনের সঙ্গে কথা কইতে আছি, সবাই জানে আপনে আমাদের সঙ্গে আছেন—ফৌজের এর বেশি দরকার নেই'।

বেলা বারোটা নাগাদ দূরপাল্লার কামানের গোলা আসা আরম্ভ হলো। প্রথমে আমাদের পজিশনের অনেক দূরে পেছনে গোলা পড়া আরম্ভ হলো। পরে রেঞ্জিং করে তারা গোলা আমাদের পজিশন বরাবর গোলা আনা আরম্ভ করল। এবার উদ্বিগ্ন ফিরোজ কাউকে বিশেষ কিছু না বলে আরআরটি রক্ষা করা যাবে না ভেবে আরআরটি কালিগঞ্জে নিয়ে এলো। সাহায্যের আকুল আবেদন জানিয়ে ঝিনেদাকে সংবাদ দিলাম। সংকট সময়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে মেজর ওসমান সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পাকিস্তানি সৈন্য পূর্বদিকে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করেও এগুতে পারলো না। রাস্তার পশ্চিম দিকে সবকিছু নীরব, খালি মাঠ দেখে তারা এবার ঝনঝনিয়ার ফাঁকা মাঠ

ধরে দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিমে খেজুর বনের দিকে নিশ্চুপ ভারী মেশিনগান বরাবর অগ্রসর হলো। পশ্চিম দিক থেকে কোনো গোলাগুলি নিক্ষিপ্ত না হওয়ায় শত্রুর আর্টিলারির শেলের গোলাও সেদিকে বিশেষ একটা পড়লো না। সে নিবিড় খেজুর বনে দু'একটা বিক্ষিপ্ত গোলায় তেমন ভয় বা ক্ষতির কিছু ছিল না।

পাল্লায় আসতেই ঝড়ো হাওয়ার উল্কাগতিতে নিশ্চুপ ভারী মেশিনগান শত্রু নিধনে গর্জে চলল। এ মরণফাঁদে পা দিয়ে শত্রুকে চরম মূল্য দিতে হলো। পরবর্তী দু'দিনে এ ভারী মেশিনগানের মুখেই নিহত আশি জনের লাশ শত্রুরা মাঠ থেকে কুড়িয়ে নিয়েছে। পূর্বপাশের ব্যর্থতার পর শত্রু মরিয়া হয়ে পশ্চিমের সব ক্ষয়ক্ষতি ও বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে সম্মুখে এগিয়ে এলো। শত্রুর চায়নিজ বুলেট আমাদের ভারী মেশিনগানের নাম্বার ওয়ানের বুকে লেগে রক্তপাত আরম্ভ হলো। নিজের সঙ্গের গামছা ছিঁড়ে বুক বেঁধে সর্বশেষ শক্তি নিয়োগ করে নিজের জীবনের মায়া উপেক্ষা করে তিনি শত্রু নিধনে বেপরোয়া নিয়োজিত রইলেন। গুলি ফুরিয়ে আসছে, রক্তক্ষরণে তিনি নিস্তেজ হয়ে পড়ায় মেশিনগানের দ্বিতীয় নাম্বারের সৈনিক তার স্থান নিয়ে শত্রু নিধন করে চললেন। শত্রু এবার ভারী মেশিনগানের পজিশন বরাবর খেজুর বনে দূরপাল্লার গোলা ফেলা আরম্ভ করলো। নিঃশেষপ্রায় গুলির মুখে শত্রুর 'হ্যান্ডস আপ, হ্যান্ডস আপ' ধ্বনির মধ্যে মেশিনগানের সৈনিককে বহন করে একজন উর্ধ্বশ্বাসে ঝড়ো হাওয়ার মতো খেজুর বনের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে পাশের গাঁয়ে নিয়ে তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। পরে তাকে একটি ঘোড়ার গাড়িতে করে রাতের মধ্যেই বর্ডার পার করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। চায়নিজ গুলি সরাসরি কলিজা ছেদ না করলে, তাৎক্ষণিক প্রাথমিক চিকিৎসা ও পরবর্তী উপযুক্ত চিকিৎসা হলে ভয়ের কিছু থাকে না; আহত ব্যক্তি তখন বেঁচে যান। চায়নিজ গুলি সৈনিকের বুকে আঘাত হেনে পিঠ ভেদ করে সম্পূর্ণ বের হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কলিজা ভেদ করেনি বলে ইপিআরের সে অসীম সাহসী বীর সৈনিক বেঁচে গিয়েছিলেন।

দূরপাল্লার কামানের গোলায় আমাদের পজিশন বিধ্বস্ত হওয়া আরম্ভ হলো। সাহায্যের জন্য ঝিনেদাকে এসওএস মেসেজ দিতে ক্যাপ্টেন আজম সাহায্য পাঠাচ্ছেন বলে খবর দিলেন। শত্রু পূর্বদিকে মাকসুদের পজিশনেরও পূর্বদিক দিয়ে আমাদের পেছন দিক থেকে ঘিরে ফেলতে চাইলো। কামানের অবিরাম গোলায় আমাদের পূর্বের পজিশন বিধ্বস্ত হয়ে গেল। মাকসুদ পিছে হটে গেলো। ফিরোজ বারোবাজারে পিছিয়ে এসে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চাইলেন। বেলা ১টা থেকে ২টা নাগাদ মান্দারতলার পজিশন সম্পূর্ণ ছেড়ে এসে বারোবাজারে শত্রুর আর্টিলারি শেলের গোলাগুলির ভেতরই পজিশন নেয়ার চেষ্টা চললো। বেলা ৩টা নাগাদ একটি সশস্ত্র প্লাটুন নিয়ে ক্যাপ্টেন আজম নিজে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। পথে বিশখালী ব্রিজ উড়ানো ছিল বলে আসতে তার দেরি হলো। কালিগঞ্জে আমাকে থানা হেডকোয়ার্টারে ও টেলিফোনে থাকার নির্দেশ দিয়ে শত্রুর আর্টিলারি শেলের বৃষ্টির মাঝেই তিনি এগিয়ে চললেন। শত্রু এরই মধ্যে বারোবাজার পৌঁছে গেছে। বারোবাজারে পৌঁছেই আজম শত্রুর মেশিনগানের মুখে ট্রাকসুদ্ধ পড়ে গিয়েও অলৌকিকভাবে বেঁচে গেলেন। সুবেদার

ফিরোজ প্রতিরোধের শেষ চেষ্টা করে ক্যাপ্টেন আজমের ট্রাকে উঠে কালিগঞ্জ এলেন। আজম আমাকে প্রতিরোধের চেষ্টা ত্যাগ করে তার সঙ্গে চলে আসার আহ্বান জানালেন। আজমের মারফত সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। আমার যাওয়া হবে না বলে জানিয়ে দিলাম। বললাম, ভাগ্যের খেলার শেষ পরিণতি আমাকে দেখতে দাও। অগত্যা আজম প্লাটুন নিয়ে ঝিনেদা ফিরে গেলেন।

ঝিনেদা পৌঁছেই ক্যাপ্টেন আজম মাহবুবের সঙ্গে যোগাযোগ করে অবাধ্য প্রফেসরকে ফিরিয়ে আনার আবেদন জানালেন। মাহবুব রেগে গিয়ে আমাকে ফেলে আসার জন্য আজম ও ফিরোজের প্রতি ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফেটে পড়লেন। টেলিফোন তুলেই মাহবুব প্রথমে চুয়াডাঙ্গায় মেজর ওসমানের সঙ্গে কথা বললেন। এবার আমাকে অবাধ্যতার পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে কালিগঞ্জ ছেড়ে ঝিনেদা চলে আসার তাৎক্ষণিক নির্দেশ দিলেন। দু'জনের মধ্যে এবার আক্রোশের বাকযুদ্ধ টেলিফোনে শুরু হলো। আমার সাফ জবাব, ছিন্নবিচ্ছিন্ন কোম্পানির ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত না হয়ে কালিগঞ্জ ছাড়ছিনে। মানুষের নেতৃত্বের আমানতের বিশ্বাসের মূলে কোম্পানির সবাইকে ফেলে পালিয়ে গিয়ে পোড়ামুখ কাউকে দেখাতে চাইনে। পরাজয়ে দুঃখ নেই। বিপদের মুখে সৈনিকদের নেতৃত্বশূন্য করে কাপুরুষের মতো পালানো ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বন্ধুদের কাছে শেষ বিদায় চেয়ে নিলাম। এবার সফিক উল্লাহ তোমাদের কাছে মৃত। মাহবুব নরমে-গরমে আমাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় বিফল হয়ে আবার মেজর ওসমানের স্মরণ নিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিম রণাঙ্গনের অধিনায়ক মেজর ওসমানের ফিরে আসার সুস্পষ্ট নির্দেশও সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলাম। ক্রুদ্ধ আক্রোশে মাহবুব বারবার ফেটে পড়ছিল। একাধিকবার ধড়াম করে তিনি টেলিফোন রেখে দিচ্ছিলেন। অগত্যা তিনি আমাকে শাসিয়ে শেষবারের মতো মেজর ওসমানের স্মরণ নিলেন। ওসমান মাহবুবের মারফত জানতে চাইলেন প্রফেসর আদতে পাগল কিনা; যদি তা না হয় তবে তার নিজস্ব কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা, তা যত তুচ্ছ, অবাস্তব বা অসম্ভবই হোক না কেন।

মাহবুব এবার সুর পাল্টিয়ে আমার নিজস্ব পরিকল্পনা জানতে চাইলেন। বেলা তখন চারটার বেশি বাজে। সন্ধ্যা হতে বেশি বাকি নেই। পাকিস্তান আর্মি আজ মার কম খায় নাই। এতসবের পর তারা প্রয়োজনীয় রেকি, রিপ্লেসমেন্ট, সাপ্লাই প্রভৃতি স্থির না করে দিনের অবশিষ্টাংশ ও রাতের মধ্যে এডভান্স করবে না বলে আমার স্থির বিশ্বাসের কথা জানিয়ে দিলাম। দু'টি প্লাটুন এখনো অক্ষত আছে। সুবেদার মজিদ মোল্লা ও মুকিতের প্লাটুন দু'টিকে উইথড্র করে আনার কথা বললাম। এখানে তিষ্টানো যাবে না জেনেও এ মরণফাঁদে অবস্থানের দু'টি সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করলাম (১) বিচ্ছিন্ন কোম্পানিটাকে একত্র করে দুলাল মুন্দিয়ায় প্রতিরোধের চেষ্টা নেয়া, (২) শত্রুকে স্ক্রিনিংয়ের মতো সামনে ব্যস্ত রেখে মাগুরা, কুষ্টিয়া, ঝিনেদা, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুরে যুদ্ধের উপকরণ অস্ত্র, গোলাবারুদ, পিওএল যোদ্ধাদের নিরাপত্তা, ব্যাংকের টাকা-পয়সা নিরাপদ দূরত্বে স্থানান্তরজনিত সুযোগ করে দেয়া। মেজর ওসমানের কাছে সাহায্যের আকুল আবেদন শেষবারের মতো পেশ করলাম। ওসমান উদ্বিগ্ন না হয়ে

স্থিরচিত্তে কাজ করার ও অস্থিরতা পরিহারের নির্দেশ দিলেন। তিনি তার তাৎক্ষণিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। সাহায্যের ধরণ ও প্রকৃতির বাস্তব চিত্র শিগগিরই জানানো হবে বলে বলা হলো।

রাত ৯টায় চুয়াডাঙ্গা থেকে কালিগঞ্জ অভিমুখে সাহায্যের একটি কোম্পানি রওনা হয়ে গেছে বলে জানানো হলো। এবার ভাবনামুক্ত হয়ে পরিকল্পনায় লাগলাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। সব হারিয়ে ঠুঁটো জগন্নাথ কালিগঞ্জ থানায় বসে আছি। যশোর ক্যান্টনমেন্ট থেকে কালিগঞ্জ পর্যন্ত রাস্তা খোলা। যে কোনো সময় শত্রুর হাতে ধরা পড়তে পারি। থানায় মাত্র দু'জন পুলিশের কনস্টেবল আছে। অস্ত্রের মধ্যে সঙ্গের রাইফেলই আছে। সবার জন্য খাবার পাক করিয়ে কালিগঞ্জে রেখেছি। খাবে কে? হায় দুর্ভাগ্য। কোম্পানির কেউ বেঁচে থেকে ফিরে এলে তো? আমার থানায় অবস্থানের ফলে বাজারের সিভিলিয়ানদের অনেকে রয়ে গেলেন। স্থানীয় কলেজের এক তরুণ ছাত্র আজব ধরনের একটা ছোট্ট ব্যাটন হাতে ঘুরতে ঘুরতে থানায় এলেন। এ কথা সে কথার পর তিনি তার হাতের ব্যাটনটা সম্পর্কে আমার ধারণা জানতে চাইলেন। আমি স্বাভাবিকভাবেই ব্যাটন ব্যাটনই বা আমার অজ্ঞতার কথা বললাম। তিনি তা খুলে দেখালেন। ভেতরে একটা অদ্ভুত ধরনের রাশিয়ান ড্যাগার। তিনি কেন যেন নিজের পরিচয় দিতে ইতস্তত করছিলেন। শুধু বললেন, আওয়ামী লীগের বাইরে ভিন্নতর রাজনৈতিক আদর্শে তারা দীক্ষিত। বর্তমান সংক্ষিপ্ত পরিচয় নকশাল বলে। আমি সোজাসুজি তার উদ্দেশ্য কী জানতে চাইলাম। তার অকপট জবাব, অস্ত্র সংগ্রহই তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি রাইফেলের পাশে এসে বসলেন। বাইরে দূরে যেন অন্য কয়েকজনের আনাগোনা রাতের আঁধারেই টের পেলাম। শ্রেণীশত্রু খতমের জন্য তাদের অস্ত্র চাই। অস্ত্র সংগ্রহের এই হলো মাহেন্দ্রক্ষণ ও মোক্ষম সময়। শুধু জিজ্ঞেস করলাম, স্বাধীন বাংলা তাদের তাদের কাম্য কিনা। স্বাধীনতার প্রশ্নে একমত হলেও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, এ স্বাধীনতায় শোষিত মানুষের মুক্তি আসবে না। রাজনৈতিক ইজমের নীতিকথার আদর্শ প্রচারের মন-মেজাজ বা সময় কোনোটাই আমার ছিল না। অনেকক্ষণ ধ্যানমগ্ন হয়ে যেন সম্বিৎ হারিয়ে ফেললাম। সুপ্তি কাটিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। বিগত কয়েকদিনের পরিশ্রম, অনিদ্রা ও উদ্বেগে ঘুমঘুম ভাব আসছে। তাকে শুধু বললাম, 'তবে বসে আছেন কেন? অস্ত্র নিয়ে চলে যান। এখানে তো আমি একা, বিভীষণদের সঙ্গে লড়া আমার কর্ম নয়। তবে আপনাদের প্রতি শেষ অনুরোধ, যাওয়ার আগে শত্রুর হাতে ধরা পড়ার পূর্বমুহূর্তে বা শেষমুহূর্তে আমাকে হত্যা করে যাবেন।'

এ নাটকীয় মুহূর্তে থানার পুলিশটা কী মনে করে যেন অস্ত্র নিয়ে পাশের রুমে বসল। অপ্রত্যাশিতভাবে রণক্ষেত্র থেকে শ্রান্ত এক ইপিআর সৈনিক অস্ত্রসুদ্ধ সামনে এলেন। অবাক বিস্ময়ে, 'স্যার' বলে স্যালুট করে ক্লান্তিতে তিনি বসে পড়লেন। তার পেটে ভীষণ বেদনা। তাকে লঙ্গরে যেতে বলতে তিনি বিশ্রাম চাইলেন। পাশের রুমে তাকে বিশ্রাম নিতে বললাম। ১১টা নাগাদ ইপিআরের দ্বিতীয় সিপাই অস্ত্রসহ এসে ক্যাপ্টেনের খোঁজ নিলেন। ক্লান্ত হলেও তিনি কর্মক্ষম ছিলেন। তাকে লঙ্গরে গিয়ে খেতে বলতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন আমি খেয়েছি কিনা। আমার নিরুত্তরে তিনি

চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। 'আপনারা বোঝেন তো সবই, চাচা আপন প্রাণ বাঁচার পথে না গিয়ে এ দুর্ভাগ্য প্রফেসরের কাছে কেন মরতে এসেছেন।' বলতে না বলতেই রুদ্ধ আবেগে কণ্ঠ আমার ভারী হয়ে এলো। নিজের অজান্তে আনন্দাশ্রু নীরবে গড়িয়ে পড়লো। সৈনিককে যেখানে খুশি চলে যেতে বললাম। তাদের প্রটেকশন দেয়ার শক্তি-সামর্থ্য এখন আমার নেই। সরল সৈনিক সোজাসুজি জানতে চাইল, আমি যাব কিনা। বিরক্তির সঙ্গে তাকে বললাম, 'বাবা, আমাকে শান্তিতে মরতে দাও, নিজের পথ দেখ'। 'কছম খোদার' বলে সৈনিক চিৎকার করে উঠল। 'আপনাকে ফেলে কোথাও যাচ্ছি না' বলে রাইফেল নিয়ে আমার রুমের সামনে সেন্ট্রির পাহারায় লেগে গেল। পাশের রুম থেকে পুলিশ ও ক্লান্ত ইপিআর চিৎকার শুনে বেরিয়ে এসে ব্যাপার কি দেখতে চাইল।

নকশালদের চালে ভুল হলো কী বিলম্ব হলো, না স্বদেশ প্রেম জাগল, বুঝলাম না। তারা শুধু বললেন, 'স্যার, আমাদের উদ্দেশ্য যা-ই থাক, কিন্তু আজ আপনি এখানে কেন? অনেককে তো দেখলাম, তারা আজ কোথায়? জানি ভবিষ্যতে আমরাই আপনাদের শত্রু হবো, আমাদের আপনারা ভুলে যাবেন। যদি বিশ্বাস করেন আমাদের কাজে লাগাতে পারেন। আমাদের দ্বারা আপনার উপকার ছাড়া কোনো অপকার হবে না।' আমি তাদের বললাম, 'ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দরদ বা বিশ্বাসের দাম নেই। বাংলাদেশকে যদি ভালোবেসে থাকেন, স্বাধীনতা যদি কাম্য হয়ে থাকে আমার পাশে এসে দাঁড়ান'। তারা আমার প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের শপথ নিয়ে আদেশের প্রতীক্ষায় রইলেন।

লোক পরম্পরায় দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়া সৈনিকদের কাছে আমার কালিগঞ্জ থানায় অবস্থানের সংবাদ পৌঁছে গিয়েছিল। প্রথমে কথাটা অনেকেরই বিশ্বাস হয়নি। খবরের সত্যতা যাচাই করে, সন্দেহমুক্ত হয়ে দু'একজন করে সশস্ত্র সৈনিক কালিগঞ্জে আসতে আরম্ভ করল। আমি তাদের গরম আহার ও চা পানের ব্যবস্থা করে বিশ্রাম নিতে বললাম।

রাজনৈতিক কর্মীরা ও স্থানীয় জনগণ সব বিপদ-আপদ তুচ্ছ করে সৈনিকদের আশ্রয়, শুশ্রূষা, আহারের ব্যবস্থা করলেন। পারম্পরিক যোগাযোগের কাজটা তারা বিশ্বস্ততার সঙ্গে করেছিলেন। নকশালদের মাধ্যমে সুবেদার মুকিত ও মজিদ মোল্লাকে যে কোনো মূল্যে রাতের মধ্যে বা ভোরের মধ্যে প্লাটুনসহ কালিগঞ্জে আমার সঙ্গে যোগ দেয়ার জরুরি নির্দেশ পাঠালাম। আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনৈতিক কর্মীদের যে কোনো মূল্যে ও প্রচার মাধ্যমে মাগুরা, কুষ্টিয়া, ঝিনেদা, চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরের দিকে কালিগঞ্জের সশস্ত্র প্রতিরোধ শরিক হওয়ার আকুল আবেদন পৌঁছে দিতে বললাম। নকশাল ও রাজনৈতিক কর্মীরা অত্যন্ত বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

রাত দুটো থেকে তিনটা অতিক্রান্ত হয়ে গেল, ঝিনেদা থেকে মাহবুব বারবার বলছেন, চুয়াডাঙ্গার কোম্পানি যাত্রা করেছে, এখনই পৌঁছে যাবে। আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে কেমন যেন লাগলো। চুয়াডাঙ্গা থেকে গাড়িতে করে কালিগঞ্জ পৌঁছতে এতক্ষণ লাগতে পারে না—রাস্তা যত খারাপই থাক। মাহবুব বারবার বলছেন, কোম্পানি এখনই পৌঁছে যাবে। আমি সব সংশয়ের অবসান করে

জিপ নিয়ে পাকা রাস্তা ধরে বিশখালীর উড়ানো ব্রিজ পর্যন্ত এলাম। জিপ থেকে নেমে একা একাই খালের অপর পারে এলাম। সব চুপচাপ, কেউ কোথাও নেই। সামনে এগিয়ে কী মনে করে স্টেনের টিগারে হাত দিয়ে রাগে চিৎকার করে বললাম, 'দিলাম ছেড়ে, কে কোথায় আছিস কথা ক!' নিকট দূরত্বে আলো-আঁধারিতে অস্ত্র সংবরণের ত্বড়িত আবেদন জানিয়ে একজন দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি ধীরকণ্ঠে ক্যাপ্টেন খোন্দকার নাজমুল হুদা বলে নিজ পরিচয় দিলেন। রাগে ফেটে পড়ে তার ওপর একহাত নিলাম। 'হুদাই আপনার নাম হুদা, এই আপনার আমাকে সাহায্য? কোথায় কালিগঞ্জ আর কোথায় বিশখালী? কাপুরুষ কোথাকার।' নাজমুল হুদা স্মিত হেসে বললেন, একমাত্র স্টেন নিয়ে একাই তো একটা কোম্পানিকে সারেন্ডার করালে, আর কী চাই? তোমার সঙ্গে আমার সবেমাত্র পরিচয়, অধৈর্য হয়ো না, শান্ত হও। এটা একটা সদ্য জোড়াতালির মোজাহেদ-আনসার কোম্পানি। শত্রুর এক বার্স্টের পর এরা যে কতটুকু তিষ্টাবে তাতে আমার সন্দেহ আছে। তাই এ টেকনিক্যাল অবস্থান।'

লাখো শুকরিয়া আল্লাহ তোমার দরবারে। সন্ধ্যায় যার কিছুই ছিল না, রাতের মধ্যেই তার প্রতি তোমার অপার অনুগ্রহ। একটা কোম্পানির সাহায্য আমার সব ক্লান্তি দূর করে শক্তি-সাহস বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।

কালিগঞ্জ ফিরে এলাম। ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের ড্রাইভার অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক শ্রান্ত -ক্লান্ত হালিমকে অস্ত্রসহ পেলাম। তিনি হতাশায় ভেঙে পড়লেন। তাকে লঙ্গরে খেয়ে বিশ্রাম নিতে বললাম। হতাশ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'স্যার, মারেন-কাটেন যা-ই করেন আর পারি না'। পাশের রেলস্টেশন থেকে এক হাবিলদার খবর পাঠালেন, 'স্যারের নির্দেশ পেলে তিনি আসতে পারেন'। অস্ত্র, গোলাবারুদ, ক্লান্ত সাথীদের সঙ্গে আনার জন্য তিনি ট্রান্সপোর্ট চেয়ে পাঠালেন। আসার অনুমতি পেয়ে ট্রান্সপোর্টের অপেক্ষা না করে নিজের থেকেই ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করে সবকিছু নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে মিলিত হলেন।

চতুর্দিকের থানাগুলোকে ওয়ারলেস, টেলিফোন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে প্রাক্তন আর্মির লোকজনকে কালিগঞ্জ যাত্রার জরুরি নির্দেশ পাঠান ঝিনেদার এসডিপিও মাহবুব উদ্দিন আহমদ। রাজনৈতিক কর্মীরা পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকায় কালিগঞ্জের শত্রু প্রতিরোধের সংবাদ রাতের মধ্যে পৌঁছে দিয়ে কী করে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা রিটায়ার্ড, ছুটিতে আসা আর্মি ও অন্য লোকজনকে সশস্ত্র নিয়ে এলেন তা আমার কাছে এক পরম বিস্ময়। কিছুসংখ্যক আন্ডারগ্রাউন্ড সশস্ত্র ব্যক্তিও আমার সঙ্গে যোগ দিলেন। উষার আলো-আঁধারির মাঝেই দূর-দূরান্ত থেকে সদ্য প্রত্যাগত প্রায় দু'প্লাটুনের মতো যোদ্ধা পেয়ে গেলাম। তারা একজন-দু'জন করে এসে ক্রমেই আমার শক্তি বৃদ্ধি করছিলেন। তারা আমার কাছে ডিফেনসিভ পজিশনের দিক নির্দেশ চাইলেন। তাদের গরম চা-বিস্কুট দিতে অনেকে বিরক্তির সঙ্গে তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'এখনই খাবার জন্য তো এখানে আসিনি'। তাদের দুলাল মুন্দিয়া বাজারে পাকা সড়কের পূর্ব-পশ্চিমে যে কাঁচা রাস্তা গেছে তার বরাবর ডিফেন্স নিতে বললাম।

এখানে সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো খোঁড়াখুঁড়ির খন্তা-কোদাল-গেন্তি-বেলচার। সবাই অস্ত্র নিয়ে এলেও কেউ ডিগিং টুলস নিয়ে আসেননি। স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরাও

বিশেষ সাহায্য করতে পারলেন না। কারণ ঘুমন্ত গ্রাম থেকে শেষ রাতে খন্তা-কোদাল জোগাড় তত সহজ ছিল না। রাস্তার পাশের অনেকে পরিবার-পরিজন দূরে সরিয়ে ফেলায় অনেক ঘরবাড়ি খালি পড়ে ছিল। ফলে সেখানে খোঁজ করেও বিশেষ কিছু পাওয়া গেলো না। ফলে উঁচু রাস্তার পাশের আড়, খেজুর ও অন্যান্য গাছের গোড়া, মাটির ঘর জাতীয় কভারই হলো আমাদের পজিশন। সূর্যোদয়ের রক্তিম আভার সঙ্গে যোদ্ধাদের তেজোদীপ্ত নির্ভীক চেহারা দেখলাম। তারা সবাই তাদেও সেরিমনিয়াল পোশাক, মেডেল, পদক ও রিবনে সজ্জিত ছিলেন। বেল্ট, ব্যাজ, পদক ঘষামাজা, চকচক করছিল। তাদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বললেন, 'স্যার, তাদের যে এতক্ষণ ঠেকিয়ে রেখেছেন এই যথেষ্ট। বাকিটা আমাদের হাতে ছেড়ে দিন'। সবাই আগে বাড়িয়ে উষ্ণ করমর্দনের মাধ্যমে গর্বভরে নিজেদের পরিচয় দিলেন। সকালের দিকে অনেকে আনন্দের আতিশয্যে দুলাল মুন্দিয়ায় তাদের পজিশন দেখাতে নিয়ে গেলেন। এমন দুর্যোগপূর্ণ সংকটের মাঝে গর্ব ও আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। বাংলাদেশে আমার চেয়েও বড় অনেক বেয়াকুব আছে। না হয় মৃত্যুর মুখে এমন বন্ধুদের পেলাম কী করে? জীবনের মহোত্তম স্মৃতিগুলোর মাঝে দুলাল মুন্দিয়ার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সকাল ৭টার দিকে মোটরসাইকেলে গ্রামের ঘুরপথে সুবেদার মজিদ মোল্লা একা এলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে ও অবস্থার মূল্যায়ন করতে। তাকে অকথ্য গালাগালে প্লাটুন নিয়ে না আসার জন্য চার্জ করলাম। অনুগত সৈনিকের মতো মজিদ মোল্লা নীরব রইলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে চা পানের আবেদনে সাড়া না দিয়ে, 'মাফ করবেন' বলে দ্রুতগতি মোটরসাইকেলের পেডেলে পা বাড়ালেন প্লাটুন নিয়ে আসার জন্য।

সকাল সাড়ে ৯টার দিকে তারা নয় ইঞ্চি পরিমাণ মাটি খুঁড়তে না খুঁড়তে শত্রুর দূরপাল্লার কামানের গোলার ব্যাপক বর্ষণ আমাদের ওপর শুরু হলো। এক সঙ্গে চার থেকে আটটা গোলা আমাদের পজিশন ও তার পেছনে পড়তে শুরু করলো। আর্টিলারির ছত্রছায়ায় শত্রুর অগ্রাভিযান শুরু হলো। নিজপক্ষের অনেক হতাহতের পরও দুলাল মুন্দিয়ার পজিশন থেকে আমাদের বিচ্যুত করা গেলো না। দুলাল মুন্দিয়া বাজারের চারপাশে দু'দলের তুমুল লড়াই শুরু হলো। ব্যাপক গোলাগুলির মাঝে শত্রুর অগ্রাভিযান প্রতিহত হলো। শত্রুর সম্মুখ সমরের গোলাগুলি যেন কিছুটা স্তিমিত হয়ে এলো; কিন্তু আর্টিলারির গোলাবর্ষণ প্রবলভাবে চলতে থাকলো। শত্রুর দূরপাল্লার কামানের আওতা আমাদের পজিশনের অনেক পেছনে সরে গেলো। আর্টিলারির গোলার স্ক্রিনিংয়ের কভারে শত্রুরা অনেকদূর পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ঘুরে পেছন থেকে পাকা রাস্তার বামে আমাদের পজিশনের পূর্ব অংশকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেললো। এখানে প্রবল গোলাগুলি ও হাতাহাতি লড়াইয়ের মধ্যে এমুনিশনশূন্য কোম্পানিকে এক অভাবনীয় দুর্বিপাকে পড়তে হলো। পেছনে আর্টিলারির গোলাবর্ষণ ও অন্যান্য অসুবিধার কারণে তাদের কাছে কোনো গোলাগুলি বা লোকজনের সাহায্যই পাঠাতে পারলাম না। রাস্তার পশ্চিমে ডানপাশ থেকে মুকিতও তাদের কোনো সাহায্য করতে পারলেন না। শত্রুর সারেন্ডারের আবেদন সবাই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে আমৃত্যু লড়ে গেলেন। জয়

বাংলার সগর্জন ওয়ার-ক্রাই তুলে তারা মরণযজ্ঞে আহুতি দিলেন। শত্রুরা আল্লাহু আকবর, ইয়া আলী-হায়াদরী হাঁক ছেড়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনিতে চতুর্দিকে মুখরিত করে ইতিহাসের নজিরবিহীন ঘৃণ্য-জঘন্য পদ্ধতিতে বেয়নেট মেরে, বিকলাঙ্গ করে সবাইকে হত্যা করল। আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মীরা পার্মানেন্ট আন্ডারগ্রাউন্ডে শ্রেণীবিহীন সমাজে শান্তির ঘুম দিল।

বেলা ২টার দিকে দুলাল মুন্দিয়ার পূর্ব অংশের লড়াই শেষ হয়। পশ্চিমে মুকিত বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছেন। পেছনে কালিগঞ্জ থেকে দুলাল মুন্দিয়ার দিকে দক্ষিণ-পূর্ব বরাবর কিছু বিক্ষিপ্ত গোলাগুলি ছুড়ে শত্রুর ওয়াকওভারের রাস্তা প্রতিহত করা হলো। মুকিত উইথড্রলের অনুমতি চাইতে তাকে শেষ নির্দেশের অপেক্ষায় থাকতে বলা হলো।

এবার কালিগঞ্জের ওপর কামানের গোলার বর্ষণ তীব্রতর হলো। থানার চারপাশে শেল পড়া আরম্ভ হলো। থানায় আমার বসার ঘরের টেবিল-চেয়ারসুদ্ধ শেলের শব্দে থরথর করে কেঁপে নড়ে-চড়ে উঠছে, দরজা-জানালা ভীষণভাবে আলোড়িত হচ্ছে। শেল আমার চারপাশে পড়ে মাটি বিদীর্ণ হচ্ছে। অবাক কাণ্ড, আল্লাহর অপার মহিমা শেলগুলো শূন্য মাঠে, নালায়-ডোবায় বা জংলা স্থানে পড়ছে। একটা শেলও কোনো ঘর বা বিল্ডিংকে সরাসরি আঘাত করল না। থানার মাঠে, টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সামনের সামান্য খালি জায়গায় শেল পড়ে মাটি বিদীর্ণ হলো। কিন্তু কোনো ঘরে আঘাত করে আগুন জ্বললো না। কয়েক স্থানে শক্ত মাটিতে শেল ফেটে আগুন জ্বলে ঊর্ধ্বে আগুনের শিখা ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠলো; কিন্তু কোনো ঘরে আগুন লাগলো না বা কেউ মরলো না।

চারপাশে যারা আছেন তাদের মুখে চরম হতাশা। নকশাল তৎপরতা সন্দেহজনক। ঝিনেদাকে টেলিফোনে বললাম, 'কি শুনতে পাচ্ছো?' তারা বললেন, 'টেলিফোনে কেবল শেল ফাটার ভীষণ গর্জনের শব্দ পাচ্ছি।' ক্যাপ্টেন আজমকে বললাম, 'আমার চারপাশে শেলের অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। আসতে পারবো কিনা জানি না। কিছুক্ষণ পরেই আমি কালিগঞ্জ ছাড়ছি, আপনারা সব গুছিয়ে নিন'। তার মাধ্যমে মেজর ওসমানকে পরিস্থিতি জানাতে বললাম। মেজর ওসমান উইথড্র করে আমাকে চুয়াডাঙ্গা পৌছার নির্দেশ দিলেন। এমন সময় ঝিনেদার এক্সচেঞ্জের শব্দ অস্পষ্ট ও দুর্বল হয়ে এলো। বহুকষ্টে এক্সচেঞ্জকে কারণ জিজ্ঞাসা করতে ব্যাটারি নেই বা ডাউন বলে জানালেন। তাকে ব্যাটারির অসুবিধার আর সময় না পাওয়ার জন্য তিরস্কার করে যে কোনো মূল্যে কিছুক্ষণের জন্য হলেও লাইন চালু রাখার আবেদন জানালাম। সাইফুল সোবহান নামে এক সৌখিন স্বেচ্ছাসেবক ছাত্র-অপারেটরের কারণে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কালিগঞ্জ এক্সচেঞ্জ চালু ছিল।

শেষবারের মতো বের হয়ে লঙ্গরের লোকজনের কাছে হাত মিলিয়ে তাদের বিদায় দিলাম। ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার মাজেদুল হককে ২টা ট্রাক নিয়ে মূল পাকা সড়কে কালিগঞ্জ-চুয়াডাঙ্গা রোডের সংযোগকারী কাঁচা রাস্তার মোড়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবস্থানের সতর্ক নির্দেশ দিলাম।

কারণ শেষ মুহূর্তেও আহত, নিহত, বেঁচে থাকা কেউ তাদের শ্রদ্ধা, আস্থা, বিশ্বাস, ভালোবাসা ও আদরের হতভাগ্য অধ্যাপকের খোঁজে এলে তাকে যেন উদ্ধার করে সাধুহাটির পথে চুয়াডাঙ্গা নিয়ে যাওয়া যায়। কালিগঞ্জের যে কোনো নারী, শিশু, যুবক-বৃদ্ধকে দলমত নির্বিশেষে উদ্ধার করে যেন ট্রাকে ওঠানো হয়। শেলের গোলাবৃষ্টির মাঝে সব বিপদ তুচ্ছ করে মাজেদুল হক ট্রাক দুটি সংগ্রহ করে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। অতিরিক্ত গোলাবারুদ, যা সঙ্গে নেয়া যাবে না, সেগুলো গভীর পানিতে ফেলে দেয়ার ও জঙ্গলে মাটির নিচে পুঁতে ফেলার ত্বড়িত নির্দেশ দিলাম। এসবের অধিকাংশই সে সময় ও পরবর্তীকালে নকশালদের হাতে পড়েছিল।

শেষবারের মতো ঝিনেদার সঙ্গে কথা বলার জন্য টেলিফোন ওঠাতে ঝিনেদার দারোগা সাইদ আমার জন্য উর্ধ্বতন জরুরি নির্দেশ শোনালেন, মুকিতের সঙ্গে মিলে আমাকে পশ্চিমে সাধুহাটির পথে চুয়াডাঙ্গা পৌছতে। মুকিতকে নির্দেশ দিলাম উইথড্র করে মজিদ মোল্লাসহ পশ্চিমে সাধুহাটির দিকে ফিরে যেতে। এক্সচেঞ্জ থেকে সাইফুল সোবহান বারবার বলেছেন, 'স্যার, এক্সচেঞ্জের চারদিকে শেল পড়ছে। যে কোনো সময় এক্সচেঞ্জে আগুন ধরে যেতে পারে'।

তাকে শেষবারের মতো ঝিনেদা ওয়াপদার কন্ট্রোল হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে মেলাতে বললাম। ওপাশে কে শুনছে তার তোয়াক্কা না করেই বললাম, 'এখনই টেলিফোন কানেকশন বিচ্ছিন্ন করে আমি কালিগঞ্জ ছেড়ে যাচ্ছি।' সাইফুল সোবহানকে 'বিদায় পুত্র' বলে টেলিফোনের কানেকশন ছিঁড়ে ফেললাম।

জিপে উঠতে গিয়ে দেখি গাড়িতে রাখা এলএমজিটি নেই। পেছন দিকে বাজারের চিপা গলির পথে রিটায়ার্ড আর্মি মাওলা মিয়ার সন্তান সেটি নিয়ে পালাচ্ছে। তাকে ডাকতে তিনি এলএমজিসহ ফিরে এলেন। নির্দেশ দিতে সুবোধ বালকের মতো অস্ত্রসহ নকশালজি জিপের পেছনে বসলেন।

বিভীষণপুরী ছাড়ার জন্য জিপে উঠে পাকা সড়কে এসে দেখি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হাবিলদার মাজেদুল হক দুটি ট্রাকসহ রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছেন। এ সময় মূল পাকা সড়ক বরাবর রাস্তার ওপর ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে শেল পড়ছে। এরই মধ্যে কয়েকজনকে মাজেদ ট্রাকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তাকে পশ্চিমের কাঁচা রাস্তায় গাড়ি ছাড়তে বললাম। ড্রাইভারকে জিপের গতি বাড়াতে বলতে দেখি মাজেদ নিশ্চুপ অনড় অবাক দাঁড়িয়ে আছে। ঠোঁট নেড়ে বিশুষ্ক গলায় তিনি বললেন, 'স্যার আপনি একা গাড়িসহ শেলের ভেতর, উত্তরে যাবেন না, আমার সঙ্গে আসুন'। নকশালি কারবারে বিশ্বাসঘাতকতার আসল চেহারা দেখে মন-মেজাজ ভালো ছিল না। ক্যাপ্টেন হুদা না আবার আমারই মতো নকশালি কায়দার শিকার হন। তাই তাকে সতর্ক করার জন্য শেলের ভেতরই বিশখালী যাওয়া স্থির করলাম। বিশখালীর সঙ্গে টেলিফোন যোগাযোগ না থাকায় ক্যাপ্টেন হুদাকে সর্বশেষ অবস্থা জানিয়ে ওয়ার্নিং দিয়ে যাওয়া পবিত্র কর্তব্য মনে করলাম। শেষ মুহূর্তেও দেখি মাজেদুল হক দাঁড়িয়ে আছে। সে বারবার আমার দিকে চেয়ে এগিয়ে আসতে চায়। অধৈর্য হয়ে ক্রুদ্ধ আক্রোশে তাকে গালি দিলাম, 'হারামজাদা যা কই কর, আমার ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না'।

বিশখালীর পথে ক্যাপ্টেন হুদার জন্য মেসেজ রেখে ঝিনেদা এলাম। শহরের কাছে ঝিনেদা ক্যাডেট কলেজের কুষ্টিয়া রোডের মোড়ে এসে গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এলো। কারণ জানতে চাইলে ড্রাইভার দেখি ক্যাডেট কলেজের রাস্তার দিকে চেয়ে আমার দিকে চায়। ড্রাইভারের বুঝতে বাকি রইল না। ক্যাডেট কলেজে যাব কিনা তাই সে জানতে চাইল। আমার প্রিয়তমা স্ত্রী পারভিন বেগম তিনটি নাবালক এতিম পোষ্যসহ আমার জন্য প্রহর গুনছেন। ভাবনা জাগল মনে, মালপত্তর পরিজনসুদ্ধ সবকিছু নিয়ে জিপে-ট্রাকে যাওয়া এখনো আমার পক্ষে খুবই সহজ। সঙ্গের যোদ্ধাদের কেউ সামনে এসে যদি বলে, 'স্যার, আপনি তো সব নিয়ে কেটে পড়ছেন, আমাদের কী করলেন?' সারা বাংলাদেশের মানুষের যে গতি আমার পরিজনেরও সে গতি। তাদের আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়ে দু'মাইল ব্যবধানে প্রিয় স্ত্রীর মুখ দেখার বাসনা ত্যাগ করে, তার জন্য কোনো নির্দেশ বা ব্যবস্থা না রেখেই প্রস্থানের উদ্যোগ নিলাম।

আমার প্রিয় ঝিনেদা ছেড়ে যাচ্ছি। কত চেনা মুখ, কত স্মৃতি, বুকটা ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে। যে মুখ জয়ধ্বনি দিয়ে আমাকে বরণ করতো তারা আজ বিবর্ণ, ফ্যাকাশে, উদ্বেগে আকুল হতাশায় আমাকে দেখছে। ঝিনেদার শেষ দর্শন ওয়াপদার কন্ট্রোল হেডকোয়ার্টার। বানরের বাচ্চা পেটের নিচে থেকে বানরকে জড়িয়ে ধরে থাকে, আর বানর যেমন তাকে নিয়ে গাছ থেকে গাছে লাফায়, ক্যাঙ্গারু পেটের থলিতে বাচ্চা রেখে লেজের ওপর যেভাবে লাফায়, তেমনি দুর্গম পথে গোলাগুলির মাঝে সময়-অসময়ে ফ্রন্টলাইনে নিজের মোটরসাইকেলে করে আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত যে দানেশ, সে আজ নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ইউসুফ, আনিস, দানেশ, মানেশ ভাইদের গাড়ি চালনা, মেরামত ও দৌত্যকার্যে যুদ্ধে তাদের অবিস্মরণীয় অবদানের কথা স্মরণ করে গাড়ির গতি মন্থর করতেই দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরে, 'স্যার বেঁচে আছেন' বলে শিশুর মতো কেঁদে ফেললো। অতি দ্রুত চলে যাওয়ার জন্য তারা আবেদন জানালেন। মাহবুব ও আজম পূর্বেই চলে গিয়েছিলেন।

আমি ঝড়োগতিতে চুয়াডাঙ্গার দিকে গাড়ি চালাতে নির্দেশ দিলাম। আলবিদা ঝিনেদা, আলবিদা ...।

উর্ধ্বতন কমান্ডের দ্বিধাদ্বন্দ্বের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নই ব্যর্থতা কারণ। শত্রুর একটি কোম্পানি প্লাস নির্মূল। নিজের এক প্লাটুন নিশ্চিহ্ন। শত্রুর অগ্রাভিযান বিলম্ব করানোর মাধ্যমে যোদ্ধা, যুদ্ধের উপকরণ, টাকা-পয়সার নিরাপদ স্থানান্তরে সাহায্য হলো। নিজ পক্ষের কেউ ধরা পড়েনি। কোনো শত্রুকে বন্দি করা যায়নি। সমুদয় ট্রান্সপোর্ট সরিয়ে আনা হয়েছিল। জনসমর্থন পূর্ণাঙ্গ পাওয়া গেছে। শত্রুকে মুক্তিদের যুদ্ধ ক্ষমতার পরিচয় দেয়া গেছে। শত্রুর বিষদাঁত ভাঙা গেছে। ব্যাটল ইনোকুলেশনের মাধ্যমে নিজেদের যুদ্ধ ক্ষমতার ওপর আস্থা বেড়েছে। নিজেদের পরাজয় স্বীকারের মাধ্যমে ভবিষ্যতের দৃঢ়তা ও প্রস্তুতি অর্জিত হয়েছে।

১৬ এপ্রিল ঝিনেদার প্রতিরোধ যুদ্ধের অবসান হলো। কোনো পর্যায়েই শত্রুরা ঝিনেদার বেসামরিক প্রশাসন চালু করতে পারেনি। প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থারূপে শত্রু ঝিনেদার একুশশ' বেসামরিক লোককে হত্যা করে। একজন মুক্তিযোদ্ধা ঝিনেদা

ক্যাডেট কলেজের প্রিন্সিপাল লে. কর্নেল মোহাম্মদ মনজুরুর রহমান ১৮ এপ্রিল কলেজ ক্যাম্পাসের ভেতর পাকিস্তানিদের হাতে প্রাণ হারান।

আজ স্মৃতির মন্দিরে কিছু বিস্মৃত ঘটনা মনকে তোলপাড় করছে। যশোর-কালিগঞ্জের বীর জনতার সুখ-দুঃখের, আনন্দ-বেদনার রূপ-কাহিনীর সঙ্গে অল্প কয়েকদিনে মিশে গিয়েছিলাম। এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিবেশে জনতার কাতারে জনযুদ্ধে শরিক হয়েছিলাম। রাষ্ট্রদর্শনের গালভরা বুলি সদৃশ থিওরির বাইরেও যে গণসমর্থন ও জনগণের ইচ্ছাশক্তিরূপ একটি প্রচ্ছন্ন রাষ্ট্র আছে তা ক্যাডেট কলেজের চারদেয়ালের দুর্গের এ অধ্যাপকের জানা ছিল না। স্বদেশপ্রেমে স্বাধীনতার দীক্ষামন্ত্রে উদ্ভাসিত প্রাণ কালিগঞ্জের বীর জনতা একটি সুশিক্ষিত ও সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীর চেয়েও অধিকতর আত্মত্যাগে আমাকে সব ধরনের সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছিলেন।

আজ মনে পড়ছে যুদ্ধ পরিচালনাকালে সেদিনের সে কালবৈশাখীর রাতের কথা। একদিন লাগলো কালবৈশাখীর ঝড়ের তাণ্ডব। প্রবল বৃষ্টিতে ও ঝড়-তুফানে খোলা আকাশের নিচে আমাদের পাকের চুলা নিভে গেল। রান্না হলো না। মাঠে পানি জমে গেল। মাঠের শক্ত মাটির কাদায় হাঁটু পর্যন্ত পা দেবে যেতো। নিচু জমির ট্রেঞ্চ ও বাঙ্কারে পানি উঠে গেল। প্রতিরক্ষা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো। জিপ, পিকআপ সরাসরি মাঠের সরু রাস্তা ও মাঠের ওপর দিয়ে চালানো সম্ভব হলো না। মূল পাকা রাস্তায় ট্রাক-জিপে যেতে স্থানে স্থানে পাকা সড়কের সঙ্গে গ্রামের সংযোগকারী কাঁচা রাস্তার মোড়ে, বড় বড় গাছের নিচে রুটি, ছোলা, চিড়া-গুড়, ডাব, দৈ, দুধ ও মধু নিয়ে জীর্ণশীর্ণ বসনের সাধারণ মানুষ ঝড়-বাদল উপেক্ষা করে ট্রাক-জিপ থামিয়ে জোর করে তাদের আনা খাবার উঠিয়ে দিতো।

সাধারণ মানুষের দেয়া খাবার তাদেরই সাহায্যে ভারবাঁশে করে ঝড়-বাদল, বৃষ্টি-কাদা উপেক্ষা করে নিজেদের পজিশনে কোম্পানির লোকজনের জন্য নিয়ে গিয়ে দেখি কেউ নেই। এমুনিশনের বাক্স পড়ে আছে, গুলিভর্তি ম্যাগাজিন পড়ে আছে, ট্রেঞ্চে পানি, চারপাশে কাদায় একাকার, সৈন্য-সামন্ত হাওয়া। খাদ্য বয়ে আনা লোকজনের কাছে লজ্জিত হলাম। প্রচণ্ড ঝড় ও বৃষ্টি-বাদলে কাদায় একাকার হয়ে ঘুরছি। নিজের টর্চ গেছে খারাপ হয়ে, সঙ্গের হারিকেন গেছে নিভে, বিদ্যুতের আকস্মিক ঝলকানিতে পথ দেখে চলি। কোথাও জনমানবের সাড়া নেই। রাত বারোটা-একটার দিকে আশপাশের ও দূর-দূরান্তের বাড়িঘরগুলোতে নিজের লোকজন খোঁজা আরম্ভ করলাম। মাটির দেয়ালের এক বাড়িতে অনুমানে দরজার কড়া নাড়তে বিদ্যুতের ঝলকানিতে দেখি রাইফেলের নল বেরিয়ে আসছে। তাদের গুলির হাত থেকে আকস্মিক ও অলৌকিকভাবেই বেঁচে গেলাম। ভেতরে কুপি জ্বলছে। কয়েকজন সশস্ত্র সৈনিক আতঙ্কে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে আছেন। কে যে কাকে দেখে বেশি বেকুব বা অবাক হলাম বুঝলাম না। একজন হাবিলদার তো আনন্দে কেঁদেই ফেললেন। আবেগ রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'স্যার, পঁয়ষট্টি সালের লড়াই করেছি, দেখেছি অনেক, এতটা ভাবিনি। এ সময়, এ অবস্থায় আপনি আমাদের খাবার নিয়ে আসবেন তা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

ক্রুদ্ধ আক্রোশে পজিশন ছেড়ে আসার কারণে সবার প্রতি ফুঁসছিলাম। কিন্তু তাদের আচরণে রাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তাদের আহার করালাম। দূর-দূরান্তের সবাইকে

জড়ো করে পজিশনে নিয়ে গেলাম। সোজা বলে দিলাম, 'কোনো অজুহাত শুনতে চাই না, কোনো অবস্থাতেই কেউ ট্রেঞ্চ ছাড়তে পারবে না। পাকিস্তানিরা এ অবস্থায় এডভান্স করলেই বাবারা টের পেতে'। হায় রণক্ষেত্রের নির্মম অভিজ্ঞতা।

বারোবাজারের সদা হাস্যময় আওয়ামী লীগ প্রধানের অতুলনীয় সাংগঠনিক প্রতিভা, অচঞ্চল স্থিরচিত্ত কর্মপ্রবাহ, চরম বিপর্যয় ও হতাশার মুখে জনগণের পাশে দাঁড়ানো রূপকথার মতো মনে হয়। দল-উপদলে বিভক্ত বিহারি অধ্যুষিত এলাকায় মুকুটহীন রাজার মতো লিখিত আইনের চেয়েও শক্তিমান অলিখিত আইনে কর্তৃত্ব করে মুক্তিসেনার রসদ জোগানো যেকোনো মানদণ্ডে অবিস্মরণীয়। বারোবাজরের আওয়ামী লীগ অফিস চব্বিশ ঘণ্টা বিরামহীন গতিতে যুদ্ধ ও বেসামরিক যোগাযোগের অফিসরূপে কাজ করেছে। স্বল্পতম সময়ে তিনি আমার সগর্জন ও ক্রুদ্ধ আবেগে সময়ে-অসময়ে চাওয়া যানবাহন, লোকজন, ওষুধ, খাদ্যদ্রব্য, টেলিফোনের লোকজন, তার ও অন্যান্য বহুবিধ সরবরাহ অপূর্ব স্থির প্রশান্তিতে সংগ্রহ করে দিয়েছেন।

পৃথিবীর বহু দেশই জনসমর্থন নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা করেছে। কিন্তু এমন স্বতঃস্ফূর্ত গণসমর্থনের জনযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাস বোধ হয় দেখেনি। এমন আত্মত্যাগের মহিমা-ধন্য জনযুদ্ধের ইতিহাসও ইতিহাসে বিরল। জাতীয় জীবনের ঊষালগ্নে, পূর্ব তোরণের উদীয়মান সূর্যরশ্মিকে সালাম জানাতে ক্ষুদ্রশক্তিকে নিয়োজিত করতে যারা সুযোগ দিয়েছিলেন তাদের আজ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি।

এ যুদ্ধের এপারের বীর সৈনিকদের কাছে নিজের ঔদ্ধত্যের জন্য ক্ষমা চেয়ে পরপারের সৈনিকদের জান্নাত কামনা করি।

রচনাকাল ১৯৮৫

একাত্তরের স্মৃতি

নিজামউদ্দিন লস্কর

বরফ গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি আজ আমার চারদিকে, বরফগলা নদীর জন্ম হতেও আর বেশি দেরি নেই। আমার বিবেকের শপথ নিয়ে তাই একাত্তরের স্মৃতিকে রোমন্থন করতে বসেছি।

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি। একেকজনের একেক রকমের স্মৃতি। একাত্তরের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ঘটে যাওয়া অযুত-নিযুত ঘটনার স্মৃতি। এই স্মৃতির বসতি শুধু মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক, রাজনীতিবিদ কিংবা সাংবাদিকদের বুকের গভীরেই নয়, বরং যারা সেদিন এই যুদ্ধ দেখেছে, যাদের চোখের সামনে সংঘটিত হয়েছে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বর্বরতার নারকীয় অধ্যায়, যারা অতিক্রম করেছে এই দিনগুলো, তারা সবাই এই স্মৃতির ধারক ও বাহক। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ছবিটি তাই অনেকটা 'জিগ সো পাজলের' মতো আমাদের আজকের প্রজন্মের কাছে উপস্থিত হচ্ছে। অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট, জানালার শার্সিতে ঠিক যেন কুয়াশার ছায়ার মতো। একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি, অযুত-নিযুত টুকরায় বিভক্ত হয়ে কোটি কোটি মানুষের বুকের গভীরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় আজ বিরাজ করছে। স্মৃতির অতল অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়ার আগেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ছবিটিকে হস্তান্তর করতে হবে বর্তমান প্রজন্মের কাছে। অন্যথায় জাতি হিসেবে আগামী পৃথিবীর ইতিহাসে আমাদের জন্য সম্মানজনক কোনো স্থান বরাদ্দ হবার সম্ভাবনা মোটেই নেই। এই প্রশ্নটি সামনে রেখে, ব্যক্তিগত আবেগ এবং অহংবোধকে বিসর্জন দিয়ে আমাদের সবাইকে তাই ঝাঁপ দিতে হবে বুকের গভীরে, যেখানে স্মৃতি নামক মানবিক অনুভূতিগুলো বরফের মতো শক্ত এবং জমাট হয়ে আছে। সেই বরফকে মারাত্মক যত্নসহকারে গলাতে হবে। জন্ম হবে তখন অসংখ্য বরফগলা নদীর। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী শক্তিগুলো সব বাধা-বিপত্তির পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এই নদীগুলোর মিলনে তখন সৃষ্টি হবে ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তে গড়া সেই মহাসাগরের। তখন দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ছবিটি; আমাদের সন্তানদের চোখের সামনে।

যুদ্ধের মাঠের, আমার শেষ দিনটির শেষ মুহূর্তের ঘটনা দিয়ে আরম্ভ করছি। আজকের স্মৃতিচারণ শুরুর দিনগুলোকে উপস্থাপন করার মতো সময় এবং সুযোগ প্রার্থনা করছি মহান স্রষ্টার কাছে।

১৬ আগস্ট একাত্তর। সোমবার। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত হয়তো এই দিনটির স্মৃতি আমি বহন করে বেড়াবো। স্থান আহসানমারা ফেরি এবং জয়কলস ব্রিজের মাঝামাঝি। সুনামগঞ্জ থেকে সিলেট রওনা হলে ৯ মাইল পার হতেই জায়গাটি পাওয়া যায়। সন্ধ্যা

তখন হয় হয়। যুদ্ধের মাঠ থেকে বিদায় নেয়ার পালা আমার। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় নৌকার পাটাতনে শুয়ে আছি। বাম পায়ে এসে কিছু একটা লাগলো। মনে হলো পাথরের টুকরো। গুলি অথবা গ্রেনেডের আঘাতে পাথর ফেটে গিয়ে অনেক সময় এরকম আঘাত লেগে থাকে। এই অভিজ্ঞতা অনেকের মতো আমারও হয়ে গিয়েছে ইতোমধ্যে। ব্যথাও খুব একটা লাগেনি। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের ব্যবধানে আমার বাম পা ভাঁজ হয়ে আসতে লাগলো। বসে পড়লাম মাটিতে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। হাত দিতেই ঠাণ্ডা রক্তে তা ডুবে গেল। তখন টের পাইনি কিসের আঘাত লেগেছে। পায়ের উল্টোদিকে হাত দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় হবার কোনো চিহ্ন খুঁজে পেলাম না। ইত্যবসরে ধরাধরি করে অন্যরা আমাকে তুলে নিয়ে নৌকার পাটাতনে শুইয়ে দিল। সহযোদ্ধা শামছুল হক খুব শক্ত করে গামছা বেঁধে দিল আমার পায়ের রক্ত বন্ধ করার জন্য। নৌকা ছেড়ে দিলাম আমরা-যে গ্রামে উঠেছিলাম সেই গ্রামটির উদ্দেশ্যে। গ্রামটির নাম বইয়াখাউরি, লেখায়-পড়ায় বশিয়াখাউরি। জয়কলস, উজানিগাউ-এর কাছাকাছি গ্রামটির অবস্থান। আমরা অবস্থান করছি গ্রামটিতে। যারা বালাট সাব-সেক্টর থেকে এসে গত বারো দিন যাবৎ বাড়িতে অবস্থান করছিলাম, ভদ্রলোকের নাম দানিছ মিয়া। ১৯৯০ সালে মারা গেছেন তিনি। ভীষণ সাহসী লোক ছিলেন। আমাদের পঞ্চাশ থেকে ষাটজন লোকের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হাসিমুখে করে দিয়েছিলেন তিনি তার বাড়িতে। সুনামগঞ্জের এমএনএ মরহুম দেওয়ান ওবায়দুর রাজা সাহেব আমাকে বলেছিলেন, তার সঙ্গে এসে যোগাযোগ করার জন্য, সঙ্গে একটি চিঠিও নিয়ে এসেছিলাম রাজা সাহেবের হাতের লেখা। কারণ বিশ্বস্ত লোক ছাড়া ওই সময় কোথাও ওঠা কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল আমাদের জন্য। সন্ধ্যা পার হবার পর আমরা গিয়ে পৌঁছলাম বইয়াখাউরিতে। দানিছ মিয়া সাহেবের ছোট ভাই আনিছ মিয়া সাহেব ছিলেন একজন গ্রাম্য ডাক্তার। তিনিও আজ বেঁচে নেই। আমাকে দেখলেন তিনি। এন্টিসেপটিক জাতীয় লোশন দিয়ে আমার ক্ষতস্থান ধুয়ে পরিষ্কার করলেন তিনি প্রথমে। আমার একপাশে মুক্তিযুদ্ধারা, আর অন্যপাশে দানিছ মিয়াসহ তার পরিবারের লোকজনরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। পায়ে তখন যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, তবে সহ্যের বাইরে নয়। খুব যত্নসহকারে একটি কাঠির আগায় তুলো পেঁচিয়ে আমার ক্ষতস্থান পরীক্ষা করে ডাক্তার সাহেব বললেন 'গুলি লেগেছে এবং গুলিটি আটকে আছে। অপারেশন ছাড়া কোনো অবস্থাতেই বের করা সম্ভব নয়' তিনি খুব শক্ত করে ব্যান্ডেজ করে দিলেন, আর একটি এন্টিটিটেনাস ইঞ্জেকশন দিলেন। এর চেয়ে বেশি কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না সেদিন। এক কাপ গরম দুধ বাড়িয়ে দিলেন একজন মহিলা আমার দিকে। কে যেন আমার মাথাটা উঁচু করে ধরলো। দুধপান করার সময় অভূতপূর্ব একটি দৃশ্য দেখলাম- মুক্তিযোদ্ধারা কাঁদছে, বাড়ির মেয়ে-পুরুষ সবারই চোখে পানি, সবাই কাঁদছে, শুধু আমি ছাড়া। ওই চোখের পানি প্রতিটি বিন্দুকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার বলে মনে হয়েছিল সেদিন আমার কাছে। চোখের নিমিষে মুছে গেল সব যন্ত্রণা। আমি আহত হয়ে সেদিন আনন্দিত হলাম ধন্য হলাম গর্বিত হলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানালাম 'মরণেও সুখ আছে'।

দানিছ মিয়া ছাড়া বাড়ির সব আমার ইশারায় আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। মুক্তিযোদ্ধা এই দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলাম আমি। সহকারী কমান্ডার শামছুল হকের হাতে সোপর্দ করলাম আমার পরবর্তী দায়িত্ব। ছইওয়ালা একটি নৌকাতে আমিসহ আঁরো তিনজন মুক্তিযোদ্ধা, তার মধ্যে দু'জন বেশ কিছুটা আহত এবং গাইড মজলিসকে সঙ্গে নিয়ে ওই রাতেই রওনা হলাম বালাটের উদ্দেশে। দু'জন মাঝিসহ আমরা মোট পাঁচজন। নৌকা ভাসালাম হাওরের বুকে। হাওরটির নাম করছা। নিকষ অন্ধকারের বুক চিরে এগোচ্ছে আমাদের নৌকা। বৃষ্টির একটানা শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণাও বাড়াতে লাগল। মায়ের মুখটি মনে পড়ল এই প্রথম, গুলি খাওয়ার পর। বাবাসহ ভাইবোন সবার কথা ভীষণভাবে মনে হতে লাগলো, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুর্ভাগ্যের মূল চিত্রটি সম্পূর্ণ অন্য আদলে ধরা পড়লো আমার কাছে। ভাবলাম, পালিয়ে যাচ্ছি আমি, চোরের মতো, নিজের দেশ ছেড়ে, মা, বাবা, ভাইবোন সবার অজান্তে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। আমারই দেশের কোনো হাসপাতালে ভর্তি হবার বিন্দুমাত্র সুযোগ কিংবা অধিকার আজ আমার নেই। প্রচণ্ড যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে 'স্বাধীনতা' শব্দটির বিশাল ব্যাপ্তি আমার বোধে তখন উন্মোচিত হলো। বিস্ময়কর এই শব্দটিকে জীবনে এই প্রথম আমার প্রণতি জানালাম।

১৭ আগস্টের সকাল। বৈঠার ছপ্ ছপ্ আওয়াজে বুঝতে পারলাম, হাওরের বুকে ভাসছি এখনো আমরা। রাতের শেষপ্রহরে আমার নাকি প্রচণ্ড জ্বর উঠেছিল। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকেছি, যন্ত্রণায় চিৎকার করেছি শুধু, ঘুমুতে পারিনি এক ফোঁটাও। সহযাত্রীরা সবাই মিলে অবিরাম পানিপট্টি দিয়েছে আমাকে। যন্ত্রণার এমন একটি স্তর রয়েছে, যেখানে পৌঁছানোর পর আর কোনো যন্ত্রণাই টের পাওয়া যায় না-এই অভিজ্ঞতাও ছিল না আমার। জ্বর নাকি খানিকটা কমেছে এখন, জ্বর কমার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা বেড়ে গেলো আবার। আরো কয়েক ঘন্টার পথ পাড়ি দিতে হবে, অসহ্য যন্ত্রণার কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্য প্রার্থনা করলাম যেন জ্বরটা আবার বাড়ে, তাহলে আর কিছু না হোক অসহনীয় যন্ত্রণার হাত থেকে সাময়িক ছুটি অন্তত পাওয়া যাবে। জ্বর বাড়লো না এবং যন্ত্রণাও কমলো না বরং নানারকম এলোপাতাড়ি দুশ্চিন্তা এসে ভর করল মাথায়। হিসাব করে দেখলাম, প্রায় চৌদ্দ-পনেরো ঘন্টা পার হয়েছে গুলি খাওয়ার পর, অথচ এখনো বলতে গেলে কোনো চিকিৎসা হয়নি, তাছাড়া রক্ত পড়ছে ক্ষতস্থান থেকে চুইয়ে চুইয়ে, মাথা ঝিম ঝিম করছে। হঠাৎ মনে হলো-মারা যাচ্ছি আমি, মরে যাওয়ার মারাত্মক একটা ভয় এসে আক্রমণ করলো আমাকে, ভীষণ কান্না পেল। ভাবলাম, এমন একটি পরিবেশে মারা যাচ্ছি আমি, যেখানে আমার মা, বাবা, ভাইবোন কেউ উপস্থিত নেই, অর্থাৎ ঘটা করে সবার সামনে মরতে চাইছিলাম আমি। যুদ্ধক্ষেত্রে এহেন মৃত্যু কল্পনাও করা যায় না, ব্যাপারটি আমার মাথায় ওই মুহূর্তে মোটেই ঢুকছিল না। ভয়ে সব শরীর কাঁপতে লাগলো। ফেলে আসা জীবনে এ যাবৎ সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে যত অন্যায় অপরাধ করেছি, সবকিছুর জন্য অনুশোচনা হতে লাগল, কলেমা পাঠ করা শুরু করলাম জোরে জোরে, কোরআন শরীফের মুখস্থ সুরাগুলো সব একে একে তেলাওয়াত করতে থাকলাম। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে জানি

না, তবে একসময় আবিষ্কার করলাম, যন্ত্রণা আছে, কিন্তু সহ্য করতে পারছি কিছুটা, শরীরের সেই কাঁপন আর টের পাচ্ছি না। স্রষ্টার অস্তিত্বকে ভীষণ কাছাকাছি মনে হলো। স্রষ্টারই কৃপায় যেন হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল-ট্রেনিং সেন্টারে একজন অফিসার একদিন বলেছিলেন, চায়নিজ বুলেট তৈরির পেছনে একটি অদ্ভুত কারিগরি দর্শন রয়েছে। সাধারণত চায়নিজ বুলেট বিশেষ কোনো দুর্বল জায়গায় না পড়লে মানুষ মরে না, শুধু আহত হয়, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত সৈনিকের চেয়ে আহত সৈনিকের মূল্য শত্রুপক্ষের কাছে অনেক বেশি হয়। যুক্তিটিকে বেশ জোরালো মনে হলো আমার কাছে এই মুহূর্তে। আমি মারা গেলে ইত্যবসরে আমার লাশ ওই এলাকার কোথাও দাফন হয়ে যেত, অথচ আমার জন্য নৌকা ব্যবস্থা করে, সঙ্গে লোকজন দিয়ে পাঠানো হচ্ছে আমাকে চিকিৎসার জন্য। এই মুহূর্তে একজন বাতিল সৈনিক হলেও আমার ভরণ-পোষণ, চিকিৎসার সব বন্দোবস্ত আমার সরকারকেই করতে হবে। আহতের সংখ্যা বেশি হলে প্রচুর লোকবল এবং অর্থের বিরাট ক্ষতিসাধনের এই দর্শন যুদ্ধের স্ট্রাটেজি হিসেবে বেশ ইফেক্টিভ মনে হলো আমার কাছে। নানারকম চিন্তার স্রোতের মধ্য দিয়ে আরো কয়েক ঘন্টা কাটলো।

অবশেষ বিকেল তিনটার দিকে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম পলাশ ইউনিয়নে। সময়ের হিসাবে প্রায় একুশ ঘন্টা পার হয়েছে আহত হওয়ার পর, আর দিনের হিসাবে আজ মঙ্গলবার, ১৭ আগস্ট। পলাশ ইউনিয়ন তখন সম্পূর্ণ আমাদের দখলে, অর্থাৎ মুক্ত এলাকা। মুক্ত এলাকার বাতাসের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলাম মনের মধ্যে। আমাদের নৌকা কূলে ভেড়ার আগেই টহলরত সেন্ট্রির নজরে পড়লো। আমার অবস্থা দেখেই কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা দৌড়ালো গ্রামের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে লোকজন ছুটে এলো। যেতে হবে আরো পাঁচ-ছয় মাইল পথ। গুলিবিদ্ধ পা নড়াচড়া করলেই যন্ত্রণা হয়। অবশেষে গ্রামের এক মসজিদ থেকে লাশ বহন করার 'ক্বরার' নিয়ে আসা হলো, ক্বরারের মধ্যে কাঁথা বিছিয়ে খুব সাবধানে এবং যত্ন সহকারে আমাকে শোয়ানো হলো, লোকজন এসে ভিড় করলো আমাকে দেখার জন্য, অনেকে এটা-ওটা নিয়ে এলো খাওয়াতে, খাবার আগ্রহ ছিল না মোটেই। রুচিও ছিল না। আসলে বালাট পৌছার জন্য মারাত্মক উদগ্রীব হয়ে পড়েছিলাম। তারপর শুরু হলো যাত্রা, লোকজনের কাঁধে চড়ে। জীবিত অবস্থায় কারো ভাগ্যে মৃতদেহের ক্বরার চড়ার সুযোগ হয়েছে কিনা জানি না, তবে আমার হলো। গিয়ে পৌঁছলাম একসময় পলাশ ইউনিয়নের শেষ প্রান্তে, পাহাড়ি নদী 'মাইলামে'র তীরে, ওপারে বালাট, ভারত সীমান্তের শুরু সেখান থেকেই। ট্রাঞ্জিট ক্যাম্পের তাঁবুতে নামানো হলো আমাকে। মুক্তিযোদ্ধাদের রিক্রুট করা হয় এই ক্যাম্প থেকে।

তাঁবুর ভেতরে মাটিতে শুয়ে আছি আমি। রিক্রুটিং ক্যাম্পের ইনচার্জ তাঁবুর পর্দা সরিয়ে এসে ঢুকলেন, আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সাপ দেখার মতো চমকে উঠলেন, মনে হলো, আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পাবেন কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেননি। একই অবস্থা আমারও। (মরহুম) লতিফ সরদার ভাইকে তখন আমার পাশে পাব, আমিও কল্পনা করিনি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তার সঙ্গে এই আমার প্রথম দেখা। দৌড়ে

এসে হাঁটুমুড়ে আমার পাশে বসলেন তিনি, ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে আমার পা। সরদার ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম, আমার অবস্থা খুব সুবিধার নয়। ছুটে বেরিয়ে গেলেন তিনি তাঁবুর ভেতর থেকে। কিছুক্ষণ পর ফিরে এলেন। বললেন, খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন বালাটে, ওখানে রাজা সাহেবসহ আরো অনেকে রয়েছে, ইতোমধ্যে ছোটখাটো একটি হাসপাতালও খোলা হয়েছে আমাদের নার্স এবং ডাক্তারের মাধ্যমে। গরম দুধের ব্যবস্থা করালেন আমার জন্য, কিন্তু আমি পুরোটা পান করতে পারলাম না যন্ত্রণার কারণে। যে লোকটি খবর নিয়ে গিয়েছিল সে ফিরে এসে জানাল, রাজা সাহেব ওদিকের মুক্ত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছেন। ইত্যবসরে আমাদের যোদ্ধারা মঙ্গলকাটা, ষোলঘর, বেরিগাউ এবং আরো কয়েকটি গ্রাম মুক্ত করে নিয়েছে হানাদার বাহিনীর দখল থেকে। ম্যাসেঞ্জারের কাছ থেকে জানলাম- ডাক্তার আসছে, তবে দেরি হবে কিছুটা, কারণ মাইলামে তখন ঢল নেমেছে, প্রায় ন'মাইল পথ ঘুরে আসতে হবে। পাহাড়ি নদীর বৈশিষ্ট্য হলো-যখন ঢল নামে, বিরাট বড় হয়ে যায় নদী, প্রচন্ড স্রোত থাকে, নৌকা নিয়ে পার হওয়া দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। আবার ঢল বন্ধ হলে হাঁটুপানিও থাকে না, একটি ছোট্ট বাচ্চাও পেরুতে পারে অনায়াসে। অধীর আগ্রহে ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম। সন্ধ্যা তখন হয় হয়। তাঁবুর বাইরে মিলিটারি জিপ থামার শব্দ শুনলাম। ছুটে বেরিয়ে গেলেন সরদার ভাই। গতকাল ঠিক এই সময়ে পায়ে আমার গুলি লেগেছিল। ইন্ডিয়ান আর্মির অফিসার মেজর ডি সুজা, আরো একজন ভদ্রলোক এবং দু'জন মহিলা ঢুকলেন তাঁবুর ভেতরে, সবার পেছনে সরদার ভাই। আমাদের সাব-সেক্টরের সঙ্গে ভারতীয় পক্ষের কো-অর্ডিনেটিং অফিসার হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব ছিল মেজর ডি সুজার। ভীষণ কড়া মেজাজের লোক। প্রায়ই মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তার খিটিমিটি লাগতো। বেশি লাগত কমান্ডারদের সঙ্গে, কারণ বিভিন্ন দাফতরিক কাজে তার কাছে কমান্ডারদের যেতে হতো, প্রায় সময় হস্তক্ষেপ করতে চাইতো সে আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনায়। পরে আমাদের সেক্টর কমান্ডার লে. কর্নেল মীর শওকত আলী সুকৌশলে তাকে বাগে আনতে সক্ষম হন। আমার সঙ্গে ঝগড়ার মাধ্যমেই তার পরিচয়ের সূত্রপাত। প্রথম যেদিন আমরা বালাট সাব-সেক্টরে যোগ দিতে আসি, সেদিন শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত তাকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে আসেন। পাঁচ নম্বর সেক্টরের একজন শক্তিশালী সংগঠক হিসেবে সুরঞ্জিত বাবুকে কাজ করতে দেখেছি যুদ্ধকালীন সময়ে, তাছাড়া টেকেরঘাট ও বড়ছড়ার সার্বিক দায়িত্ব তার ঘাড়ে ছিল প্রথম দিকে। সুরঞ্জিত দা'র সঙ্গে আলাপ করার উদ্দেশ্যে আমি দৌড়ে যাই। দাদা আমাকে ডি সুজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। প্রতিউত্তরে সে বলল, 'আই এম মেজর ডি সুজা, ফ্রম গোয়া; ইউ উইল ওয়ার্ক আন্ডার মি ফ্রম নাও'। আমি তাকে সেল্যুট করলাম। তার বদলে সে আমাকে কঠিন এক শাস্তির হুকুম করে বসলো। আমরা দাঁড়িয়েছিলাম পাথরের একটি টিলার ওপর। আমাকে সে ওই টিলা বেয়ে ক্রোলিং করে নামতে বলল। আমরা কনুই এবং হাঁটুর সম্পূর্ণ চামড়া থেৎলে গিয়েছিল আদেশটি পালন করতে গিয়ে। যদিও ভালো করে জানতাম, আমি তার অধীনস্ত নই, তারপরও সেদিন তার দেয়া

হুকুমটি তামিল করেছিলাম শুধু পরিস্থিতিগত কারণে। পরে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক পাল্টে গিয়েছিল একেবারে। সেই ডি সুজা তাঁবুতে ঢুকেই উল্লসিত কণ্ঠে আমার নাম ধরে হাঁক দিল-'হেই লস্কর, কী ব্যাপার ফ্রেন্ড, মনে হচ্ছে ঘাবড়ে আছো, ডোন্ট ওরি ম্যান, ওই দেখো কাকে ধরে এনেছি, হি উইল ডু এভরি থিং ফর ইউ'। ইংরেজিতেই বলছিল সে কথাগুলো। পাশের এপ্রোন পরা ভদ্রলোকটির প্রতি নজর পড়ল আমার। ভদ্রলোকের নাম ডক্টর এলভিস, ক্রিশ্চিয়ান মিশনারিদের একটি মিশনে কাজ করেন ভদ্রলোক। নিজেই তার পরিচয় দিলেন। স্কার্ট পরা সুন্দরী নার্স দু'জন যে তার সঙ্গের, সে আর বুঝতে বাকি রইল না আমার। ডি সুজা আমার মুখে একটি পানামা সিগ্রেট ধরিয়ে দিলো। আহত হওয়ার চব্বিশ ঘন্টা পর এই প্রথম সিগ্রেট টানলাম, ভুলে গেলাম সরদার ভাইয়ের সামনে আমি সিগ্রেট খাই না। একনাগারে বক বক করে যাচ্ছিল ডি সুজা। 'ইয়ার, নার্স দু'জনের কাকে তোমার পছন্দ?' এরা হাসছিল মিটিমিটি আমার দিকে তাকিয়ে। আমারও হাসি পেলো তখন। নার্স দু'জন আমার ক্ষতস্থান ধুয়ে পরিস্কার করে জায়গাটির পাশেই একটি ইনজেকশন পুশ করলো। ডাক্তার বললো, 'পেথেড্রিন'। ডি সুজার হাস্যরসে সাড়া দিলেও আঁড়চোখে আমি দেখলাম গ্লাভস পরে ডাক্তার কাঁচি হাতে নিচ্ছে। আমি বললাম, 'যা ইচ্ছে তোমরা করো, কিন্তু দোহাই তোমাদের, হয় আমাকে অজ্ঞান করো, অথবা জায়গাটি অন্তত অবশ করো।' ডাক্তার আশ্বাস দিল কোনো ব্যথা লাগবে না, পেথেড্রিন দেয়া হয়েছে। নার্স দু'জন, ডি সুজা, সবাই মিলে আমার হাত-পা চেপে ধরল। ডাক্তার প্রথমে ক্ষতস্থানটি কেটে আরো একটু বড় করল, তারপর আর কিছুই জানিনা। শুধু এইটুকু বলতে পারবো, আমি চিৎকার করেছি একটানা পনেরো মিনিট, কোরবানির গরুর মতো ছটফট করেছি যন্ত্রণায়, ডাক্তার, নার্স, ডি সুজা সবাইকে মা, বাপ চৌদ্দগুষ্ঠী তুলে ইংরেজিতে গালাগাল দিয়েছি যাতে তারা আমার কষ্ট বুঝতে পারে। কিন্তু কেউ আমার চিৎকার অথবা গালিগালাজে কান দিলো না। এক পর্যায়ে মুক্তি পেলাম এই অত্যাচার থেকে। ডাক্তার জানালো, হাড্ডির পেছনে আটকে আছে গুলিটি। ফুল এনেস্থেশিয়া ছাড়া সম্ভব নয় কিছুতেই, তবে রক্তপড়া বন্ধ করা যাবে, ব্যথা কমানোর ইনজেকশনও ব্যবহার করা যাবে। শেষ পর্যন্ত তাই-ই করা হলো ওই রাতে বালাটে, আমাদের ইমার্জেন্সি হাসপাতালে। ডাক্তার ভদ্রলোক খুব মর্মাহত হলেন আমার অবস্থা দেখে। এই মুহূর্তে তার নামটি সঠিক মনে করতে পারছি না, তবে আমার মনে হয়, তার নাম ছিল ডা. মকব্বির আলি। ইতোমধ্যে আমার খবর মুক্ত এলাকায় পৌঁছানোর ফলে মুক্তিযোদ্ধারা আসতে লাগলো দলে দলে। ওবায়দুর রাজা সাহেব, আছদ্দর আলি সাহেব, সুনামগঞ্জের তৎকালীন ওসি সাহেব, এনাম ভাই (এনামুল হক চৌধুরী), সদর ভাই (সদর উদ্দিন চৌধুরী), মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ, সবাই এলেন। সিলেট সদরের এই তিনজনকে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুবই ভালো লাগল। হরলিক্স, সিগারেট, আর আপেলে আমার টেবিল ভর্তি হয়ে গেল। মনে হলো, আমি যেন নিজের বাড়িতে চলে এসেছি। রাত ন'টার দিকে এলো ডি সুজা। জানালো, গুর্খা রেজিমেন্টের একটি অ্যাম্বুলেন্স আজ রাতেই রওনা হবে শিলং থেকে। শেষ রাতে অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছলে, কাল সকালেই যাত্রা শুরু করা যাবে, শিলং মিলিটারি হাসপাতালে

আমার সিটও বুক করা হয়েছে ওয়ারলেসের মাধ্যমে। এত তাড়াতাড়ি এতখানি ব্যবস্থা হবে, আমি ভাবতেও পারিনি, আসলে সবটুকু সম্ভব হয়েছে ডি সুজার ব্যক্তিগত উৎসাহের ফলে। আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম তাকে। একজন সৈনিক বন্ধুর জন্য এতটুকু করতে পেরে সে নিজে ব্যক্তিগতভাবে আনন্দিত বলে জানালো আমাকে। মানবিক অনুভূতি দেশ কিংবা রাজনীতির খুঁটিতে বাঁধা থাকে না, আমার জন্য এই তাড়াহুড়া না করলেও পারতো সে, মনটা তাই ওর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। ডি সুজার বাড়িয়ে দেয়া আরেকটি সিগারেট টানতে টানতে টের পেলাম চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে, আহত হবার পর এই প্রথম ঘুমালাম।

ঘুম ভাঙল পরদিন, বুধবার ১৮ আগস্টের সকালে। আরো কয়েকজন আহত মুক্তিযোদ্ধা ছিল কামরাটিতে, গতকাল তাদের কেউই আমার নজের পড়েনি, কারণ আমি শুধু আমাকে নিয়েই ছিলাম। তাদের কাছ থেকে জানলাম, বেশ কিছুটা ঘুমিয়েছি। পেইনকিলারের সঙ্গে ঘুমের ড্রাগ মেশানো ছিল নিশ্চইয়, ঘুমের আবেশটা তখনো পালিয়ে যায়নি চোখ থেকে। ডা. মকব্বির আলী এলেন। ডা. এলভিসের দেয়া কী একটা ইনজেকশন পুশ করল আমার পায়ে। সকালে আবার এনাম ভাই, সদর ভাই, সিরাজ, ওবায়দুর রাজা সাহেব, সুনামগঞ্জের আরো অনেকে এলেন আমাকে দেখতে। সকাল ন'টায় এলো ডি সুজা। অ্যাম্বুলেন্স আসার সংবাদ পেলাম তার কাছ থেকে। সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চড়লাম অ্যাম্বুলেন্সে। দুর্গম পাহাড়ি পথে আবার শুরু হলো যাত্রা। চেরাপুঞ্জির ভেতর দিয়ে যেতে হবে আমাদের। রাস্তায় কালো 'ফগ'। ফগলাইট জ্বালানোর পরও সাত-আট ফুটের বেশি দেখা যায় না। বৃষ্টি আর কুয়াশার চাদর সরিয়ে উঠতে লাগলো আমাদের গাড়ি পাহাড়ের চূড়া বেয়ে। পায়ের ব্যথা বাড়তে থাকলো ক্রমেই, পেইনকিলারের শক্তিকে হারিয়ে দিয়ে, অ্যাম্বুলেন্সের ঝাঁকুনির সঙ্গে তাল মিলিয়ে। বেশ কিছুদূর পর হঠাৎ থেমে পড়ল অ্যাম্বুলেন্স। পেছনে আরেকটি জিপ থামার শব্দ পেলাম। খটাং করে পেছনের দরজা খুলে গেল, একরাশ ঠাণ্ডা বাতাস এসে আক্রমণ করল সঙ্গে সঙ্গে। দরজায় ডি সুজার মুখ দেখে আমি চমকে উঠলাম। 'আমি আসছি তোমার সঙ্গে', জানাল সে। চার্চের একজন বয়স্কা 'নান'কে দেখলাম ডি সুজার পেছনে। 'উনি তোমার জন্য যীশুর কাছে প্রার্থনা জানাবেন, যদি তুমি অনুমতি দাও।' বিস্ময়ে অভিভূত হলাম কথাটি শুনে। খ্রিস্টান ডি সুজা, তার ধর্মবিশ্বাসের মাধ্যমে আমার জীবনের জন্য প্রার্থনা করার অনুমতি চাইছে আমার কাছে, আর ওদিকে, প্রায় বিয়াল্লিশ ঘন্টা আগে, আমারই দেশের মাটিতে, মুসলমান কোনো এক সৈনিক, কাফের হিসেবে আমার জীবনকে ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। সহাস্যে আমি তাকে অনুমতি দিলাম। অ্যাম্বুলেন্সে উঠে আমার স্ট্রেচারের উল্টো দিকে সিটটিতে বসে বিড় বিড় করে প্রার্থনাবাক্য উচ্চারণ করা শুরু করল মহিলা। 'আমেন' বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, শেষ হয়েছে তার প্রার্থনা। আমার মুখের ওপর তার স্নেহার্দ্র হাতটি বুলিয়ে বললেন, 'গড ব্লেস ইউ মাই সন।' প্রতি উত্তরে তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, 'স্রষ্টার আশীর্বাদই এখন আমার জীবনের একমাত্র মূলধন।' সহাস্যে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি গাড়ি থেকে নেমে গেলেন। ডি সুজা আমার মুখে একটি সিগারেট ধরিয়ে

দিয়ে বলল, 'পেছনের গাড়িতে আছি আমি'। শুরু হলো আবার আমাদের যাত্রা। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর টের পেলাম, কানে পট পট করছে, বুঝতে পারলাম আমরা অনেক উঁচুতে উঠতে শুরু করেছি।

বিকেল তিনটার দিকে অবশেষে এসে পৌছলাম শিলং মিলিটারি হাসপাতালে। গাড়ির দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটি ভীষণ পরিচিত গন্ধ নাকে এসে ঢুকল, হাসপাতাল-হাসপাতাল গন্ধ। পৃথিবীর সব হাসপাতালের একই গন্ধ, যে গন্ধটি জীবনে কখনো আমি সহ্য করতে পারিনি এবং আজো না। কিন্তু সেদিন ওই গন্ধটা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ পারফিউম বলে মনে হয়েছিল আমার কাছে। দু'জন ট্রলিবয় এসে মিনিটের মধ্যে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে স্ট্রেচারে ওঠালো, গিয়ে পৌছলাম ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে। ইউনিফর্ম পরা দু'জন নার্স সুপটু হাতে কাঁচি দিয়ে আমার শরীরের কাপড় কেটে বের করলো সঙ্গে সঙ্গে। ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করলো। একজন ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন, ইনজেকশন দেয়া হলো। তারপর হাসপাতালের কাপড় পরানো হলো। ইতোমধ্যে আমার ভর্তির সব কাগজপত্র রেডি হয়ে গেছে। ট্রলিবয়রা নিয়ে চললো আমাকে কেবিনের উদ্দেশ্যে, সেখানে অন্য আরেকজন নার্সের হাতে কাগজপত্রসহ আমাকে সঁপে দিয়ে তারা ফিরে গেল। লাল পর্দাঘেরা ছিমছাম সুন্দর একটি কেবিনের সুদৃশ্য বিছানায় শোয়ানো হলো আমাকে। কিছুক্ষণ পর ডি সুজা এসে উপস্থিত হলো আবার। বললো, 'তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। অর্থপেডিক সার্জন এসে দেখবে। কিছুক্ষণের মধ্যে দু'কার্টুন সিগারেট আর সাড়ে তিনশ টাকা রেখে যাচ্ছি, কাজে লাগবে সুস্থ হওয়ার পর। লস্কর, এবার তাহলে উঠি-বেস্ট অব লাক মাই ফ্রেন্ড।' কথাগুলো বলে উঠে দাঁড়ালো ডি সুজা চেয়ার ছেড়ে। কৃতজ্ঞতায় মনটা আমার ভরে এলো তার প্রতি। অনুরোধ করলাম তাকে আরো দু'মিনিট বসতে। বল্লাম, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে।' বসলো সে, আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে। সেদিন ভারতীয় আর্মির বন্ধুবৎসল ওই অফিসারটিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম-"তুমি যে আমার জন্য এত কিছু করলে, ব্যক্তিগত প্রভাবে ক্রিশ্চিয়ান এসোসিয়েশনের ডাক্তার এলভিসকে দিয়ে আমার চিকিৎসা করালে, রাতারাতি ৫/৫ গুর্খা রেজিমেন্টের অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করালে, নিজে আমার সঙ্গে আজ এই লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এলে, উপরন্তু গাঁটের পয়সা দিয়ে সিগারেট কিনলে আমার জন্য, আবার নগদ টাকাও দিয়ে যাচ্ছো-এই যে এত কিছু করলে, কেন করলে?' উচ্চঃস্বরে হেসে উঠলো সে প্রথমে। তারপর বলল, 'বাঙালিরা সবাই কি তোমার মতো এরকম কনজারভেটিভ? কাউকে সহজে বন্ধু হিসেবে নিতে চায় না?' আমি বললাম, 'উত্তরটি আমার ভীষণ প্রয়োজন, ঠাট্টা করো না প্লিজ।' ডি সুজা সেদিন যে উত্তর দিয়েছিল, আমার বুকের গভীরে তার প্রতিটি অক্ষর আজো খোদাই করে লেখা রয়েছে। স্মিতহাস্যে সে বলল, 'বিবেকের তাগিদে করেছি।' আমি বললাম-'আরো খোলাসা করো।' সে বলল, 'তোমার মতো একজন সৈনিক মারা গেলে আমার কিংবা ইন্ডিয়ান আর্মির কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, তোমার চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্স জোগাড় করার আংশিক দায়িত্ব আমার রয়েছে, তবে এত তাড়াতাড়ি না করলেও পারতাম আমি। আর বাদ-বাকি যা করেছি, সত্যিই বিবেকের তাগিদেই করেছি। এরপরও যদি জানতে চাও কেন করেছি, তাহলে শোনো-আমি একজন ভারতীয় নাগরিক। ইন্ডিয়ান আর্মির একজন অফিসার। চাকরির সুবাদে এই মুহূর্তে আমাকে

পাঠানো হয়েছে বালাট সাব-সেক্টরে, তোমার আর্মির সঙ্গে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করতে। হুকুম পেলে আবার কালই চলেই যাব হেডকোয়ার্টারে। তোমার দেশ স্বাধীন হবে কিনা জানি না। যদি হয়, যদি আমার দেশ তোমার দেশকে দখলও করে নেয়, আমার ব্যক্তিগত কোনো লাভ নেই তাতে। লাভ হলে হবে আমার দেশের রাজনীতিবিদদের। আমার বুকে বড়জোর একটা নতুন রিবন চক চক করবে, হয়তো বা একটা প্রমোশনও পাবো। কিন্তু এই রিবন বা প্রমোশন পাওয়া খুব সহজ নয়। মনে করো, তোমাদের সঙ্গে যদি আমাদেরও ভবিষ্যতে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে আমিও তোমার মতো আহত হতে পারি, মারা যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। মরে গিয়ে মহাবীর চক্র হয়েও আমার কী লাভ হচ্ছে, লাভ হচ্ছে ইন্দিরা গান্ধীসহ আমার দেশের অন্য নেতাদের। তোমার ব্যাপারটিও অনেকটা আমার মতো। দেশ স্বাধীন হবে কিনা তুমি নিজেও জান না, হলে তুমি কি হবে? কিছুই না। বড়জোর বড়সড় একটা চাকরি পেতে পার। তবে তুমি তোমার দেশের জন্য লড়ছো, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। তোমার সঙ্গে আমি যা করেছি, আমারই একজন সহকর্মী সৈনিক মনে করে করেছি, বন্ধু ভেবে করেছি, একজন মানুষ হিসেবে করেছি। অনেক কথা হলো, এবার উঠি, টেক কেয়ার মাই ফ্রেন্ড, খোদা হাফেজ।' খ্রিস্টান ডি সুজা, আমাকে স্রষ্টার হেফাজতে দিয়ে বেরিয়ে গেল কেবিন থেকে, কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে, উপযুক্ত কথাগুলো বলে। একজন মানুষের সঙ্গে আরেকজন মানুষের সম্পর্ক ভৌগোলিক সীমারেখা, কিংবা রাজনীতির মারপ্যাঁচ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। ব্যক্তি ডি সুজা আর মেজর ডি সুজার মধ্যে আমি দু'জন ভিন্ন মানুষকে আবিষ্কার করলাম। মেজর ডি সুজার প্রথম দিকের কিছু অসংলগ্ন ব্যবহার আমার কাছে এবার খোলাসা হলো। ডি সুজার মতো হাতেগোনা ভারতীয় আর্মির অফিসারদের প্রতি মনটা আমার কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নার্স এসে ঘুম ভাঙাল। বলল, 'ডাক্তার আসছেন আপনাকে দেখতে।' দুজন আর্মির ডাক্তার এলেন, একজন কর্নেল আর আরেকজন মেজর, সঙ্গে একজন নার্স। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কর্নেল জানালেন, 'পা কেটে ফেলতে হবে, জায়গাটিতে পুঁজ হয়ে গিয়েছে, গ্যাংগ্রিনের আলামত দেখা যাচ্ছে, অতএব পা না কাটলে রোগী বাঁচবে না।' মেজর ভদ্রলোকটি তখন বললেন, কর্নেলকে-'রোগীর বর্তমান ফিজিক্যাল কন্ডিশনে যদি অপারেশান করা যায়, তাহলে অপারেশনের দায়িত্ব স্যার আমার, যা করতে হয়, আমি করবো।' কর্নেল ভদ্রলোকটি তখন কিছুটা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ঠিক আছে রক্ত দেয়ার ব্যবস্থা করো আগে, প্রচুর ব্লাড লস হয়েছে, পরে আমি আবার চেক করে বলবো এনেস্থেসিয়া নিতে পারবে কি না।' বের হয়ে গেলেন কর্নেল। ওদের আলাপ আমি এতক্ষণ খুব মন দিয়ে শুনছিলাম। কর্নেল বেরিয়ে যেতেই মেজর ভদ্রলোকটি ফিরলেন আমার দিকে। নার্সের সাহায্যে আমার ক্ষতস্থানটি ভালো করে আবার পরীক্ষা করলেন। নার্সকে পাঠালেন আমার ব্লাড ট্রান্সফিউসনের আয়োজন করার জন্য। নার্স বেরিয়ে যেতেই জিজ্ঞাস করলেন, 'বাড়ি কোথায়?'

বললাম, 'বাংলাদেশ।' হেসে বললেন, 'বাংলাদেশে কোথায়?' বললাম, 'সিলেটে।' এবার তিনিও বাংলায় বললেন, 'আমি প্রদীপ সরকার, বাড়ি বাংলাদেশে, ময়মনসিংহ। দেশভাগের সময় আমরা চলে এসেছিলাম।' ভীষণ খুশি হলাম আমি মেজর সরকারকে

পেয়ে। বললেন, 'ভয় পেয়ো না, আমি তোমার পা টি বাঁচানোর চেষ্টা করবো। ওই ব্যাটা কর্নেল জাতে পাঞ্জাবি, সে এনেস্থেসিয়ার ডাক্তার, তার দায়িত্ব তোমাকে বেহুঁশ করা, সে খামাখা মাতব্বরি ফলাতে চাইছে, তোমার অপারেশন করবো আমি। তাছাড়া বুঝতেই পাচ্ছ, তোমার পায়ের প্রতি তার দরদ থাকার কথা নয়।' কী আর বলব, মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি পেয়ে বিস্ময়ে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছি। বললাম, 'স্যার, আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই করুন, আমার বলার আর কিছুই নেই, এখন আপনি শুধু ডাক্তার নন, আমার গার্জিয়ানও।' ঘাড়ে হাত রেখে আমাকে আরেক দফা সাহস জুগিয়ে মেজর সরকার বিদায় নিলেন। দুশ্চিন্তার এক বিরাট পাহাড় যেন আমার বুকের ওপর থেকে নেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। চোখের পাতা আবার ভারি হয়ে এলো।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। টুকটাক শব্দে ঘুম ভাঙল। তাকিয়ে দেখি, রক্ত দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ঠিকঠাক করা হচ্ছে। ব্রেড, জেলি আর হরলিক্স খেলাম, তারপর শুরু হলো রক্ত দেয়া। নার্সদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, কাল অপারেশন হতে পারে। সেই অনুযায়ী আজ রাত থেকে তারা আমাকে প্রস্তুত করবে।

ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে আটটার দিকে। দিন-তারিখের হিসাবে, বুধবার, ১৯ আগস্ট। সাড়ে আটটার দিকে এলেন মেজর সরকার ও এনেস্থেসিয়ার কর্নেল মাথুর। পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ শেষ করে কর্নেল বললেন, সকাল ১০টায় অপারেশন করবেন। চলে গেলেন তারা দু'জন। তিনজন মুক্তিযোদ্ধা এলো আমাকে দেখতে। ওদের কাছ থেকে জানলাম, আরো অনেকে আছে ওয়ার্ডে। মর্টারের স্প্রিন্টার ছিল ওদের সারা গায়ে। এখন মোটামুটি ভালো হওয়ার পথে। একজন বলল, 'আপনার জন্য ভীষণ চিন্তা লাগছে।' আমি কারণ জানতে চাইলে বলল, 'আপনার আগে এই কেবিনটিতে আরো দু'জন পেশেন্টকে দেখেছি আমি, অপারেশনের পর ওরা দু'জনই মারা যায়। রোগীর অবস্থা খুব খারাপ হলে তারা এই কেবিনে রাখে, তাই আপনার জন্য ভাবছি।' হা করে তাকিয়েছিলাম কিছুক্ষণ সরল-সহজ গ্রাম্য মুক্তিযোদ্ধাটির দিকে। বয়সে আমার বড় হলেও মনের দিক থেকে ভীষণ সরল না হলে আমাকে এই মুহূর্তে এই কথাটি বলতে পারতো না সে। তাই রাগ না করে তাকে বললাম, 'আমরা যে বেঁচে আছি, এটাই তো অনেক! আমার এই গুলিটি দু'ইঞ্চি উপরে লাগলে আমি সঙ্গে সঙ্গে মারা যেতাম, কিংবা মর্টারের গোলা এসে যদি সরাসরি তোমার উপরে পড়তো, তাহলে কি করতে? মৃত্যু আমাদের কপালে যেভাবে লেখা আছে, ঠিক সেভাবেই আসবে, এর কোনো পরিবর্তন তুমি-আমি কেউ করতে পারবো না। তবে দোয়া করো আমার জন্য।' নার্স এসে ওদের বের করে দিল আমাকে রেডি করার জন্য।

ট্রলি-বয়রা এসে নিয়ে গেল আমাকে অপারেশন থিয়েটারে। মাস্কের আড়ালে থাকলেও মেজর সরকারকে চিনতে পারলাম শরীরের আকৃতি দেখে। অপারেশন টেবিলে শোয়ানোর পর কর্নেল মাথুর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজকের তারিখটি কত?' আমি তারিখ বললাম, তারপর কালো একটি ছোট রাবারের চাকতিকে কামড়ে ধরতে বললেন। আমি তাই করলাম। তারপর বললেন, চোখটি খোলা রেখে মনে মনে দশ পর্যন্ত গুনতে। রাবারের চাকতিটিকে কামড়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে আমার সব শরীরের ভেতর দিয়ে একটি ঠান্ডা স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে মনে হলো, চোখের পাতা বুজে এলো

আপনা আপনি। তারপর আর কিছু জানি না। মনে হলো-অন্ধকার একটি ঘরে শুয়ে আছি, ভীষণ দুর্বল লাগছিল, খুলতে পারছিলাম না চোখ দুটো। বহু কষ্টে টেনে টেনে চোখের পাতা দুটোকে খালার চেষ্টা করলাম। অন্ধকার কাটতে লাগলো ধীরে ধীরে। বুঝতে পারলাম, শুয়ে আছি বিছানায়, আমার কেবিনে। বাঁ হাতটি আপনা আপনি স্পর্শ করল আমার বাম হাঁটুকে। টের পেলাম, পা কাটা হয়নি। নার্স এসে ঢুকলো। নার্সকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ক'টা বাজে?' সে জানাল, 'সন্ধ্যা সাতটা।' তার মানে প্রায় ন'ঘণ্টা পার হয়েছে ইতোমধ্যে। ছুটে বেরিয়ে গেল সে ডাক্তারকে খবর দিতে।

কিছুক্ষণ পরই এলেন মেজর সরকার, টেনিসের ড্রেস পরা অবস্থায়। খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল তাকে। ঢুকেই বললেন, 'লস্কর, ভাগ্যবান তুমি, পা তোমার কাটতে হবে না, তবে সেলাই করিনি, ঘা শুকানোর আগ পর্যন্ত একদিন পর পর খুলে ব্যান্ডেজ বদলাতে হবে।' আনন্দে আমার চোখে সেদিন পানি এসে গিয়েছিল। তাকে বললাম, 'স্যার, আমার একটি অমূল্য সম্পদ হারিয়ে ফেলেছিলাম চিরদিনের জন্য, আপনি আজ আবার তা ফিরিয়ে দিলেন, আপনার এ দা ...।' আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলতে শুরু করলেন মেজর সরকার, 'চেপে যাও, ধন্যবাদ দিতে চাইলে চেপে যাও, সে সুযোগ তোমার নেই। আমি যা করেছি চাকরির খাতিরে করেছি, আর বাড়তি কিছু করে থাকলে, সেটা আমার নিজের স্বার্থে করেছি, তোমার জন্য নয়।' স্তম্ভিত হয়ে গেলাম তার কথা শুনে। তিনি বুঝতে পারলেন, ব্যাপারটি খোলাসা হয়নি আমার কাছে। বললেন ... 'একজন ভারতীয় বাঙালি নাগরিক হিসেবে আমার দেশকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালোবাসি, এই দেশের জন্য প্রয়োজনে প্রাণও দিতে পারি। কিন্তু জন্মগ্রহণ করেছি আমি বাংলাদেশের ময়মনসিংহে। আমারই জন্মভূমিতে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা চলছে আজ। এই মুহূর্তে দায়িত্ব তোমার চেয়ে আমারও কম নয়, ভারতীয় হিসেবে সে সুযোগ থেকে আজ আমি বঞ্চিত হতে যাচ্ছিলাম। তোমার মাধ্যমে কিঞ্চিৎ সুযোগ পেয়ে বরং আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।' ভীষণ আবেগের সঙ্গে কথাগুলো বলছিলেন মেজর সরকার। বলা শেষ করে থামলেন। রাতের খাবার নিয়ে নার্স এসে ঢুকল কেবিনে। বিদায় নিয়ে চলে গেলেন ডক্টর সরকার। খেতে খেতে ভাবছিলাম, 'স্রষ্টা যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।' এই কথাটির মর্মার্থ প্রায়ই বুঝি না বলে, আমরা স্রষ্টাকে ভুল বুঝি তাঁর আশীর্বাদকে অভিসম্পাত মনে করি। আহত হওয়ার সঙ্গে ভেবেছিলাম, ভাগ্যটা নেহায়েত খারাপ বলে আহত হলাম, আমার পায়ে না লেগে অন্যের পায়েও লাগতে পারত। এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, আমার আহত হওয়ার সময় বিধাতার আশীর্বাদ আমার সঙ্গে ছিল, অপারেশন টেবিলেও ছিল, আজো আছে। আসলে আমরা বুঝতে পারি না, তাই তাঁকে ভুল বুঝি। যুদ্ধক্ষেত্রের পেছনেও যে আরেকটি যুদ্ধ চলছে, আহত না হলে কোনোদিন তা জানতে পারতাম না। খাওয়া শেষ হতেই মর্ফিন দেয়া হলো এক ডোজ। ঘুমের রাজ্যে প্রবেশ করলাম তারপর।

সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙানো হলো পরদিন। মিলিটারি হাসপাতালের নিয়ম অনুযায়ী, স্পঞ্জ-বাথ করানো হলো। শুরু হলো হাসপাতালের রুটিনবাঁধা জীবন, ডাক্তার, নার্স, ওষুধ, ব্যান্ডেজ, ইন্সপেকশন, সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, রাত, ঘুম ...। হাসপাতালের বিছানায় পুরো একটি মাস। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় অতিক্রম করা প্রতিটি

দিনের স্মৃতিকে রোমন্থন করে, তার মাঝ থেকে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেই শেষ করব আজকের স্মৃতিচারণ।

অপারেশনের তিন দিন পর মোটামুটি যখন সুস্থবোধ করা শুরু করেছি, তখন আমাকে দেখতে এলো অন্য মুক্তিযোদ্ধারা। তাদের কাছ থেকে জানলাম, আরো অনেক রয়েছে এই হাসপাতালে। বেশ ক জন পরিচিত মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎ পেলাম। ট্রেনিং শেষ করে বিভিন্ন সেক্টরে চলে গিয়েছিলাম সবাই। কিশোরগঞ্জের মোস্তফা তালুকদারের খবর শুনে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করছিল সে। একটি অপারেশনে তাড়াহুড়োর মাঝে টু-ইঞ্চ মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করতে গিয়ে নব্বুই ডিগ্রিতে সেট করে নাকি ফায়ার করেছিল সে। সঙ্গে ছিল আমারই এক পুরনো বন্ধু মুশফিক। গোলাটি উপরে উঠে আবার সরাসরি নিচে নেমে আসে। নিজেরই গোলার আঘাতে মারা যায় মোস্তফা তালুকদার, মুশফিক আহত হন। এত কম দিনের ট্রেনিং-এ এত কিছু জানা বা মনে রাখা সহজ ব্যাপার নয়। সাহসের অভাব ছিল না, ছিল অভিজ্ঞতার অভাব। অভিজ্ঞ একজন তাদের সঙ্গে থাকলেই এই সাহসী সৈনিকটি বাঁচতে পারতো। জীবন দিয়ে সেদিন অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের। মোস্তফা তালুকদারের এই আত্মহুতির পর ভোলাগঞ্জ সাব-সেক্টর এরকম দুর্ঘটনা আর ঘটেনি। সহকর্মীর প্রাণের বিনিময়ে, বাংলাদেশের প্রতিটি রণাঙ্গনে বহু মুক্তিযোদ্ধাকে সেদিন অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়েছে। বিডিআর এর সুবেদার সিরাজুল ইসলমের সঙ্গে দেখা হলো। ডাউকি সাব-সেক্টরে যুদ্ধরত ছিলেন। শত্রুপক্ষের থ্রি-ইঞ্চ মর্টারের গোলা এসে লাগে তার হাতে ও বুকে। শিলং সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। বয়সে একজন অভিজ্ঞ সৈনিক তিনি। পঁয়ষট্টিতে যুদ্ধ করেছেন ভারতের বিপক্ষে। চারটি আঙুল তার কেটে ফেলেছে ওরা সিভিল হাসপাতালে। বুকের স্প্লিন্টার বের করার জন্য এখানে পাঠানো হয়েছে। বললেন-এই হাসপাতালে প্রথমে এলে চারটা আঙুলই বাঁচানো যেত। তার কাছ থেকে জানলাম, আরো অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে এভাবে মর্জি মাফিক চিকিৎসা করা হচ্ছে সেখানে। যুদ্ধের পেশেন্টদের ট্রিটমেন্ট করার বিশেষ অভিজ্ঞতা এমনিতেই সিভিল হাসপাতালের থাকে না। কিন্তু এই সমস্যাটি দেখার বা মোকাবেলা করার দায়িত্ব আমাদের নেতাদের, যুদ্ধের সংগঠকদের। ভারতীয় প্রশাসনের আমাদের বক্তব্য শোনার কথা নয়। কারণ আমাদের অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে দাফতরিক আলোচনার ভিত্তিতেই এসব ব্যাপার ঠিক হতো তখন। চুক্তি মোতাবেক কাজ হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য আমাদের সরকারের বিভিন্ন লোকজনও নিয়োজিত ছিলেন। আমরা ঠিক করলাম আমাদের কর্মকর্তা কেউ এলে ব্যাপারটি তাদের গোচরে আনবো।

এদিকে আমার ট্রিটমেন্ট এগিয়ে চলছিল ঠিক-ঠাক, কিন্তু একদিন পরপর যখন ড্রেসিং বদলাতে আসত, মারাত্মক একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো তখন। ব্যান্ডেজ খুলে, কাঁচির আগায় গজ পেঁচিয়ে আমার ক্ষতস্থানের গর্তের জমে থাকা পুঁজ পরিষ্কার করতে হতো। পায়ের যন্ত্রণা গিয়ে তখন মগজে উঠতো। সিস্টাররা আমার হাত-পা চেপে ধরত সজোরে, আর আমি চিৎকার করে সারা হাসপাতাল সরগরম করে তুলতাম। পরিষ্কার হয়ে গেলে এক শিশি স্টেপটোমাইসিন পাউডার ঢেলে দিয়ে গর্তে আরেক

টুকরা গজ ঢুকিয়ে আবার ব্যান্ডেজ করে দিত। একটি শিখ সুবেদার এই কাজ করত। কেবিনে ঢুকেই সে সিনেমার ভিলেনদের মতো কাঁচিটাকে তলোয়ারের মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমার সামনে দোলাতো আর আমাকে ক্ষেপাতো। আমি তার চৌদ্দগুষ্ঠী তুলে গাল দিতাম, সে হাসতো। প্রায় পনেরো দিন পর শেষ হলো এই অত্যাচার। শেষ দিনে আমি সুবেদারটির কাছে মাপ চেয়েছিলাম অবশ্য। হাসতে হাসতে সেও ক্ষমতা করেছিল আমাকে। আরেকটি অসুবিধায় পড়েছিলাম অপারেশনের সাত-আট দিন পর। প্রথম দিকে ঘুমের ইনজেকশন দেয়া হতো, কিন্তু ঘুমের ইনজেকশন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ঘুম পালালো চোখ থেকে। অনেক কাকুতি-মিনতির পরও বরাদ্দ হলো না ঘুমের ওষুধ। ব্যবস্থাটি অবশ্য আমার মঙ্গলের জন্যই করা হয়েছিল, এডিকশনের ভয়ে। যাক, ঘা শোকানোর পর শিখ সুবেদারের হাত থেকে মুক্তি পেলাম, কিন্তু ক্ষতস্থানটি সেলাই করার জন্য যখন অন্য আরেকজন নার্স এলো, ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। কোনো পেইনকিলার না দিয়ে সরাসরি সেলাই করলো তারা, যেন এক টুকরা কাপড় সেলাই করছে। এরপর মোটামুটি স্বস্তি ফিরে পেলাম ঘুমের সমস্যাটি ছাড়া। তবে সমস্যাটির সমাধান হলো অন্যভাবে, রাতের শিফটে নতুন এক মাদ্রাজি নার্সের আগমনে। ওয়ার্ডে ডিউটি শেষ করে নার্সটি চলে আসতো আমার কেবিনে। যুদ্ধের গল্প শুনতো সে আমার কাছে, তার নিজের গল্প করতো, কফি খাওয়াতো। ওর সঙ্গে গল্প করাটা একটা রুটিনে দাঁড়ালো এক সময়। প্রতি রাতে গল্প করতে করতে টায়ার্ড হয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম, সে চলে যেত। একরাতে অনডিউটি একজন তরুণ ডাক্তার আমাদের দু'জনকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কি ব্যাপার, তোমরা দু'জনে কি প্রেমে পড়ে গেলে?' নার্সটির নাম ছিল 'ললিতা'।

একদিন বিকেলে একজন মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে এলেন মেজর সরকার। গোলার আঘাতে তার ডান হাতের কব্জি পর্যন্ত উড়ে গেছে, কনুই পর্যন্ত হাড্ডি বাঁশের মতো ফেটে গিয়ে সেখানে আবার পুঁজ সৃষ্টি হয়েছে। কেবিনে ঢুকতেই দুর্গন্ধ পেলাম নাকে। সরকার বললেন, গ্যাংরিন শুরু হয়েছে, এখন তার হাতটি কেটে ফেলতে হবে, কনুই-এর একটু উপরে, তা না হলে সব শরীরে ছড়িয়ে পড়বে গ্যাংরিন, কিন্তু সে কোনো অবস্থাতেই হাত কাটতে নারাজ। সরকার বললেন তাকে বোঝাতে। ওর হাতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটি আঙুলও বাকি নেই, শুধু কিছু গুঁড়ো হাড় রয়েছে সেখানে। মেজর সরকারের পরিচয় দিলাম তাকে, বললাম তার প্রাণ বাঁচাতে হলে এইটুকু কাটতেই হবে, অপারেশন বন্ডে টিপসই না দিলেও ডাক্তাররা কেটে ফেলবে তার ভালোর জন্যই। আমার কথা শুনে প্রচুর কাঁদলো, কোনো অবস্থাতেই হাতটি বাঁচানো যাবে না জেনে শেষ পর্যন্ত রাজি হলো সে। দেশের জন্য সজ্ঞানে অগণিত মুক্তিযোদ্ধা সেদিন নিজ হাতে তাদের হাত-পা কাটার অনুমতি দিয়েছিল এভাবেই। ওদের নাম দেয়া হয়েছে আজ পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা।

আমার হাসপাতালের দিন ফুরোতে লাগল। পায়ে কোনো ব্যথা নেই, ক্ষতস্থানে ঘুষি মেরে দেখলেন মেজর সরকার, কোনো ব্যথা নেই। কিন্তু বিছানা ছেড়ে হাঁটতে গিয়ে পড়ে গেলাম আমি। সকাল-বিকেল ফিজিওথেরাপি শুরু হলো এবার। হুইল চেয়ারে বসে থেরাপি

দিতে যেতাম রোজ দু'বার। বিভিন্ন ওয়ার্ডে যাওয়ার অনুমতি পাওয়াতে আরো লাভ হলো। নতুন অনেকের সঙ্গে দেখা হলো। আরেকটি মারাত্মক সমস্যার খবর পেলাম সহযোদ্ধাদের সঙ্গে আলাপ করে। মুক্তিযোদ্ধারা মাসিক ভাতা পেতো হাতখরচের জন্য, যে টাকা দিয়ে বিড়ি-সিগারেট কিনতে পারতো তারা। আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর, এই টাকা তাদের হাতে আসতো না। যার যার সেক্টরের ঠিকানায় তাদের না পেয়ে টাকাগুলো ফেরত চলে যেতো হেডকোয়ার্টারে। প্রায় সবার পকেট খালি। আমার নিজেরও হতো এই সমস্যা যদি ডি সুজা সমাধান না করে যেতো। ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছু সাহায্য করলাম কয়েকজনকে সিগারেট দিয়ে, কিন্তু পাছে আমার কম পড়ে সেই ভয়ে খুব সাবধানে কাজটি করতাম, অর্থাৎ যাকে না দিলেই নয় এম কাউকেই শুধু দিতাম। হাসপাতালের একজন ডাক্তারের কাছ থেকে আরেকটি পরামর্শ পেলাম, ভদ্রলোকটি বললেন, 'তোমাদের যুদ্ধের প্রতিটি সেক্টরের সফল অপারেশনের খবরাদি, আন্তর্জাতিক বিশ্বে তোমাদের যুদ্ধ সম্পর্কে যেসব পজেটিভ কাজ হচ্ছে, নিশ্চয়ই এইসব খবর সংবলিত কোনো পত্রিকা কোথাও বেরুচ্ছে, কিন্তু আমরা জানি না-জানলে হয়ত আমরাই আনিয়ে দিতাম। আমাদের পত্রিকায় মাঝে মধ্যে বের হলেও খুব ছোট করে বের হয়। রেগুলার এই কাগজটি সরবরাহ করলে পেশেন্টদের মানসিক সাহায্য হতো প্রচুর।' মূল্যবান একটি পরামর্শ, কিন্তু সমাধান পেলাম না খুঁজে অনেক ভাবনাচিন্তার পরও।

আরো দু'তিন দিন থেরাপি দেওয়ার পর, দেখা গেল আমার পায়ের কোনও উন্নতি হচ্ছে না। একজন বোনস্পেশিয়েলিস্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে। ভদ্রলোক আমার হাঁটু ধরে একটু ঝাড়া দিয়েই বললেন, 'নি জয়েন্টের একটি লিগামেন্ট হয়ত ছিঁড়ে গেছে তোমার।' পরদিন এক্সরে করার পর দেখা গেল ঠিকই ছিল তার ধারণা। উরুতে গুলি লাগার পরিণামে হাঁটুর নার্ভ ছিড়ে যাওয়ার ব্যাপারটি আমার মাথায় না ঢুকলেও বাস্তবে তাই ঘটলো। ডাক্তার বললেন, 'ক্র্যাচ নিয়ে হাঁটতে হবে কিছুদিন, তারপর আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। ভয়ের কোনো কারণ নেই, ফুটবল প্লেয়ারদের প্রায়ই এই লিগামেন্ট নামক বস্তুটি ছিঁড়ে থাকে।' আরো দু'তিন দিন কিছু বিশেষ এক্সারসাইজ দেখিয়ে দিয়ে আমাকে রিলিজ দেয়া যাবে, বললেন তিনি।

পরদিন থেরাপি রুমে যাওয়ার আগে নার্স এসে জানাল, 'তোমাদের বাংলাদেশের খুব বড় তিনজন কর্মকর্তা এসেছেন।' শুনে খুব খুশি হলাম। আমার হুইল চেয়ারটি ঠেলতে ঠেলতে গেলাম ওয়ার্ডে তাদের সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখলাম, ব্যারিস্টার মুস্তাকিম চৌধুরী, যিনি আমাদের ওই পুরো অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, কয়েছ চৌধুরী, যিনি তখন আমাদের সেক্টরের চিফ কো-অর্ডিনেটরের দায়িত্বে ছিলেন, ডা. টি হোসেন অথবা আলি, নামটি আমার ঠিক মনে পড়ছে না, তবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নামকরা চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন তিনি-তাদের সঙ্গে ইন্ডিয়ান আর্মির বড় অফিসাররাও রয়েছেন। আমাদের সমস্যাদি আছে কি না জানতে চাইলেন। আমি তখন মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে প্রথমেই আমাদের পঞ্চাশ টাকা ভাতা ফ্রন্টে গিয়ে কীভাবে ফেরত আসছে এবং এর ফলে কী সমস্যা হচ্ছে, তাদের জানালাম, মুক্তিযুদ্ধের খবর সংবলিত পত্রিকার কথা বললাম, সিভিল হাসপাতালের খামখেয়ালিপনার কথা উত্থাপন করলাম এবং সবশেষে আরো একটি মারাত্মক সমস্যার কথা বললাম, সেটি হচ্ছে-আমরা যারা, এখানে

আহত হয়ে আসি, আমাদের শরীরের সব কাপড় কেটে ফেলা হয়, রিলিজ হবার দিনে সমস্যা দেখা দেয়, কারণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পক্ষে কাপড় দেয়া সম্ভব নয়, যে সমস্যাটি আমার বেলায় ঘটতে যাচ্ছে এ দু'তিন দিনের মধ্যে, তাছাড়া আরেকটি বাড়তি সমস্যা আমার বেলা ঘটবে, সেটি হচ্ছে, আমার একটি ক্র্যাচও লাগবে। সহযোদ্ধারা বাকি সবাই আমার উত্থাপিত দাবিগুলো সমর্থন করল। নেতৃবৃন্দ খুব মনোযোগ সহকারে আমাদের অভাব-অভিযোগ শুনলেন, প্রয়োজনীয় নোট নিলেন ডায়রিতে, পরিশেষে জানালেন অতিসত্বর প্রতিটি সমস্যার সমাধান করা হবে। আমার মতো যারা দু'চার দিনের মধ্যে রিলিজ হবে, তাদের সমস্যা কালপরশুর মধ্যেই করা হবে, এই আশ্বাস দিয়ে তারা আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সমস্যাগুলো সমাধান হওয়ার আনন্দে আমরা সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

এই নেতাদের সঙ্গে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আর কোনোদিন দেখা হয়নি, আমার সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি তাদের মাধ্যমে, এটুকু হলফ করে বলতে পারি। বাকিদের হয়েছিল কিনা, আমি জানি না। ভারতীয় এক সেবা সংস্থার দানকৃত ক্র্যাচ আর কাপড় পরে আমাকে হাসপাতাল থেকে বেরোতে হয়েছিল সেদিন।

মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে আজ পঁয়ত্রিশ বছর। কিন্তু বইয়াখাউরি গ্রামের রক্ষণশীল পরিবারের সেই মহিলা, যিনি মাতৃস্নেহে সেদিন আমার মুখে এককাপ গরম দুধ তুলে দিয়েছিলেন, প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে যে মাঝিরা রাতের অন্ধকারে করছার হাওর পাড়ি দিয়েছিল আমাকে নিয়ে, মাইলের পর মাইল পথ কাঁধে করে যারা সেদিন রিক্রুটিং ক্যাম্পে আমাকে পৌছে দিয়েছিল, অথবা গ্রামডাক্তার আনিছ মিয়া, যার প্রাথমিক চিকিৎসা না পেলে হয়ত রাস্তাতেই মরতে হতো আমাকে, তাদের কারোর অবদান একজন মুক্তিযোদ্ধার চেয়ে কি কম ছিল? বিগত পঁয়ত্রিশটি বছরে তাদের কাছ থেকে 'ধার পাওয়া' এই যাপিত জীবনে আমি নিজে তাদের ক'বার স্মরণ করেছি? ক'জনকে জানিয়েছি তাদের কথা? অথচ তাদের মাধ্যমেই সেদিন আমি নতুন জীবন লাভ করেছিলাম। এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণাঙ্গ ছবিটি রয়ে যাচ্ছে আজ আমাদের দৃষ্টি সীমানার আড়ালে। তাই আজ লেখাটি শেষ করার আগে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সমগ্র বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ জনপদের অগণিত অনুপ্রাণকদের, যাদের অফুরানে স্নেহ আর ঝুঁকিময় সহায়তা ছাড়া কোনো ক্রমেই মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে দেশের প্রত্যন্ত এলাকার অভিযানকে সফল করা সম্ভব হতো না। স্মরণ করছি, সেই মা-বোনদের, যারা সেদিন আনাত্মীয় অপরিচিত মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের বাড়িতে, পরম যত্নে খাইয়েছিলেন তাদের, সেবাশুশ্রূষা করেছিলেন অসুস্থ এবং আহতদের। সেই মা-বোনদের শিরা-উপশিরায় প্রবহমান রক্তকণিকা থেকেই জন্ম নিয়েছেন আজকের প্রজন্মের যুবক-যুবতীরা। তারা যদি আজ তাদের মা-বোন, বাবা-ভাইদের সেই অকৃত্রিম ও অকৃপণ প্রেম, স্নেহ, ভালোবাসা এবং সাহসকে সঠিকভাবে বিচার ও যাচাই করতে সক্ষম হন; স্বদেশপ্রেম আর আত্মত্যাগের মানবতাবাদী এই চেতনাগুলোকে যদি আজ সম্মান জানাতে সক্ষম হন; মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতাকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে কোনো অসুবিধা হবে না তখন আর। স্বাধীনতার শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হবে চিরতরে, 'এই' প্রজন্মেরই হাতে।

রচনাকাল ১৯৯০

২৬ মার্চ ছিল যুদ্ধে নামার দিন

কর্নেল মোহাম্মদ আব্দুস সালাম (অব.), বীর প্রতীক

ঢাকায় তৎকালীন জিন্নাহ্ কলেজের (বর্তমানে তিতুমির কলেজ) একজন স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। নিজ কর্মতৎপরতার জন্য তৎকালীন জিন্নাহ কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকা কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের একজন কর্মতৎপর সদস্য ছিলাম। ৩ মার্চ এবং ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সভায় উপস্থিত থাকারও সুযোগ হয়েছিল। তৎকালীন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কিছুসংখ্যক ছাত্র নেতাদের নিজ নিজ জেলাতে গিয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন এবং প্রয়োজনে সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য পাঠানো হয়। আমাকে নিজ শহর সিলেটে গিয়ে এ দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়। প্রতি জেলাতেই আলাদাভাবে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ছিল। আমরা বিশেষ করে গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বে নিয়োজিত ছিলাম। সপ্তাহ ২/১ কাজীটুলার টিলার পেছনে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমরা কয়েকজন। জিন্দাবাজারের এক বাসায় বসে আমরা গানপাউডার / মলটভ ককটেল / বোমা তৈরি কাজে নিয়োজিত ছিলাম। এমতাবস্থায় দ্রুত পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি আমাদের চিন্তিত করে তোলে এবং প্রস্তুতিপর্বে যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা আসে।

এমনি এক সময় ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০ টার সময় আমার বড়ভাই মরহুম আবদুর রব সিলেট শহর থেকে আমাদের এয়ারপোর্ট রোড, চৌকিদেখীর বাসায় আসেন। তড়িঘড়ি করে বলতে থাকেন, শহরের অবস্থা বিপজ্জনক, অস্বাভাবিকভাবে সামরিক বাহিনীর গাড়ি চলাচল করতে দেখা যাচ্ছে। ইয়াহিয়া খান ভাষণ দিয়েছেন। খবর শুনেই আমি ও আমার বড়ভাই শহরের দিকে আমার সবচেয়ে বড়ভাই মরহুম আবদুল হাই-এর কালীঘাটের বাসায় গেলাম। সেখানে আমার আরেক ভাই মোঃ আবদুল বাসিত-এর সঙ্গেও দেখা হয়। তিনি তখন সিলেটের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদেরও একজন সক্রিয় সদস্য। আমরা আমাদের নিজস্ব দু'টি শটগান নিয়ে গাড়িতে করে প্রথমেই দেওয়ান ফরিদ গাজী এমপির বাসায় যাই। দেওয়ান ফরিদ গাজী তখন সিলেটের রাজনৈতিক দলগুলো অসহযোগ আন্দোলনের প্রধান সমন্নয়কারী। রাত সাড়ে ১১ টার দিকে তার বাসায় গিয়ে শুনতে পাই, তিনি গাড়ি নিয়ে বের হয়েছেন। তাকে না পেয়ে আমরা আর একজন এমপির বাসায় যাই। তাকেও বাসায় পাওয়া যায়নি। শহরের পরিস্থিতি দেখার জন্য আমরা শহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরাফেরা করি। কিন্তু

রাস্তা প্রায় জনশূন্য এবং সামরিক বাহিনীর লোকজন থামায় এবং ঘোরাফেরা না করার জন্য সতর্ক করে দেয়। সিদ্ধান্ত হয় আমাকে সিলেট মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে নামিয়ে দিয়ে আমার ভাইরা সবাই কালীঘাটে আমার বড়ভাইয়ের বাসায় গিয়ে অপেক্ষা করবেন এবং আমি তাদের সঙ্গে পরে যোগাযোগ করবো।

অসহযোগ আন্দোলনে শহরে অবস্থিত সিলেট মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা তুলনামূলকভাবে অনেক তৎপর ছিল। আমি প্রায়ই মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে যেতাম এবং ডা. দেলোয়ার (রানা), ডা. নজরুল ইসলাম, ডা. আহাদসহ অনেকে কীভাবে অসহযোগ আন্দোলনে আরো গতিসঞ্চার করা যায় এবং সশস্ত্র বিপ্লব-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রায়ই মিটিং এবং আলোচনা করতাম। আমরা বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তাই সিলেট মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে গিয়ে আমি সবাইকে একসঙ্গে আলোচনায় পাই এবং কী করণীয় ভাবতে থাকি। হঠাৎ পুলিশ রিজার্ভ লাইন যা মেডিকেল কলেজের স্টাফ কোয়ার্টারের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত, সেখান থেকে একজন বেসামরিক ব্যক্তি হয়তবা বাবুর্চি বা মালি এসে জানায় যে সামরিক বাহিনী পুলিশ লাইনের চতুর্দিকে অবস্থান নিচ্ছে এবং পুলিশরা ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। হোষ্টেলের ছাত্রদের তাদের সাহায্য করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে পাঠিয়েছে রিজার্ভ লাইনের ইন্সপেক্টর। খবর শুনেই আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আমাদের যেভাবেই হোক শটগান, বন্দুক, বল্লম ইত্যাদি নিয়ে লোক জড়ো করে প্রতিরোধ গড়তে হবে। আমি, ডা. দেলোয়ার রানা, ডা. বুলু একটি অ্যামবুলেন্স নিয়ে বের হই; কেননা ইতোমধ্যে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা বেসামরিক গাড়ি চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। ডা. দেলোয়ার রানাসহ আমরা আবারো দেওয়ান ফরিদ গাজীর বাসায় যাই, কিন্তু তার কোনো সন্ধান পাইনি। সিলেট মেডিকেল কলেজের তৎকালীন সার্জারির প্রফেসর শহীদ ডা. শামসুদ্দিন আহমদ যিনি তৎকালীন মেডিকেল কলেজের ছাত্র-শিক্ষক সবারই একজন প্রিয় ব্যক্তিত্ব এবং সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একজন দিকনির্দেশক ও উপদেষ্টা এবং সংগ্রামের চেতনার প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে আসছিলেন, ডা. দেলোয়ার রানা তার বাসায় যাওয়ার জন্য প্রস্তাব করেন। আমিও সে প্রস্তাবে রাজি হই। কারণ আমি জানি যে আমার বন্ধু ডা. জিয়াউদ্দিন আহমদ (তখন মেডিকেল কলেজের ছাত্র)-এর সঙ্গে দেখা হবে এবং তাকেও আমাদের সঙ্গে পাবো এবং আমি জানতাম তার কাছে থেকে শটগান এবং কিছু গুলিও সংগ্রহ করা যাবে। আমরা আনুমানিক রাত সাড়ে ১২ টার সময় প্রফেসর শামসুদ্দিন আহমদের বাসায় যাই। প্রফেসর শামসুদ্দিন আহমদ ঘুম থেকে উঠে আসেন এবং আমাদের বসতে বলেন। তিনি আমাদের কাছে থেকে বিস্তারিত পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবগত হন। তখন তাকে ভীষণ ভারাক্রান্ত বলে মনে হয়। তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'এই অবস্থায় তোমরা খালি হাতে কী করবে? ওদের সঙ্গে লড়াই করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব। যাই হোক সাবধানে চলাফেরা কর এবং সকালে আমি ভেবে দেখি কী করা যায়।' আমি তার কাছে আমাদের কিছু বন্দুকের গুলি দিতে অনুরোধ করি। তিনি কোনো কথা না বলে দুই বাক্স শটগানের গুলি এনে আমাকে দিয়ে খুব সাবধানে থাকতে উপদেশ দিলেন। সেদিন আমি জানতাম না যে, আমাদের পরম

শ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তিকে কর্মরত অবস্থায় ৯ এপ্রিল তার সহকর্মী ডা. লালা, অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার সোহরাবসহ মোট ৭ জনকে বর্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনী হাসপাতালে ঢুকে সার্জারি ওয়ার্ড থেকে বের করে লাইন দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করবে। তার সঙ্গে আমার এটাই ছিল শেষ দেখা। তার অবদানের কথা এ জাতি কোনো দিনই ভুলবে না। অসহায় অবস্থায় আমাদের সবার চোখে তখন পানি।

তবুও কিছু একটা করতে হবে। যে কোনো অবস্থায় পাকিস্তানি সেনাদের মোকাবেলা করতে হবে। আমরা তার বাসা থেকে বের হয়ে সিদ্ধান্ত নিলাম আবার আমরা মেডিকেল কলেজের হোস্টেলে গিয়ে পুলিশ লাইনের চতুর্দিকে অবস্থান গ্রহণ করবো। সিলেট পুলিশ লাইনের উত্তর-পূর্ব দিকে মিরের ময়দান এবং মেডিকেল কলেজের স্টাফ কোয়ার্টার এলাকায় ৪/৫টি শটগান নিয়ে আমরা ১০/১৫ জন অবস্থান গ্রহণ করি। রাত প্রায় ১.৩০ টার সময় পুলিশ লাইনের পুলিশরা সাহস পায়। কিন্তু ঘন্টাখানেক-এর মধ্যে জানা যায়, সিলেট রিজার্ভ পুলিশ লাইনের সবাইকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। ২/১ জন পুলিশের সদস্য ভয়ে বেসামরিক পোশাকে পেছন দিয়ে পালিয়ে এসে আমাদের খবর জানায়। আমি তখন এডভোকেট মুশতাক এবং জহিন আহমদ চৌধুরীর বাসার পেছনে বন্দুক হাতে অবস্থান নেই এবং অন্যদের সঙ্গে আলাপ করে সাধারণ জনগণকে পরিস্থিতি জানানোর সিদ্ধান্ত নেই। আমরা যখন মধ্যরাতে বিভিন্ন পাড়ায় যাই তখন বুঝতে পারি, অনেক লোকজন নিজ নিজ বাসায় জেগে আছে, কিন্তু ভয়ে কেউই দরজা খুলছে না। আমি ডা. দেলেয়োরের সঙ্গে আলাপ করে ডা. বুলুকে সঙ্গে নিয়ে একটি অ্যাম্বুলেন্সে করে আমার এলাকায় যাই এবং আমাদের এলাকার মেম্বার মরহুম হামিদ মিয়ার বাড়িতে গিয়ে কথা বলি। হামিদ মিয়া, খালেক, সাত্তারসহ তার বাড়ির এলাকায় ছিলেন এবং তারাও আমাকে দেখে আমার সঙ্গে যোগ দেন। আমরা পাড়ার লোকজনকে নিয়ে মিছিল করার জন্য সিদ্ধান্ত নেই। তখন হামিদ মিয়া বলেন, চা বাগান ছাড়া এতরাতে কোনো লোক পাওয়া যাবে না। লেবার বস্তিতে একজন চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করি আমরা বস্তির লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। সে বলে এত রাতে পাগলা ঘন্টা ছাড়া কেউ আসবে না। লেবার বস্তিতে একটি ঘন্টা ঝুলানো অবস্থায় থাকে, যে কোন বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে এই ঘন্টা বাজানো হয় এবং লেবাররা সাধারণত তীর/বল্লম নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসে। আমরা তাৎক্ষণিকভাবে পাগলা ঘন্টা বাজালাম এবং প্রায় ১৫০ লেবার দাও/বল্লম এবং তীর ধনুক নিয়ে বের হয়ে আসে। সবাই তাদের পূজাঘরের কাছে আসলে আমি অতি সংক্ষেপে এক বক্তৃতা করি এবং সব পরিস্থিতি সম্বন্ধে সবাইকে অবগত করি। তাদের আমাদের সঙ্গে সব হাতিয়ার নিয়ে শহরের দিকে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানাই। তারা সবাই সম্মত হয় এবং প্রায় ভোর ৫ টার সময় আমরা মিছিল করে লাক্কাতুরা হতে আম্বরখানা হয়ে চৌহাট্টায় যাই। কিন্তু অন্য কোনো পাড়া বা এলাকা থেকে কোনো মিছিল বা লোকজন আসতে দেখা যায়নি।

আমরা প্রায় দু'শতাধিক লোক যখন চৌহাট্টায় পৌঁছাই তখন মহিলা কলেজের সম্মুখে সেনাবাহিনী এক লাইনে দাড়িয়ে রাস্তার ওপর ফায়ারিং পজিশন নেয়। আমি

তখন সবাইকে সাবধান করি, কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি গ্রহণের আগেই তারা মিছিল লক্ষ্য করে গোলাগুলি শুরু করে। ২/৩ জন শ্রমিক আহত হয় এবং আমরা তাড়াতাড়ি করে সদর হাসপাতালের ভেতরে ঢুকে পড়ি। কিছুসংখ্যক লোক সেন্ট্রাল ফার্মেসির পেছনের পিচ্ছিল গলি দিয়ে পালিয়ে যায় এবং কিছুসংখ্যক লোক মাদ্রাসার নিরাপদ এলাকায় ঢুকে পড়ে। সিলেট শহরে সেনাবাহিনী প্রথম গুলিবর্ষণ করে এই মিছিলের ওপর। আমরা আমদের শটগান ও গোলাবারুদসহ হাসপাতালে ঢুকে পড়ি, তখন কর্মরত ডাক্তার ও কর্মচারীরা আমাদের অস্ত্র-সস্ত্র বাথরুমে ছাদের ওপর লুকিয়ে রেখে দেয় এবং আমরা হাসপাতালে অবস্থান করি।

ইতোমধ্যে পাক সেনাবাহিনীর সদস্যরা সব হাসপাতাল ঘেরাও করে রাখে এবং শহরে কারফিউ থাকার জন্য লোকজন রাস্তায় বের হতে পারেনি। আমরা পরিস্থিতি জানার জন্য হাসপাতাল এলাকায় লুকিয়ে থাকি এবং আনুমানিক ২৬ মার্চ সাড়ে ১০ টার সময় হাসপাতাল থেকে গোপনে বের হয়ে হযরত শাহজালালের (রঃ) দরগার ভেতর দিয়ে নিজ বাসায় ফিরে আসি এবং অন্যদের নিজ নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেই। আহত শ্রমিকদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরদিনও কারফিউ থাকার জন্য আমরা গোপন রাস্তা দিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে মিটিং করে করণীয় নিয়ে আলোচনা করি। ২/৩ দিন পর আমরা সিদ্ধান্ত নেই যে আমাদের অস্ত্র সংগ্রহ এবং সশস্ত্র যুদ্ধ ছাড়া কিছুই করা সম্ভব হবে না, এমনই এক মুহূর্তে চট্টগ্রামে কালুরঘাট রেডিও স্টেশন থেকে মেজর জিয়াউর রহমানের বক্তৃতা শুনে আমি, ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ, আনিস, ডা. বুলুসহ কয়েকজন সিদ্ধান্ত নেই, আমরা ভারতে পালিয়ে গিয়ে গোপনে অস্ত্র সংগ্রহ করে বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে যুদ্ধে যোগ দেব। ২৮ মার্চ শহর থেকে আমি, ডা. জিয়াউদ্দিন আহমেদ সাদেক, ডা. বুলু এবং আনিস আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাই এবং পরে ভারত হয়ে তেলিয়াপাড়ায় গিয়ে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করি। লে. কর্নেল মোহাম্মদ আবদুর রব আমাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য তেলিয়াপাড়ায় নিয়ে যান।

তারপরের ইতিহাস আরেক উপাখ্যান।

রচনাকাল ২০০৬

শিবপুর মুক্তিযুদ্ধের এক সশস্ত্র ঘাঁটি

হায়দার আনোয়ার খান জুনো

একাত্তরের বেশ আগে থেকেই শিবপুর বামপন্থীদের একটা শক্তিশালী ঘাঁটি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। মান্নান ভূঁইয়ার নেতৃত্বে সেখানে জঙ্গি কৃষক সংগঠন গড়ে উঠেছিল। শিবপুরে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নও খুব শক্তিশালী ছিল। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে শিবপুর যথেষ্ট অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। ঊনসত্তরের শহীদ আসাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকা অবস্থাতেই শিবপুরের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিলেন।

একাত্তরের পঁচিশ মার্চ যখন পাক হানাদার বাহিনী নিরীহ জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন এ হিংস্র হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মানসিক প্রস্তুতির কোনো অভাব ছিল না শিবপুরের বামপন্থীদের। একাত্তরের পঁচিশে মার্চের পরপরই এপ্রিলের এক-দুই তারিখে পাঁচদোনায় ইপিআর এবং বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের সঙ্গে পাক হানাদার বাহিনীর সংঘর্ষ হয়। বাঙালি সৈনিকরা খুব একটা সংগঠিত না থাকায় দু'দিন পর্যন্ত আক্রমণ প্রতিহত করে শেষ পর্যন্ত পিছু হটতে বাধ্য হয়। এরপর ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে চলে যায়। তারা এতই পরিশ্রান্ত ছিল যে, যাওয়ার পথে বেশকিছু অস্ত্রশস্ত্র পথে ফেলে যায়। এসব অস্ত্র আমরা সংগ্রহ করি এবং আমাদের যুদ্ধে কাজে লাগাই।

প্রাথমিক অবস্থায় শিবপুর থানার রাইফেল দিয়েই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এ ট্রেনিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন হারিস মোল্লা এবং ছুটি কাটাতে দেশে আসা বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার মজনু মৃধা। সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি পর্বে সার্বিক কর্মকাণ্ডে মান্নান ভূঁইয়ার সঙ্গে নেতৃত্ব দেন তোফাজ্জল হোসেন, মান্নান খান, আওলাদ হোসেন, আবদুল আলী মৃধা, কালা মিয়া, ঝিনুক খান প্রমুখ।

প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা প্রকাশ্যে করা হলেও যখন শিবপুর থানা সদরে পাক বাহিনী এসে স্থায়ী ক্যাম্প বসায়, তখন অভ্যন্তরের পাহাড়ি এলাকায় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়। তাছাড়া এপ্রিল মাসের শেষদিকে আগরতলায় অবস্থিত বাঙালি সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপিত হয়। নির্ভয়পুর ক্যাম্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত ক্যাপ্টেন মাহবুবের সহযোগিতায় সেখানে শিবপুরের কিছু কর্মীর কয়েক দফা ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

দীর্ঘ নয় মাসের শিবপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে পাক বাহিনীর সঙ্গে ছোট-বড় অনেক সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। এসব সংঘর্ষের মূল পরিকল্পনা ও নেতৃত্বে ছিলেন মজনু মৃধা,

মান্নান খান, তোফাজ্জল হোসেন, আওলাদ হোসেন, ঝিনুক খান, আবদুল আলী মৃধা প্রমুখ। প্রথম বড় আকারের সংঘর্ষটি হয় ১৩ আগস্ট নরসিংদী-শিবপুর রাস্তার ওপর পুটিয়া বাজারে। নরসিংদী ছিল পাক হানাদার বাহিনীর শক্তিশালী ঘাঁটি। সেখান থেকেই তারা প্রায়ই শিবপুরে আসতো। তাদের ঘন ঘন শিবপুরে আসা বন্ধ করার লক্ষে পুটিয়া ব্রিজ ধ্বংসের পরিকল্পনা নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী ভোরবেলা বিস্ফোরকের সাহায্যে ব্রিজের একটা অংশ উড়িয়ে দিয়ে আমাদের যোদ্ধারা অপেক্ষা করতে থাকে পাক বাহিনীর জন্য।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর পাক বাহিনীর একটা বড় দল এসে আমাদের যোদ্ধাদের ওপর আক্রমণ চালায়। প্রায় এক ঘণ্টা প্রচণ্ড যুদ্ধের পর পাক বাহিনী একজন ক্যাপ্টেনসহ প্রায় ত্রিশজনের মৃতদেহ রেখে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। আমরা হারাই আমাদের তরুণ যোদ্ধা ফজলুকে। শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহীদ।

শিবপুরের মুক্তিযুদ্ধের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমত শিবপুর এলাকায় কোনো রাজাকারের অস্তিত্ব ছিল না। নয় মাসে কোনো খুন বা ডাকাতি সংঘটিত হয়নি। জনগণের ওপর অত্যাচার করে কোনো প্রকার টাকা-পয়সা বা খাবার আদায় করা হয়নি। ক্যাম্পগুলোতে খাওয়া-দাওয়ার বেশ কষ্ট ছিল। খাওয়া-দাওয়ার যত সংকটই থাক, মান্নান ভূঁইয়ার কঠোর নির্দেশ ছিল, কোনো ক্যাম্পের জন্য আলাদাভাবে কিছুই সংগ্রহ করা যাবে না। কেন্দ্রীয়ভাবেই চাল, ডাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করা হতো।

বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চল সবসময়ই মুক্ত ছিল। এসব এলাকার প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করত আমাদের মুক্তিবাহিনী। ছোটখাটো বিচার-আচার স্থানীয়ভাবেই করা হতো। বড় কোনো সমস্যা দেখা দিলে হেড কোয়ার্টার থেকে মান্নান ভূঁইয়া কাউকে পাঠিয়ে তার সমাধান করতেন।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে পাক বাহিনীর ওপর একটা বড় ধরনের অ্যাম্বুশের পরিকল্পনা নেয়া হয়। নরসিংদী থেকে শিবপুর আসার পথে পুটিয়া বাজারের এক মাইল উত্তরে শাসপর চৌরাস্তা। চব্বিশে সেপ্টেম্বর মান্নান খানের নেতৃত্বে একটা বড় দল চৌরাস্তার দুই প্রান্তে সারারাত অবস্থান নিয়ে বসে থাকে। মান্নান খানের দলকে সাহায্য করার জন্য মজনু মৃধার নেতৃত্বে আর একটা দল চন্দরদিয়া পুলের কাছে অবস্থান নেয়। এই দলের দায়িত্ব ছিল দুটো। প্রথমত মান্নান খানের দল বিপদে পড়লে পাক বাহিনীকে পেছন থেকে আক্রমণ করা। দ্বিতীয়ত যদি পাক বাহিনী আক্রান্ত হয়ে চন্দরদিয়া দিয়ে পালাতে থাকে তবে তাদের সেখানে আক্রমণ করা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী দু'দলই যার যার অবস্থানে সারারাত বসে থাকে; কিন্তু সম্ভবত আমাদের এ অবস্থানের কথা পাক বাহিনী আগেই জেনে যায়। তারা শাসপুরের রাস্তায় না এসে ভোরবেলা হঠাৎ করে চন্দরদিয়ায় অবস্থানরত মজনু মৃধার দলকে পেছন থেকে আক্রমণ করে বসে।

এই অতর্কিত আক্রমণে প্রথম হকচকিয়ে গেলেও পরে মজনু মৃধা, আবদুল আলী মৃধা, আমজাদ, মানিক, ইদ্রিস, নজরুল ও অন্যরা অসীম সাহসের সঙ্গে পাক বাহিনীর

আক্রমণ মোকাবেলা করতে থাকে। আমজাদের রাইফেলের গুলি একটা আর্মির ট্রাকের ড্রাইভারকে বিদ্ধ করে। ফলে নিয়ন্ত্রণহীন ট্রাকটা রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে এবং চারজন সৈন্য নিহত হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মজনু মৃধার দলের ওপর পাক বাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর হতে থাকে।

এক সময় মজনু মৃধা তার দলকে পিছু হটতে নির্দেশ দেন। পিছু হটতে গিয়ে প্রথমেই গুলিবিদ্ধ হয় মানিক। তার একটু পরেই ইদ্রিসের গুলি লাগে। মজনু মৃধার দল আক্রান্ত হয়েছে শুনে মান্নান খান তার দলবলসহ ছুটতে ছুটতে চন্দরদিয়ায় এসে পৌঁছায়। এ অবস্থায় মজনু মৃধা তার সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলেন এবং অসীম সাহসিকতার সঙ্গে এসএমজি দিয়ে গুলি করতে করতে আবার পাক বাহিনীর দিকে এগিয়ে যান। তাকে পেছন থেকে কভার দিতে থাকে মান্নান খান, আমজাদ আর আব্দুল আলী মৃধা।

যুদ্ধের এক পর্যায়ে পাক বাহিনী ও আমাদের যোদ্ধারা রাস্তার এপারে আর ওপারে মুখোমুখি অবস্থানে চলে আসে। পাক বাহিনী চিৎকার করতে থাকে, 'সবকো জিন্দা পাকড়ো। মজনুকো পাকড়ো'। ইতিমধ্যে মজনু মৃধাসহ বেশ কয়েকজনের গুলি ফুরিয়ে যায়। তখন আমজাদ, নজরুল ও আব্দুল আলী মৃধা একটা-দুটো গুলি ছুড়ে কভার দিতে থাকে। আর বাকিরা পিছিয়ে আসে। প্রায় শেষ পর্যায়ে আমজাদের পায়ে গুলি লাগে। আব্দুল আলী মৃধার সাহায্যে আমজাদ পালিয়ে আসতে পারলেও নজরুল পাক বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে।

এই যুদ্ধে আমরা হারালাম আমাদের দুই সাহসী যোদ্ধা মানিক আর ইদ্রিসকে। নজরুল একটা রাইফেলসহ ধরা পড়ে। পাকবাহিনীর সাতজন মারা গেলেও আমরা কোনো অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারিনি। আমাদের যোদ্ধারা অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করলেও সার্বিকভাবে আমাদের ব্যর্থতার পাল্লাই ভারী। এ রকম পরিস্থিতিতে সবার মাঝেই হতাশা সৃষ্টি হতে পারে। যোদ্ধাদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য নতুনভাবে অ্যাকশনের পরিকল্পনা নেয়া হয়।

ভারতের কান্দি সেতু উড়াতে হবে। মজনু মৃধার নেতৃত্বে বারোজনের দল বাছাই করা হলো। দুটো এলএমজি, দুটো স্টেনগান, একটা এসএমজি আর বাকি সব রাইফেল। সঙ্গে কয়েকটা হ্যান্ড গ্রেনেড ও বিস্ফোরকও রয়েছে।

সেতুটা পাক বাহিনী দিন-রাত পাহারা দেয়। সেতুর দুই পাশেই বাঙ্কার আছে। আমাদের পর্যবেক্ষক দল আগেই খবর দিয়েছে, সাধারণত ভোর ৬টার দিকে গার্ডরা বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে এসে হাঁটাহাঁটি করে। আমরা ঠিক করি, ঐ সময় সেতুর দু'দিক থেকে এক সঙ্গে আক্রমণ করা হবে।

শেষ রাতের দিকে আমরা ছয়জন করে দুই দলে ভাগ হয়ে সেতুর দুই দিকে অবস্থান নিলাম। ভোরবেলা দেখা গেল মজন মৃধা যেদিকে অবস্থান নিয়েছেন, সেদিকের গার্ডরা বাঙ্কার থেকে বেরিয়ে আসছে; কিন্তু আমাদের দিকের বাঙ্কারের গার্ডরা তখনো বাঙ্কারেই রয়ে গেছে। ফলে মজনু মৃধার দল আমাদের আগেই আক্রমণ শুরু করে দিল। প্রথম আক্রমণেই চারজন ধরাশায়ী। কিন্তু আমাদের দিকের বাঙ্কার থেকে প্রতিরোধ শুরু হলো। প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট প্রচণ্ড গোলাগুলি চলে। আমরা

কয়েকটা গেনেডও ব্যবহার করি। শেষ পর্যন্ত গার্ডরা আর প্রতিরোধ না করে পালিয়ে যায়। ফেলে রেখে যায় ছয়টা মৃতদেহ। বাঙ্কার থেকে আমরা তিনটা চাইনিজ রাইফেল ও চার বাক্স গুলি উদ্ধার করি। ফিরে আসার আগে আমরা বিস্ফোরকের সাহায্যে সেতুটা ধ্বংস করে দেই।

সেতু থেকে তিন-চারশ' গজ দূরে রাস্তার একজন পাক সেনাকে আমরা গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বন্দি করি। তার বাঁ পায়ের উরুতে আর ডান কাঁধে গুলি লেগেছে। প্রচুর রক্ত ঝরছে। বাঁচার আশা কম। তবু তাকে ধরাধরি করে কাছের একটা স্কুলঘরে নিয়ে এলাম। ঘণ্টা দুয়েক বেঁচে ছিল। মরার আগে সে একটা পোস্টকার্ড আমাদের হাতে দিয়ে বলল, 'আমি জানি আমি আর বেশিক্ষণ বাঁচব না। আমার একটা অনুরোধ, আমার বিবির কাছে লেখা এই চিঠিটা পোস্ট করে দিও। আমার বিবি জানুক, আমি বেঁচে আছি'।

নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে আসছে। পাক বাহিনীর মনোবল ভেঙে যাচ্ছে। এ সুযোগে আমরা পাক বাহিনীর ওপর কয়েকটা আক্রমণ চালাই। আক্রমণগুলো ছিল স্বল্পস্থায়ী এবং আচমকা। নভেম্বরের শেষদিকে আমরা শিবপুরকে মুক্ত করি।

তেরো ডিসেম্বর আমাদের যোদ্ধারা নরসিংদী মুক্ত করে। টিএন্ডটি অফিসে অবস্থিত পাক বাহিনীর মূল ক্যাম্পটি দখল করে সেখানে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ভারতীয় বাহিনী তখন নরসিংদী থেকে অনেক দূরে। মাত্র ভৈরব পর্যন্ত পৌঁছেছে।

ক্যাম্প দখলের পর ভেতরে ঢুকে অস্ত্রের সম্ভার দেখে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই। ঘর বোঝাই হালকা ও ভারী মেশিনগান। থরে থরে সাজানো রকেট লঞ্চার আর দুই ইঞ্চি মর্টার। অফুরন্ত গোলা-বারুদ আর গ্রেনেড।

কিন্তু এ অস্ত্র আমরা আমাদের দখলে রাখতে পারলাম না। কারণ অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা হেলিকপ্টার নামল। তাতে কয়েকজন ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার ও কয়েকজন ভারতীয় সৈনিক। তারা আমাদের যোদ্ধাদের নরসিংদী মুক্ত করার জন্য ধন্যবাদ জানালো এবং ওই ক্যাম্পের দায়িত্ব তাদের হাতে ছেড়ে দিতে বললো। আমরা দখল করা অস্ত্র সম্ভার ভারতীয় বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে ব্যথিত হৃদয়ে শিবপুর ফিরে এলাম।

রচনাকাল ২০০১

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

ডা. জিয়াউদ্দীন আহমদ

সময়টা একাত্তরের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি। লেফটেন্যান্ট হেলাল মোরশেদের নেতৃত্বে ১৪ জন সৈনিক নিয়ে একটা স্পেশাল প্লাটুন গঠন করা হয়েছে। যার দায়িত্ব হবে অনবরত শত্রুর কাছাকাছি বিচরণ করা এবং সুযোগ বুঝে বারবার হামলা চালানো। সারাক্ষণ শত্রুকে ব্যস্ত রাখলে তারা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং রেগুলার বাহিনী নিয়ে ক্যাপ্টেন নাসিম সহজেই মুখোমুখি যুদ্ধে শত্রুকে ঘায়েল করতে পারবেন। আমরা ছাত্র তিন বন্ধু ছাড়া আর সবাই ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাছাই করা যোদ্ধা। ক্যাপ্টেন নাসিম মাধবপুরে ঘাঁটি করেছেন, শত্রুর মুখোমুখি। ঠিক হলো শাহবাজপুর ব্রিজে দখলকৃত পাকিস্তান বাহিনীর ঘাঁটির ওপর রেইড করতে হবে। স্পেশাল প্লাটুনের এবং তার সঙ্গে আমার প্রথম অপারেশন। স্থানীয় একটি ছেলে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। আমাদের পথ চলতে হবে রাতের অন্ধকারে। কাকপক্ষিতেও যেন টের না পায়। শত্রুকে পাশ কাটিয়ে পেছনে গিয়ে অতর্কিতে চালাতে হবে আক্রমণ তারপর দ্রুত ফিরে আসতে হবে ঘাঁটিতে। সেদিন ছিল অমাবস্যা, নিকশ কালো রাত। বৃষ্টি থেমে গেছে ততক্ষণে, কিন্তু মেঠোপথ কাদায় একাকার। সমস্ত রাত আমাদের হাঁটতে হবে পথ। গ্রামের ভেতর দিয়ে, মানুষের উঠান পেরিয়ে, কখনো ঘরের কিনার ঘেঁষে সন্তর্পণে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি আমরা। পরনে আমাদের লুঙ্গি ও শার্ট এবং খালি পা। পিঠের মাঝে আমার ঝুলানো চাইনিজ লাইট মেশিনগান ও দু'টি ভারি ম্যাগাজিন, কোমরে আঁটা দু'টি গ্রেনেড। কথা বলা বা শব্দ করা বারণ, তাই একজনের পিঠে রাখা আছে আরেকজনের হাত নাহলে নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে দল থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ঝানু সৈনিকদের হাঁটার সঙ্গে তাল মেলাতে না পেরে দু'বার আমি হারিয়ে গেলাম। বাধ্য হয়ে পাখির ডাকের সংকেত দিয়ে আবার মিলিত হলাম। ভোর হওয়ার আগেই আমরা শাহবাজপুর ব্রিজের কাছে চলে এসেছি। আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটা টিনের মসজিদের ভেতর সবাই আশ্রয় নিলাম। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষই পালিয়ে গেছে। প্রচুর বাড়িঘর ভস্মীভূত। বুঝলাম শূন্য গ্রামে এবং পরিত্যক্ত মসজিদই দিনের আলোতে গা-ঢাকা দেয়ার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। আমাদের অপেক্ষা করতে হবে রাতের জন্য। লে. মোর্শেদ দু'জন সাহসী হাবিলদারকে রেকি করতে পাঠালেন। তারা চাষীর ছদ্মবেশে দুটো গরুকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে ব্রিজের কাছে গিয়ে শত্রুর ঘাঁটির অবস্থা, মেশিনগানের পোস্ট এবং আমাদের পশ্চাদপসরণের সম্ভাব্য পথ নির্ধারণ করে এলো।

সারারাত ভারী অস্ত্র কাঁধে নিয়ে পথ চলে ক্লান্ত আমি লাইট মেশিনগানটা মাথার নিচে দিয়ে শক্ত ধূলিময় মেঝেতে অনায়াসে ঘুমিয়ে পড়লাম। বিকেলে যখন ঘুম ভাঙলো তখন দেখলাম, কলা পাতার ওপর গরম ভাত আর ডাল বাড়া হয়েছে। সবার খাবার পর লে. মোর্শেদ আমাদের সবাইকে যার যার পজিশন বুঝিয়ে দিল। অন্ধকার নেমে আসছে, মোমবাতির ক্ষীণ আলোকেও ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা চলছে, নিঁচুগলায় ফিসফিস করে কথা বলছে কেউ কেউ। শক্ত করে ধরে থাকলাম আমার হাতের এলএমজিটাকে, এই মুহূর্তে আমার সবচেয়ে বিশ্বাসী বন্ধু। শীতল ইস্পাত থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে লাগল আমার রক্তে। বিস্কিটের টিনের মতো মসৃণ ম্যাগাজিনের ওপর কয়েকবার হাত বুলালাম। ধীরে ধীরে মনে পড়তে লাগল বাবা, মা, ভাই, বোন ও বন্ধুদের কথা। ২৫ মার্চের পাকিস্তানিদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের মৃত্যু হয়েছে। বঙ্গবন্ধু অনেক চেষ্টা করেও গণতান্ত্রিক উপায়ে শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। পাকিস্তানিদের বেইমানির মুখোশ খসে পড়েছে। প্রথম কয়েকদিন অবিশ্বাস্য দুঃস্বপ্নের মতো কেটে গেল। সিলেট শহরের রাজপথে নিরীহ মানুষের লাশ বাড়তেই লাগলো। হঠাৎ মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণায় যেন সম্বিৎ ফিরে পেলাম, এবার বাঙালি সৈনিকরাও জেগেছে। একটা দুর্বার সাহস ফিরে পেলাম। কী করবো বুঝতে পারার আগেই শুনলাম পাঞ্জাবিরা নিজেদের রেজিমেন্টের ৩১ পাঞ্জাব দু'জন বাঙালি অফিসার লে. ডা. মইন ও ক্যাপ্টেন মাহবুবকে গুলি করে সিলেট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ফেলে গেছে। কারফিউ ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ছুটে গেলাম। অদূরে অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন সার্জারির প্রধান অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দীন আহমদ, আমার বাবা। আমার দিকে চোখ পড়তেই নিস্পলক তাকিয়ে থাকলেন কয়েক মুহূর্ত। তাকে মনে হলো অনেক ক্লান্ত ও চিন্তিত। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এখন ডাক্তার-শূন্য। সবাই আকস্মিকতায় দিশেহারা। অথচ হাসপাতালে আহত, মুমূর্ষু অসহায় রোগীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। অধ্যাপক ডা. শামসুদ্দীন হাসপাতালে সারাক্ষণ থেকে যাওয়ার কথা মনস্থ করেছেন। তার জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। প্রাণের ভয় থেকে বড় দায়িত্ববোধ। এই ভয়ংকর দুঃসময়ে বুকের মধ্যে আগলে ধরে রাখলেন হাসপাতালকে। যে করেই হোক খোলা রবে এর দ্বার। কানে বাজতে লাগলো গত রাতের তার কথাগুলো। 'হানাদারদের এখন চ্যালেঞ্জ করতে হবে সমরাস্ত্র দিয়ে, তীর, বল্লম আর গাঁদা বন্দুক দিয়ে নয়। বেশি দেরি হলে বাঙালি জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।' তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়ালাম, পেছন ফিরে আর একবারও তাকালাম না (তখন বুঝতে পারিনি এটাই আমার বাবাকে আমার শেষ দেখা। ৫ দিন পর ৯ এপ্রিল এই হাসপাতালের ভেতর মুমূর্ষু ও আহতদের সেবা করার সময় পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে তিনি কিছু সাথীকে নিয়ে শহীদ হন)।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সালাম, আনিস ভাই, বুলু ভাই (চিকিৎসক) আর আমি প্রথম বর্ষ মেডিকেলের ছাত্র, সিলেট শহর থেকে রওনা দিলাম অজানার পথে। যেহিন, ফয়সল, শাহরীয়ার, বাবলু, আতিক ও অন্যান্য বন্ধুকে সিলেটে অপেক্ষা করতে বললাম পরবর্তী নির্দেশের জন্য। প্রথম লক্ষ সিলেটের অদূরে বিয়ানীবাজার থানার দিকে কারণ

সেখানে আর্মি তখনো ওখানে যায়নি এবং বাঙালি পুলিশরা তখনো অস্ত্র জমা দেয়নি। পরিকল্পনা হলো পুলিশের কাছ থেকে রাইফেল জোগাড় করতে হবে, প্রয়োজনবোধে ছিনতাই করে হলেও। তারপর ছাত্র-জনতাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে সংগঠিত করতে হবে প্রতিরোধ; কিন্তু তার প্রয়োজন হলো না। দেখা হয়ে গেল কর্নেল (অব.) রবের সঙ্গে। শুনলাম আজ রাতে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকরা ক্যাপ্টেন আজিজের নেতৃত্বে সিলেটে হানাদার বাহিনীর ওপর হামলা চালাবে। তিনি আমাদের যথাশিগগির তেলিয়াপাড়া চা বাগানে জমায়েত ২য় বেঙ্গল রেজিমেন্টের কাছে রিপোর্ট করার জন্য নির্দেশ দিলেন।

বিয়ানীবাজারের সাবু ভাইয়ের সাহায্যে আমরা ভারতে পৌছলাম। অপরিচিত কয়েকজন উৎসাহী ভারতীয় যুবকের সাহায্যে করিমগঞ্জ হয়ে আগরতলার বর্ডার দিয়ে পরদিনই আবার বাংলাদেশের ভেতর তেলিয়াপাড়াতে এসে পৌছলাম। তেলিয়াপাড়াতে তখন বাঙালি সমরনায়কদের প্রথম ঐতিহাসিক বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধের নকশা তৈরি হচ্ছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া তখনো বাঙালি সৈনিকদের দখলে। দু'দিনের মধ্যেই হাতে হাতে সাব-মেশিনগান, রাইফেল, লাইট মেশিনগান আর গ্রেনেড ছোড়ার ট্রেনিং নিয়ে আমরা চারজন ছাত্র মিশে গেলাম ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সঙ্গে। ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডার মৃদুভাষী মেজর কাজী মোহাম্মদ সফিউল্লাহ ছোটখাটো বক্তৃতা দিলেন। 'অন্যায়ভাবে বাঙালিদের ওপর হত্যা, ধ্বংস ও বর্বরতা শুরু করেছে পাকিস্তানি সৈন্যরা। এখন জাতীয় কর্তব্য হবে দেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া। কতদিন যুদ্ধ চলবে জানি না তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জয় আমাদের হবেই।'

কিছুদিন সালাম, আমি আর আনিস ভাইকে নবগঠিত পুলিশ, ইপিআর ও ছাত্র-জনতা তৈরি কোম্পানিগুলোর কমান্ডার হিসেবে দায়িত্বভার দেয়া হলো। আমাদের আর্মি ক্যাডেট হিসেবে পবিচয় করানো হলো সাংগঠনিক সুবিধার্থে। তখন মুক্তিযুদ্ধের মাত্র প্রথম পর্যায় এবং ভারতের সঙ্গে আগের কোনো বোঝাপড়া না থাকায় ভারতের কাছ থেকে তখনই কোনো সামরিক সাহায্য পাওয়া গেল না। তাই বেঙ্গল রেজিমেন্ট স্বল্প লোকবল ও সীমিত অস্ত্র নিয়ে হানাদারদের মরিয়া হয়ে প্রতিহত করার চেষ্টা করছিল। আর আমরা ক্যাম্পে রণক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য সারাক্ষণ উদগ্রীব হয়ে থাকতাম। তখনই একদিন হঠাৎ করে হাজির হলো এক তরুণ সুদর্শন বাঙালি লেফটেন্যান্ট, তার এক হাত প্লাস্টারে ঢাকা, যুদ্ধের সময় শত্রুর গুলি লেগে ভেঙে গেছে। তাতে সে দমবার পাত্র নয়, আরেক হাত তো এখনো আছে। অনায়াসে ছুড়তে পারবে গ্রেনেড অথবা চালাতে পারবে সাব-মেশিনগান। মোর্শেদ জানাল, তার স্পেশাল প্লাটুনের পরিকল্পনা। পরিষ্কারভাবে বোঝালো এই ঝুঁকির মর্মার্থ। আত্মঘাতী অভিযান। আমি যেন এতদিন তারই জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তক্ষুনি কোম্পানির দায়িত্ব আমার সহকারী ওয়াকারের কাছে দিয়ে মোর্শেদের সঙ্গে চলে এলাম শত্রু হননের দুর্বার স্বপ্ন নিয়ে। একের পর এক দ্রুত ভাসতে থাকলো স্মৃতিগুলো।

হঠাৎ করে তন্দ্রা ভাঙলো, দেখি সবাই তৈরি হয়ে গেছে। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। এলএমজিটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, গ্রেনেডগুলো চেক করে নিলাম। একটা

প্রচণ্ড শক্তি অনুভব করলাম। আজ আমার প্রথম অপারেশন। চঞ্চলতা নেই ভেতরে, ভয় যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। অদ্ভুত, অব্যক্ত এক অনুভূতি। শত্রুর গুলি আজ আমাকে কিছুতেই স্প র্ করতে পারবে না বলে এক দৃঢ়বিশ্বাস জন্মেছে। হঠাৎ করে আবার বাবা, মা, ভাই ও বোনদের কথা মনে পড়ল, বন্ধুদের মুখ ভেসে উঠল। কে, কোথায় কীভাবে আছে বা নেই কিছুই জানি না, কোনোদিন কাউকে দেখতে পাব কিনা তাও জানি না। চিন্তাটাকে দূর করার জন্য মনে করতে চাইলাম সামনের শত্রুকে আক্রমণ করার এই মুহূর্তে আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

নিঃশব্দে সবাই আবার গাঢ় অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। কাদায় ভরে গেছে পথ। জল আর কাদায় অতি সন্তর্পণে হাঁটলেও প্যাচপ্যাচ শব্দ হতে লাগল। হঠাৎ নিস্তব্ধতা খানখান করে পাকিস্তানিরা আকাশে সার্চ পিস্তল ছুড়ল। আগের নির্দেশমতো নিঃশব্দে সবাই মাটিতে শুয়ে পড়লাম। সাদা আলোতে চারদিক আলোকিত হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। সব চুপচাপ মনে হলো। তারা টের পেল না আমাদের উপস্থিতি। সন্তর্পণে আবার রওনা হলাম শত্রুর ছাউনির দিকে খুব ধীরগতিতে। আরো কাছাকাছি আসার পর লে. মোর্শেদ দু'জন দু'জন করে পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সবাইকে যার যার পজিশনে বসিয়ে দিল। আমি লাইট মেশিনগানটা নিয়ে সবার ডানদিকে বসলাম। হাত ধরে ইশারায় সে দেখলো আমার প্রথম টার্গেট, শত্রুর ভারী মেশিনগানের বাঙ্কার। নিকষ অন্ধকারে কিছুই পড়লো না চোখে। বাঙ্কার কত দূরে বোঝা গেল না। ট্রিগারে আঙুল রেখে শুয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম সংকেতের। দুই ইঞ্চি মর্টার দিয়ে মোর্শেদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও শুরু করতে হবে বার্স্ট ফায়ার। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সামনে কতক্ষণ তাকিয়ে অছি জানি না, হঠাৎ যেন অন্ধকার ভেদ করে আমার দৃষ্টিতে ধরা দিতে থাকলো কিছু রেখা। ব্রিজ, ছাউনি, শত্রুর ট্রাকগুলো সবকিছু যেন এখন ঠাহর করতে পারছি। হঠাৎ দেখি সামনে খুব কাছে দুটো ছায়া নড়ে উঠল। মনে হলো ছাউনি থেকে বাঙ্কারে আসছে দু'জন শত্রুসেনা। তক্ষুনি আক্রমণের সংকেত, মোর্শেদের মর্টার গর্জে উঠল, ছাউনিতে আঘাত করেছে শেলটি। আমার নিশানা ততক্ষণে দু'টি ছায়ার দিকে নিবদ্ধ, ট্রিগারে আঙুল চেপে ধরলাম সব শক্তি দিয়ে। শুরু হয়ে গেল অ্যাটাক। আচমকা পেছন থেকে এই আক্রমণে হৈচৈ পড়ে গেছে পাকিস্তানিদের মধ্যে।

অনবরত স্বয়ক্রিয় অস্ত্রের শব্দে কাঁপতে থাকলো গোটা এলাকা। মাঝে মাঝে মর্টারের শব্দ। শত্রুরা কিছুটা সামলে নিয়ে পাল্টা আক্রমণ করছে। হঠাৎ দেখি সামনের বাঙ্কার থেকে প্রচণ্ড শব্দে ভারী মেশিনগান গর্জে উঠলো, আমার মাথার খুব কাছ দিয়ে ছুটতে লাগল গুলি। বুঝলাম বাঙ্কারে যারা ছিল তাদের এক্ষুনি স্তব্ধ করে দিতে হবে। গ্রেনেডের পিনটা খুলে ছুড়ে দিলাম অন্ধকারে মেশিনগানের ফুলকির দিকে লক্ষ্য করে, তারপর কানে হাত দিয়ে পজিশন নিলাম। গ্রেনেডের বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গেল শত্রুর বাঙ্কার। তথাপি আবার বার্স্ট ফায়ার করতে থাকলাম আরো কিছুক্ষণ সেদিকে। তারপর ছাউনির দিকে ঘুরিয়ে ধরলাম নিশানা। সেদিক থেকে বেশকিছু স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের গুলি আসছিল। আবার গর্জে উঠলো আমার এলএমজি। অনবরত

ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন, উত্তপ্ত হয়ে গেছে ইস্পাতের শরীর। ধারে কয়েকটি গ্রেনেড ফুটলো।

কতক্ষণ গুলি চলছে খেয়াল নেই, ধীরে ধীরে শত্রুর গোলাগুলি কমতে লাগলো। হঠাৎ দেখি ডানদিকে রাস্তায় হে ্গাইট বন্ধ করে এগিয়ে আসছিল একটি গাড়ি, মুহূর্তে লাইটটা জ্বলে আবার নিভে গেল। ওইদিকে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়ে নিলাম এলএমজির নলটি, আবারো কিছুক্ষণ চেপে ধরলাম ট্রিগার। গাড়ি থেকে কোনো গুলি এলো না। মোর্শেদ তৎক্ষণাৎ সংকেত দিয়েছে ফিরে যাওয়ার। মেশিনগানটা হাতে নিয়ে ক্রলিং করে পিছু হাঁটতে থাকলাম।

একটা বাড়ির আড়ালে এসে উঠে দাঁড়ালাম সোজা হয়ে। দু'টো এলএমজি থেকে শত্রুরা তখনো চালিয়ে যেতে থাকলো গুলি। বেশ কয়েকবার বাঁশির মতো শব্দ করে খুব কাছ দিয়ে উড়ে গেল গুলি, ভ্রূক্ষেপ না করে চলতে লাগলাম। মোর্শেদ দেখে নিল আমাদের কেউ হতাহত হয়নি। অজানা একটি আনন্দে ভরে উঠেছে বুক। আমরা লাইন করে এগিয়ে যেতে লাগলাম মাধবপুরে আমাদের ঘাঁটির দিকে। (গ্রামের লোকজন পরদিন ২২ জন শত্রুসেনার লাশ ট্রাকে করে নিয়ে যেতে দেখেছে)

ধীরে ধীরে আলোকিত করে অন্ধকার কাটতে লাগল। এতদিনের একটা অব্যক্ত অসহায় যন্ত্রণা ক্রোধ ও ঘৃণার সংমিশ্রণে ভরা ভারি বুকটা একটু হালকা মনে হলো। বুক ভরে জোরে জোরে কয়েকবার নিঃশ্বাস নিলাম। বেশ হালকা লাগছে।

অনেকদিন পর ভোরের বাতাসের ঘ্রাণ নিলাম। সামনে তাকিয়ে দেখলাম চোখজুড়ানো সবুজ ক্ষেত আর এঁকেবেঁকে চলে গেছে মেঠোপথ, অনেক দূরে দিগন্তের দিকে। হঠাৎ মনে হলো কবে শেষ হবে এই পথ।

অপারেশন-ব্লিট্‌জ থেকে অপারেশন-সার্চলাইট

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (অব.)

রাজনৈতিক-সামরিক বিবর্তন

উনসত্তরে পাকিস্তানের বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালিদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ আন্দোলনের আকারে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। এ ক্ষোভের নিয়মতান্ত্রিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে সত্তরের ৭ ডিসেম্বরের 'এক ব্যক্তি এক ভোট'-এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে। জাতীয় পরিষদের মোট ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে ১৬০টি আসন এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) লাভ করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন ৮১টি। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৬২ আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রদেশ—পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানে একটি আসনও লাভ করেনি। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো এলাকার কোনো জনগোষ্ঠীকেই প্রতিনিধিত্ব করেনি। অপরদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বে পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ১৩৮ আসনের মধ্যে ৮১টি আসন লাভ করে। উল্লেখিত ৪টি প্রদেশের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন লাভ করলেও পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনও পিপিপি লাভ করেনি। আওয়ামী লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে সাতটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, কিন্তু পিপিপি পূর্ব পাকিস্তানে একটি আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেনি। বাস্তবে পিপিপি'র কোনো অফিস বা কোনো কার্যক্রমই ছিল না পূর্ব পাকিস্তানে। পার্লামেন্ট পদ্ধতির গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনে বিজয়ী নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে সরকার গঠন করার জন্য প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহ্বান জানানোর কথা। নির্বাচনের ফলাফলে পাকিস্তানের দুই অংশের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রধান সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। ভুট্টো তার নিজের স্বার্থে সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তোলেন এই প্রচ্ছন্ন হুমকিতে, তার দলের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করতে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করতে পারবে না। রাজনৈতিক সমঝোতার অচলাবস্থা প্রধানত এখান থেকেই শুরু। অন্যদিকে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ আসনে বিজয়ী দল আওয়ামী লীগ তার ৬ দফাকে তাদের নির্বাচনী মেনিফেস্টো নির্ধারণ করে। কিন্তু ৬ দফার প্রতিটি দাবিই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থসম্পৃক্ত ও বাঙালিদের অধিকার সম্পর্কিত। এ নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতিসত্তার বা চারটি প্রদেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় ছিল না। রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টিতে এটিও ছিল একটি

কারণ। পশ্চিম পাকিস্তানের একটি মহল এ অবস্থায় প্রশ্ন তোলে, একটি প্রদেশ (পূর্ব পাকিস্থান) কী করে পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে শাসন করবে? পশ্চিম পাকিস্তানেরই কিছু প্রজ্ঞাবান রাজনীতিবিদ যারা পূর্ব পাকিস্তানের এবং বাঙালিদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তারা বলেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানিরা যদি তেইশ' বছর পূর্ব পাকিস্তান শাসন করে থাকতে পারে তবে পূর্ব পাকিস্তানিরা কেন পশ্চিম পাকিস্তান শাসন করতে পারবে না। তবে মূল সমস্যা ছিল আপাতদৃষ্টির বাইরে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসকরা কখনোই এটা মেনে নিতে পারেননি যে, বাঙালিরা পাকিস্তানের ক্ষমতার মসনদে বসবে। হাতেগোনা কয়েকজন রাজনীতিবিদ ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদরাও এমনই ভাবতেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটি সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা করায় এবং সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করায় ভুট্টোর কাছে জেনারেল ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্য অস্বচ্ছ হওয়া শুরু হয়। ভুট্টো ইয়াহিয়াকে একদিকে আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনার বিষয়ে ও অপরদিকে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে বোঝাতে সচেষ্ট থাকেন। প্রাথমিক এ অবস্থায় ইয়াহিয়া তার নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন এবং ভুট্টোর প্রস্তাবনায় কান দিলেও তা বাধ্যবাধকভাবে মানেননি। ভুট্টোর কাছে ইয়াহিয়া খান ক্রমেই অনির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। অন্যদিকে ভুট্টো, ইয়াহিয়ার উচ্চপদস্থ নীতিনির্ধারক এবং বাঙালি বিদ্বেষী জেনারেলদের সঙ্গে গোপন পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত থাকেন। এদের অন্যতম ছিল লে. জেনারেল এসজিএমএম পীরজাদা, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খান। পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধ এবং অতঃপর ১০ জানুয়ারি ১৯৬৬-র স্বাক্ষরিত তাসখন্দ চুক্তির পর আইয়ুব তার প্রকৃত ক্ষমতার ভিত্তি (সশস্ত্র বাহিনীর) ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং ১৯৬৬ সালে সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার ইন চিফ জেনারেল মোহাম্মদ মূসার অবসর গ্রহণের পর তার অবস্থা আরো দুর্বল হয়ে যায়। আইয়ুব ভেবেচিন্তে এবং বহু বিষয় বিবেচনা করে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে কমান্ডার-ইন-চিফ মনোনয়ন করেন। বিবেচনার ও ভাবনার এ প্রক্রিয়ায় আইয়ুবের মাথায় ইয়াহিয়ার সামরিক যোগ্যতা ও দক্ষতার বিষয়গুলো আসেনি এবং ইয়াহিয়াকে এ মনোনয়ন দিতে তার সিনিয়র কয়েকজন জেনারেলকে অতিক্রান্ত করতে হয়। ইয়াহিয়া ছিলেন আইয়ুবের অনুগত এবং আইয়ুবের ধারণা ছিল, ইয়াহিয়া রাজনীতিতে অনাগ্রহী ও সিরিয়াস ধরনের জেনারেল নন এবং তিনি রাতে ভোগ-বিলাসেই তৃপ্ত থাকবেন। কিন্তু আইয়ুবের বড় ভুল ছিল ইয়াহিয়ার সঙ্গে লে. জেনারেল পীরজাদার দীর্ঘ বন্ধুত্ব ও নিবিড় সখ্যতা উপেক্ষা করা। পীরজাদা মেজর জেনারেল হিসেবে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত আইয়ুবের মিলিটারি সেক্রেটারি ছিলেন এবং তার হার্ট অ্যাটাকের পর তাকে এই নিয়োগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়।

পীরজাদা ছিলেন অত্যাধিক উচ্চাভিলাষী এবং প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে এভাবে বের হয়ে আসার অপমান তিনি ভুলতে পারেননি। ভুট্টোকেও ১৯৬৬ সালে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে অপসারণ করা হয়। ভুট্টোও এ অপমানের জন্য আইয়ুবকে

ক্ষমা করেননি। পীরজাদা এবং ভুট্টোর মধ্যে তাদের দু'য়ের শত্রু আইয়ুবের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের প্রশ্নে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এই ভুট্টো-পীরজাদা অক্ষ ঊনসত্তরে আইয়ুবের পতন এবং একাত্তরে পাকিস্তান ভাঙনে প্রভূত অবদান রাখে। ইয়াহিয়ার বিশ্বস্ত এক জেনারেল সত্তরের ডিসেম্বরের শেষে ঢাকায় গভর্নর হাউসে (বর্তমান বঙ্গভবন) নৈশভোজের পর আলাপচারিতার এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গে বলেন, "চিন্তা করো না আমাদের শাসন করার সুযোগ এই কালো বেজন্মাদের আমরা দেব না।"

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একাত্তরের ১২ জানুয়ারি থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত ঢাকা সফর করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো ও তার সঙ্গীরা ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে আলোচনা শেষে ৩০ জানুয়ারী করাচি ফেরত যান। ঢাকা সফরকালে ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে একাধিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের ফলাফল ইয়াহিয়াকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ঢাকা ত্যাগের আগে ঢাকা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বিচলিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ইয়াহিয়া বলেন, 'তাকে (মুজিব) জিজ্ঞাসা করুন। তিনি পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ প্রধানমন্ত্রী। তিনি যখন আসবেন এবং ক্ষমতা গ্রহণ করবেন তখন আমি থাকবো না। খুব শিগগিরই সরকার তার হবে'। ভুট্টো তার পাঞ্জাবের লারকানার জমিদার বাড়ির বাংলো 'আল মরতুজায়' ১৭ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের 'হাঁস শিকারের' আমন্ত্রণ জানান। ধারণা করা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত এখানেই গ্রহণ করা হয়। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর এ বৈঠক 'লারকানা ষড়যন্ত্র' নামে অভিহিত।

জানুয়ারির শেষ নাগাদ ইয়াহিয়া-ভুট্টো এবং শেখ মুজিব তাদের নিজ নিজ অবস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে যান, তারা তাদের নিজ নিজ পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে থাকেন। শেখ মুজিব জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে আহ্বান জানানোর জন্য প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেন। অপরদিকে রাজনীতিবিদদের মধ্যে আরো আলোচনার জন্য সময় প্রয়োজন-এই যুক্তিতে ভুট্টো ইয়াহিয়াকে অধিবেশন পেছানোর দাবি করতে থাকেন। পাকিস্তান রক্ষার এবং রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রায় সব পথ ক্রমেই রুদ্ধ হয়ে আসতে থাকে।

১১ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডিতে ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে এক দীর্ঘ বৈঠকে মিলিত হন। দু'দিন পর (১৩ ফেব্রুয়ারি) ইয়াহিয়া খান ঘোষনা করেন ৩ মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। এ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই ভুট্টো তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়েন। তিনি ঘোষণা করেন, তার এবং শেখ মুজিবের মধ্যে সমঝোতার আগে কোনোভাবেই অধিবেশন বসতে দেয়া হবে না। ১৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার বিরুদ্ধে পেশোয়ারে এক সংবাদ সম্মেলনে হুমকি প্রদান করে ভুট্টো বলেন, অন্যথায় তিনি 'খাইবার থেকে করাচি' পর্যন্ত বিপ্লব শুরু করবেন। ১৫ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া তার বেসামরিক মন্ত্রিসভা বাতিল করে দেন। এর ফলে ইয়াহিয়ার সামরিক সরকারের আর কোনো বেসামরিক প্রতিনিধিত্ব রইল না। এর দু'দিন পর ১৭ ফেব্রুয়ারি ইয়াহিয়া তার গভর্নর ও আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকদের এক সভা ডাকেন

জিএইচকিউ (General Headquarters) রাওয়ালপিন্ডিতে। বৈঠক বসবে ২২ ফেব্রুয়ারি। পূর্ব পাকিস্তান থেকে গভর্নর ভাইস এডমিরাল এসএম এহসান এবং সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খান সভায় যোগ দেবেন।

জিএইচকিউ'র ২২ ফেব্রুয়ারির সভায় পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের কর্তৃত্বের স্থলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে আরোপ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রচারণার জন্য সত্তরের ১ জানুয়ারি থেকে সামরিক আইন শিথিল করা হয়। ডিসেম্বরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর আর সামরিক আইনের শিথিলতা তুলে নেয়া হয়নি। সামরিক আইন প্রয়োগ বা পুনঃপ্রয়োগের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি তখন অনেক বদলে গেছে। ২২ ফেব্রুয়ারি সভায়ই আনুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, পূর্ব পাকিস্তানে কর্তৃত্ব আরোপের জন্য এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সামরিক বাহিনী ব্যবহার করার। তার আগে শেখ মুজিবুর রহমানকে ৬ দফার প্রশ্নে ছাড় দেয়ার এবং পূর্ব পাকিস্তান পরিচালনার ভার আওয়ামী লীগের হাতে তুলে না নেয়ার অনুরোধ করে একটি শেষ চেষ্টা করার উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে সামরিক প্রস্তুতিও অব্যাহত থাকবে। সামরিক পদক্ষেপের জন্য পূর্ব পাকিস্তানে আরো সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শেখ মুজিবের সঙ্গে শেষ উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব দেয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল এসএম এহসান এবং সামরিক আইন প্রশাসক লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে। একই সঙ্গে ২২ ফেব্রুয়ারির সভায় নির্দেশানুযায়ী ঢাকাস্থ হেডকোয়ার্টার ১৪ ডিভিশন একটি অপারেশন প্ল্যান প্রণয়ন করে। অপারেশনটির নাম দেয়া হয় 'অপারেশন ব্লিটজ' (Op-Blitz)। এই অপারেশন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল যদি শেখ মুজিবের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা না যায় তবে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে আক্ষরিক অর্থে সামরিক আইন পুনঃপ্রয়োগ করা। পরে লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের নির্দেশে ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারস-এ একটি চূড়ান্ত রূপ দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে হাসান জহীর (একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানে কর্তব্যরত পাকিস্তানি সচিব) তার বই *দি সেপারেশন অব ইস্ট পাকিস্তান*-এ (পৃ. ১৪৮) বলেন, ইত্যবসরে ইস্টার্ন কমান্ডের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সৈন্য ও যুদ্ধসামগ্রী পাঠানো হচ্ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড রহিতকরণ এবং সামরিক কার্যক্রম গ্রহণের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীর আপদকালীন পরিকল্পনা 'অপারেশন-ব্লিট্‌স' ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে এক সময়ে চূড়ান্ত হয়ে যায় এবং এর বিষয়বস্তু ফরমেশন কমান্ডারদের জানিয়ে দেয়া হয়। মার্চের মাঝামাঝি রাজনৈতিক আলোচনার জন্য ইয়াহিয়ার ঢাকা পৌঁছার আগেই সেনাবাহিনী, প্রয়োজন হলে (পূর্ব পাকিস্তানের) পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুতি সম্পন্ন করে ফেলে। এই অপারেশন পরিকল্পনা কার্যকরী করার সময় আর আসেনি। পূর্ব পাকিস্তানে ঘটনা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে।

১৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য ঢাকা আসেন। তার সফরসঙ্গী হন জেনারেল আব্দুল হামিদ খান, চিফ অব স্টাফ, লে. জেনারেল

এসজিএমএম পীরজাদা, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার এবং তার উচ্চপদস্থ সামরিক সহকর্মীরা। ইয়াহিয়ার এই ঢাকা সফরের তারিখ ও সময় গোপন রাখা হয়। ঢাকা বিমানবন্দরে (তেজগাঁও বিমানবন্দর) অভাবনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। প্রেসিডেন্ট সফরের শিষ্টাচার অনুযায়ী কোনো বেসামরিক কর্মকর্তা বা মিডিয়াকে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। ইয়াহিয়া বিমানবন্দর থেকে সোজা গাড়িতে গভর্নর হাউসে চলে যান। ফার্মগেট ও রাস্তার অন্যান্য অংশে জনগণের স্থাপিত ব্যারিকেড থাকায় ইয়াহিয়ার জন্য একটি ছোট হেলিকপ্টার (Allouette-III) উড়ন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছিল। হেলিকপ্টারের এ ব্যবস্থাটি করা হয়েছিল অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে। পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী ইয়াহিয়া গভর্নর হাউসে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সিনিয়র অফিসারদের নিয়ে একটি সভা করেন। উত্তেজিত ইয়াহিয়া অবাধ্য মুজিব তার মতানুযায়ী আচরণ না করলে তার উত্তর কীভাবে দিতে হবে তা তার জানা আছে বলে জানান। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানি অফিসাররাও এখানকার পরিস্থিতির সম্বন্ধে কম-বেশি অবহিত ছিলেন। ইয়াহিয়ার এ উচ্চারণে হঠাৎ সভায় স্তব্ধতা নেমে আসে। অস্বস্তিকর কয়েক মুহূর্তে অতিবাহিত হওয়ার পর দীর্ঘদেহী, সুঠাম গড়নের এবং সমান্তরাল কাঁধের এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে কিছু বলার জন্য ইয়াহিয়ার অনুমতি চান। ন্যায় ও সত্যের কঠোর প্রবক্তা এ ব্যক্তির নাম এয়ার কমোডর জাফর মাসুদ। পিএএফ বেস, ঢাকার বেস কমান্ডার। মিট্টি মাসুদ নামে তিনি সমধিক পরিচিত। সাহসী বৈমানিক। যে তিনজন পাইলট পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধে 'হিলাল-ই-জুররত' লাভ করেন জাফর মাসুদ তাদের একজন। ১৯৫৮ সালে ১৬টি স্যাবর জেটের ফরমেশনকে খাড়াভাবে আকাশে তুলে বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেন। তাকে বলার অনুমতি দেয়া হয়। 'স্যার পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক। সমস্যা মূলত রাজনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে এ সমস্যা সমাধান প্রয়োজন, অন্যথায় হাজার হাজার নারী-পুরুষ এবং শিশু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে'। ইয়াহিয়া তার চোখের ভারি ভ্রূ কাঁপিয়ে এবং মাথা দুলিয়ে জবাব দেন-'মিট্টি আমি জানি, আমি জানি'। এয়ার কমোডর জাফর মাসুদ বসে পড়লেন। (পরবর্তী সময়ে এ অফিসার অপারেশন-সার্চলাইটের পরিকল্পনা অনুযায়ী তার বিমান ও বৈমানিক ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানান। তাকে পাকিস্তানে বদলি করা হয়, বিচার করা হয় এবং চাকুরিচ্যুত করা হয়। ৭ অক্টোবর ২০০৩ তিনি মৃত্যুবরণ করেন।) ১৬ মার্চ ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক আলোচনা হয়। ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় মে. জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ইয়াহিয়া ও মুজিবের মধ্যে অনুষ্ঠিত দিনের আলোচনার ফলাফল জানতে লে. জেনারেল টিক্কা খানের কাছে যান। লে. জেনারেল টিক্কা খান জবাব দেন, 'তুমি যা সামান্য জানো, আমিও ততটুকুই জানি'। খাদিম হোসেন রাজা বলেন, 'কিন্তু স্যার, অকুস্থলের ব্যক্তি হিসেবে যেন আপনি অসতর্ক অবস্থায় না পড়েন সেজন্য আলোচনার অগ্রগতি সম্বন্ধে জানা আপনার অধিকার।' সে সন্ধ্যায়ই টিক্কা খানের স্টাফ কার প্রেসিডেন্ট হাউসে প্রবেশ করে। জানা যায়, ইয়াহিয়া খান তাকে বলেন, 'বেজন্মাটা (মুজিব) ঠিকমতো আচরণ করছে না। তুমি তৈরি হও।' টিক্কা খান রাত দশটায় জিওসিকে (মে. জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা) টেলিফোন করে বলেন, 'খাদিম, তুমি এগিয়ে যেতে পারো।'

১৮ মার্চ সকালে জিওসি'র অফিসে মে. জেনারেল রাও ফরমান আলী খান এবং মে. জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা ১৪ ডিভিশনের অফিসে হালকা নীল প্যাডে পেন্সিলে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি প্রয়োগের অপারেশনাল অর্ডার লিখে ফেলেন। অপারেশনটির নাম দেয়া হয় 'অপারেশন-সার্চলাইট'। ২০ মার্চ বিকালে ঢাকা সেনানিবাসের ফ্ল্যাগ স্টাফ হাউসে অপারেশনাল অর্ডারটি চিফ অব স্টাফ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান এবং লে. জেনারেল টিক্কা খানকে পড়ে শোনানো হয়। ৫ মার্চ লে. জেনারেল ইয়াকুব গভর্নর এবং ইস্টার্ন কামান্ডার হিসেবে পদত্যাগ করেন। তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা হলেও তাকে তার প্রতিস্থাপক আসা পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়। লে. জেনারেল টিক্কা খান ৭ মার্চ বিকেলে ঢাকা পৌঁছেন এবং এদিন রাতেই লে. জেনারেল ইয়াকুবের কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নেন। সামান্য পরিবর্তন করে তারা অপারেশন অর্ডারটি অনুমোদন করেন। অর্ডারে একটি নির্দিষ্ট দিনে যখন শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ নেতারা প্রেসিডেন্টের সঙ্গে গভর্নর হাউসে বৈঠকরত থাকবেন তখন তাদের গ্রেফতার করার কথা উল্লেখ ছিল। অর্ডারটি অনুমোদন করার সময় ইয়াহিয়া এটিতে রাজি হননি। তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক আলোচনার জন্য আমার উপর জনগণের আস্থা আমি হত্যা করতে পারি না। গণতন্ত্রের বিশ্বাসঘাতক হিসেবে আমি ইতিহাসে যেতে চাই না।' এভাবেই ২০ মার্চ পৃথিবীর অন্যতম গণহত্যার পরিকল্পনা অপারেশন-সার্চলাইট চূড়ান্ত রূপ পায়।

ঊনসত্তরের ২৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করে দেশে সামরিক আইন জারি করেন। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শক্তি (Combat and combat support force) ছিল; তিনটি ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড নিয়ে একটি ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন (১৪ ডিভিশন), ৬টি পিটি-৭৬ উভচর ট্যাঙ্ক নিয়ে একটি ক্যাভালরি ট্রুপ এবং ১টি কমান্ডো ব্যাটালিয়ন। মোট ১৪,৫০০ সৈন্য। ঢাকায় অবস্থিত ১৬টি এফ-৮৬ (গ্রাউন্ড অ্যাটাক এয়ারক্রাফ্‌ট) নিয়ে বিমান বাহিনীর একটি স্কোয়াড্রন। চট্টগ্রাম নৌ-ঘাঁটিতে ৪টি গানবোট এবং ১টি সহায়তাকারী জাহাজ (Support Ship) নিয়ে নৌ-বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দল। বিমান ও নৌ-বাহিনীর মোট জনবল ছিল প্রায় ১,০০০। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আরোহণ করে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। একাত্তরের ৩০ জানুয়ারি দুই কাশ্মিরী যুবক ইন্ডিয়ান এয়ারলাইসেন্সের 'গঙ্গা' নামের একটি ফকার (এফ-২৭) বিমান ভারতীয় কাশ্মিরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে হাইজাক করে লাহোরে নিয়ে যায়। তারা লাহোর বিমানবন্দরে বিমানের ক্রু এবং যাত্রীদের নামিয়ে দেয়। ভুট্টো তাৎক্ষণিকভাবে এ ছিনতাইকারীদের 'জাতীয় বীর' আখ্যায়িত করেন। পরদিন (৩১ জানুয়ারি) টেলিভিশন ক্যামেরার সামনে ঘটা করে বিমানটিকে বিস্ফোরক দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়। এ ঘটনার পর ভারত তার দেশের ওপর দিয় পাকিস্তানের সব ধরনের বিমান উড্ডয়নের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ফলে করাচি থেকে পাকিস্তানি বিমান সিংহলের (বর্তমান শ্রীলংকা) হয়ে ঘুরে ঢাকা আসতে বাধ্য হয়। ১০০০ নটিক্যাল মাইলের দূরত্বের পরিবর্তে এ পথে দূরত্ব দাঁড়ায় প্রায় তিনগুণ। এতে পাকিস্তান বিমানবাহিনী এবং পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্সের (পিআইএ) পরিবহন কার্যক্রম গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর

পরিবহন বিমান বহরে ৫টি সি-১৩০বি এবং ১টি সি-১৩০ই বিমান ছিল। প্রত্যেকটি বিমানের ৯২ জন আরোহী (ক্রু ব্যতীত) পরিবহন করার ক্ষমতা ছিল। সি ১৩০ই ব্যতীত অপর সি-১৩০বি বিমানগুলোকে সিংহলের রাজধানী কলম্বো বিমানবন্দরে জ্বালানি সংগ্রহ করতে হতো। পিআইএ-এর ছিল ৭টি বোয়িং ৭০৭ এবং ৪টি বোয়িং ৭২০টি বিমান। এগুলোর পরিবহন ক্ষমতা ছিল যথাক্রমে ২০২ জন এবং ১১২ জন আরোহী (ক্রু ব্যতীত)। বোয়িং বিমানগুলো কলম্বোয় জ্বালানি সংগ্রহ না করেই বা কোথাও না নেমেই করাচি থেকে ঢাকা যাতায়াত করতে পারতো। পাকিস্তান বিমানবাহিনীর এবং পিআইএয়ের ৭৫% পরিবহন ক্ষমতা ব্যবহার করে এবং সবক'টি বোয়িং বিমান সৈন্য পরিবহনের জন্য ব্যবহার করা হবে হিসেবে একবারে বিমানে ২০০০ সৈন্য পরিবহন করা সম্ভব হতো। করাচি থেকে ঢাকা উড্ডয়নে বোয়িং ৭০৭ বিমানের জন্য প্রয়োজন হতো ৫ ঘন্টা এবং সি-১৩০বি বিমানের জন্য ১১ ঘন্টার অধিক (কলম্বোয় জ্বালানি সংগ্রহের সময় ব্যতীত)। বিমানগুলোর এ পথ একবার অতিক্রম করার পর রক্ষাণাবেক্ষণের প্রয়োজনে পরিবহনে কালক্ষেপণ হতো। বিমানে পরিবহনের এই জটিল কার্যক্রম সামরিক অপারেশন পরিকল্পনা হিসেবে প্রণীত হয়। অপারেশনটির নাম দেয়া হয় অপারেশন-গ্রেট ফ্লাই-ইন (Op-Great Fly-In)

১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩ মার্চ এই ৩১ দিনে মোট ১৪টি বেসামরিক সামুদ্রিক জাহাজ করাচি থেকে চট্টগ্রাম বন্দর পৌঁছে। এগুলোর মধ্যে ছিল ১০টি মালবাহী জাহাজ, ১টি যাত্রীবাহী জাহাজ এবং ৩টি যাত্রী-পণ্য পরিবহনকারী জাহাজ। এই জাহাজগুলোর মধ্যে ২টি জাহাজে করাচি বন্দর থেকে সৈন্য উঠতে দেখা যায়, তবে সৈন্যসংখ্যা নির্ধারণ করা যায়নি। বাঙালিদের দৃষ্টি এড়াতে সৈন্যদের বেসামরিক পোশাকে বিমানে ঢাকা আনা হতো। কিন্তু বিমান থেকে অবতরণের পর ঢাকা বিমানবন্দরে ফল-ইন হয়ে মার্চ করে তারা যখন যেতো তখন তাদের পরিচয় আর গোপন থাকতো না। বিমানে সৈন্যরা হালকা অস্ত্র ও ব্যক্তিগত মালামালসহ আসতো। ভারি অস্ত্র এবং গোলাবারুদ চট্টগ্রাম বন্দরে আনা হতো সমুদ্রপথে।

২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত বিমানে করে দু'টি ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন, ২২ বেলুচ রেজিমেন্ট এবং ১৩ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (এফএফ) রেজিমেন্ট ঢাকায় আনা হয়। ঢাকায় অবস্থিত ৫৭ ব্রিগেডকে আদেশ দেয়া হয় ব্যাটালিয়ন দু'টিকে তাদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করতে। ১৩ এফএফ-কে ঢাকা সেনানিবাসে রেখে ২২ বেলুচকে স্থান দেয়া হয় ইপিআর সদর দফতর, পিলখানায়। যুক্তি দেয়া হয়, ঢাকা সেনানিবাসে সৈনিকদের স্থান সংকুলান করা যাচ্ছে না। ২৫ মার্চ রাতে এই ২২ বেলুচ ইপিআর-এর বাঙালি সদস্যদের হত্যা ও গ্রেফতার করে।

২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ২৫.০০০ (Combat and Combat Support)। একাত্তরের ১ মার্চের আগে পূর্ব পাকিস্ত ান সেনাবাহিনীর একটি মাত্র ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশন মোতায়েন ছিল-১৪ ডিভিশন। চারটি ইনফ্যান্ট্রি ব্রিগেড ছিল এই ডিভিশনের অধীনে। এছাড়া ঢাকায় একটি বিমানঘাঁটি এবং চট্টগ্রামের একটি নৌঘাঁটি ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী

সেনাবাহিনী

হেডকোয়ার্টারস ইস্টার্ন কমান্ড, ঢাকা-লে. জেনারেল টিক্কা খান। হেডকোয়ার্টারস ১৪ ডিভিশন, ঢাকা-মে. জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। গভর্নরের বেসামরিক বিষয়ক উপদেষ্টা-মে. জেনারেল রাও ফরমান আলি খান।

ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন-১১টি, ফিল্ড আর্টিলারি রেজিমেন্ট-৪টি, ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন-১টি, আমার্ড রেজিমেন্ট-১টি [এম-২৪ (শ্যাফে) ট্যাংক], এন্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট রেজিমেন্ট ১টি, ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স-৩টি, ইন্ডিপেনডেন্ট আর্মাড স্কোয়াড্রন-১টি (পিটি-৭৬) এবং ইন্ডিপেনডেন্ট মর্টার ব্যাটারি-১টি।

এই ফিল্ড ইউনিটিগুলো ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানে নন-অপারেশনাল ইউনিট বা স্থাপনা ছিল-

স্টেশন হেডকোয়ার্টার, ঢাকা; ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার, চট্টগ্রাম; পাকিস্তান অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি, গাজীপুর; সেন্ট্রাল অর্ডন্যান্স ডিপো, ঢাকা; অ্যামুনেশন ডিপো, রাজেন্দ্রপুর; এম্বারকেশন ইউনিট, চট্টগ্রাম। তাছাড়া ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আইএসআই) এবং জেনারেল হেডকোয়ার্টারস (জিএইচকিউ), রাওয়ালপিন্ডির সরাসরি অধীনে জিও-পলিটিক্যাল সার্ভের (Geo-Political Survey) কয়েকটি শাখা এবং ফিল্ড ইন্টিলিজেন্স ইউনিটের কয়েকটি শাখা ছিল পূর্ব পাকিস্তানে।

বিমান বাহিনী

পিএএফ বেস, ঢাকা। বেস কমান্ডার-এয়ার কমোডর মোহাম্মদ জাফর মাসুদ

১৬টি এফ-৮৬ (স্যাবর) গ্রাউন্ড অ্যাটাক এয়ারক্রাফ্‌ট, ২টি এমআই-৮ এবং ২টি অ্যালুয়েট হেলিকপ্টার (চালনার জন্য ৭ জন পাইলট)।

এ হেলিকপ্টারগুলো পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত ৪ আর্মি এভিয়েশন স্কোয়াড্রন থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আনা হয়। সাময়িকভাবে এ হেলিকপ্টার বহরের নাম দেয়া হয় 'লজিস্টিক ফ্লাইট' বা সংক্ষেপে 'লগ ফ্লাইট' (Log Flight)। মেজর সৈয়দ লিয়াকত বোখারী ছিলেন 'লগ ফ্লাইটের' অফিসার কমান্ডিং। (২৫ মার্চের পর গোটা স্কোয়াড্রনটি ঢাকায় আনা হয়। আগস্ট মাসে মেজর বোখারী লে. কর্নেল পদে পদোন্নতি পান)।

নৌবাহিনী

হেডকোয়ার্টারস-চট্টগ্রাম

কমোডর কমান্ডিং ইস্ট পাকিস্তান (COMCEP)-রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ শরীফ।

৪টি গানবোট (Brooke Marine Patrol Craft)-পিএনএস ঢাকা, পিএনএস রাজশাহী, পিএনএস যশোর, পিএনএস, কুমিল্লা।

পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সামরিক প্রস্তুতি

একাত্তরের ২৫ মার্চের আগেই পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে। কোনো সামরিক উদ্দেশ্য বা বহিঃশত্রু মোকাবেলা নয়, একান্তই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। দু'বছর আগে (২৫ মার্চ ১৯৬৯) যখন জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশে সামরিক আইন জারি করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হিসেবে ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের স্থলে অধিষ্ঠিত হন তখন পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। সামরিক শাসক হিসেবে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বাহ্যত চলনে-বলনে এবং আচরণে ছিলেন আন্তরিক। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার কথা স্বীকার করলেন, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের আশ্বাস দিলেন এবং সশস্ত্র বাহিনীতে এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসনে বাঙালির অংশীদারিত্ব বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিও দিলেন।

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক শাসক ও রাজনীতিবিদদের প্রচলিত এবং মূল বিশ্বাসে আঘাত হানে। এই দুই শ্রেণীর বিচক্ষণ ও দূরদর্শী ব্যক্তিরা গুরুত্বসহকারে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার বিষয়ে বিচলিত হয়ে ওঠেন। অপরদিকে প্রচলিত ভাবনার এবং অদূরদর্শী নীতিনির্ধারকরা ক্রমেই পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমানোর দ্রুত ও সংক্ষিপ্ত সমাধানের পথ খোঁজে ব্রতী হন। কারো কাছেই এটা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি-কেবল স্বাধীনতাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানে সময়ের একমাত্র সমাধান।

উনসত্তরের গণআন্দোলন দমনে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর অন্যান্য ইউনিটের সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়নগুলোও নিয়োগ করা হয়। যে ক্রোধ আর ঘৃণা নিয়ে অবাঙালি সৈন্যরা বাঙালিদের ওপর নির্যাতন করে স্বভাবতই ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরা আদেশ পেয়ে সাধ্যমতো তা করা থেকে বিরত থাকে। উনসত্তরের নভেম্বর বিহারি-বাঙালি দাঙ্গা দমনেও বাঙালি সৈন্যদের নিয়োগ করা হয়। বাঙালি সৈনিকরা দাঙ্গা দমনে বাঙালিদের পক্ষ নেয় বলে তারা লক্ষ্য করে। বাঙালি সৈন্যদের এ আচরণ পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সামরিক নীতিনির্ধারকদের চোখ এড়ায়নি। জাতীয়তাবাদী চেতনায় পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত বাঙালি সৈন্যরা উজ্জীবিত হয়ে যাবে-এ চিন্তা তাদের গভীর উদ্বিগ্নতায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী চেতনায় বাঙালি সৈনিকরা সংক্রমিত হয়ে যাবে-এই ভয়ে ভীত হয়ে ওঠে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তানি সামরিক নীতিনির্ধারকরা। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের যে ভবিষ্যতে বাঙালিদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে না, সে বিষয়ে তারা মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে যান। সম্ভাব্য ভারতীয় আগ্রাসন মোকাবেলায় এই বাঙালি সৈন্যদের ভূমিকা কী হবে তা নিয়েও তারা সন্দিহান হয়ে ওঠেন। মনোগত ও আবেগগতভাবে বাঙালি সৈন্যরা যে বাকি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে নেই, তাও তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। এ বিষয়গুলো নিয়ে পাকিস্তানিরা আগেও যে ভাবেনি তা নয়। কিন্তু এখন যে করণীয়টুকু করার তার সময় যে শেষ এবং তারা কালক্ষেপণ করে ফেলেছেন তা পরিস্কার উপলব্ধি করেন। এমতাবস্থায় ঢাকাস্থ ১৪ ডিভিশনের জিওসি

মে. জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা পূর্ব পাকিস্তানে আরো অবাঙালি সেনা ইউনিট পাঠানোর জন্য এবং ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিকদের অবাঙালি ইউনিটে বদলি করে অবাঙালি সৈন্যদের দিয়ে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্য সংখ্যা পূরণের লিখিত প্রস্তাব জিএইচকিউ রাওয়ালপিন্ডিতে পাঠান।

১৪ ডিভিশনের জিওসি'র এই চিঠির প্রস্তাবনা জিএইচকিউর নীতিনির্ধারকদের গায়ে বাতাস লাগাতে পারেনি। এর যৌক্তিক কারণ ছিল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া উনসত্তরের ২৫ মার্চ ক্ষমতা আরোহণের পর স্বীকার করেন, পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়েছে এবং তার সরকার এই প্রভেদ দূরীকরণে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ২৮ জুলাই ১৯৬৯ ইয়াহিয়া এক বেতার ভাষণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের বর্তমান সংখ্যা দ্বিগুণ করার কথা ঘোষণা করেন এবং বলেন, বৈষম্য দূরীকরণে এটি একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ মাত্র। সংখ্যা দ্বিগুণ করলেও পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা দাঁড়াতো ১৫%। তখন বাঙালির অনুপাত ছিল পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬%। মে. জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা নীতিনির্ধারকদের চাপ দিতে থাকেন তার এই যুক্তিতে যে, পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার জন্য তার প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি। এরই মধ্যে মে. জেনারেল খাদিম জিএইচকিউ থেকে একটি 'অতি গোপনীয়' চিঠি পান। চিঠিতে তার প্রস্তাব বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নির্দেশনা আছে মনে করে চিঠি খুলে তিনি আবিষ্কার করেন অন্য কিছু। চিঠিতে কমান্ডার-ইন-চিফের (ইয়াহিয়া) আদেশের বরাত দিয়ে বলা হয়, কেবল বাঙালি সৈন্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আরো দু'টি (৮ এবং ৯ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট) গঠন করার। এ পর্যন্ত ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাতটি ব্যাটালিয়ন ছিল, যার চারটি ১, ২, ৩ এবং ৪ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবস্থান ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। জিএইচকিউ'র চিঠি পেয়ে মে. জেনারেল খাদিম উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন। তিনি এই আদেশের পরিণতি এবং তার আগেকার প্রস্তাবের যৌক্তিকতা বোঝাতে পরদিনই রাওয়ালপিন্ডি পৌছেন। তিনি সামরিক নীতিনির্ধারকদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, তাদের উদ্দেশ্য যদি পূর্ব পাকিস্তানে একটি 'বাঙালি সেনাবাহিনী' তৈরি করা হয় তবে ঠিক আছে। আর উদ্দেশ্য যদি হয় পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা করা, তবে তার প্রস্তাব বাস্তবায়ন আবশ্যক। এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া ছিল বাস্তবিকই কঠিন। রাজনৈতিক বিবেচনায় ইয়াহিয়া খানকে সামরিক বাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা বাড়ানোর আদেশ দিতে হয়েছে একরকম বাধ্য হয়েই। পাকিস্তানের সেনানায়কদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভিত্তি যত না ছিল রাজনৈতিক ততটা ছিল সামরিক বিবেচনা প্রসূত। সিদ্ধান্ত গ্রহণে এহেন দোদুল্যমান অবস্থায় যা হয় তাই হলো। ইয়াহিয়া উভয় চাপে একটি সঠিক সিদ্ধান্তের স্থানে একটি 'আপোস' সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন। প্রেসিডেন্ট এবং কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল ইয়াহিয়া আদেশ দিলেন ২৫% বাঙালি সৈনিককে পরীক্ষামূলকভাবে ফ্রন্টিয়ার ফোর্স, বেলুচ এবং পাঞ্জাব রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্ত করে এই শূন্যতা অবাঙালি সৈন্য দিয়ে পূরণ করতে। উদ্দেশ্য, এই পরীক্ষা সফল হলে বাঙালি-অবাঙালি ভবিষ্যতে মিশ্রণের এ অনুপাত আরো বাড়ানো। পরে যেন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের নাম এবং কিছু বাঙালি

সৈনিক ব্যতীত বাঙালি ইউনিট বলতে বস্তুত কিছুই না থাকে। এই প্রক্রিয়ায় ৩১ ডিসেম্বর (১৯৭০) তখন পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত ১ম, ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সম্মিলিত এক কোম্পানি সৈনিকদের ১৯ ফ্রন্টিয়ার ফোর্স (এফএফ) রেজিমেন্টের অন্তর্ভুক্তি প্যারেড (Induction Parade) আয়োজন করা হয় ঢাকা স্টেডিয়ামে। অত্যন্ত সতর্কতা ও কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে এই প্যারেডের ব্যবস্থা করা হয়। ১৪ ডিভিশনের জিওসি মে. জেনারেল খাদিম হোসেন রাজাসহ অন্যান্য সিনিয়র অফিসার বাঙালি সৈনিকদের বিদ্রোহের আশঙ্কায় শঙ্কিত ছিলেন। শেষতক অনুষ্ঠানটি শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে আন্দোলনরত রাজনীতিবিদদের সামরিক বাহিনী সম্বন্ধে জানার আগ্রহ ও জ্ঞান দুই ছিল সীমিত। ফলে তারা সেনাবাহিনীতে চলমান এই কর্মকান্ড সমন্ধে সচেতন ছিলেন না। সত্তরের জানুয়ারি মাসে যশোর সেনানিবাসে এমন একটি অন্তর্ভুক্তি প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এক প্ল্যাটুন সৈনিক ২৫ বেলুচ রেজিমেন্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয় আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের মাধ্যমে। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের মূল ভিত্তি ছিল আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি। গোটা বাঙালি জাতি তখন এই কর্মসূচি নিয়ে স্বাধিকার অর্জনে আন্দোলনরত। ৬ দফার শেষ দাবিই ছিল 'আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীনে আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে। সামরিক বাহিনীর ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যাটালিয়নগুলো এবং পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের (ইপিআর) উইংগুলোকে পাকিস্তানিকরণের যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা অগ্রসর হচ্ছিল সে সম্বন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিবিদদের অজ্ঞতা ও অনাগ্রহ ছিল মারাত্মক ক্ষতিকর। আঞ্চলিক নিরাপত্তার উদ্দেশ্য যে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের দাবিতে রাজনীতিবিদরা তখন আন্দোলনরত, বাঙালি এ সৈনিকরা ছিল সে ভাবি বাহিনী গঠনের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। রাজনৈতিক আলোচনায় অথবা রাজনৈতিক দাবির আকারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি কখনোই ওঠেনি।

৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭০ ছিল ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট তখন জয়দেবপুর রাজবাড়িতে অবস্থান করছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লে. জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন (বাঙালি), কর্নেল কমান্ড্যান্ট, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট; কর্নেল মোহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী (অব.); কর্নেল (জুলাই ১৯৭০ সালে ব্রিগেডিয়ার) মাহমুদুর রহমান মজুমদার, কমান্ড্যান্ট, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারসহ চাকরিরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র বাঙালি অফিসাররা এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া তখন ঢাকাস্থ ইস্টার্ন কমান্ড হেডকোয়ার্টারস-এ কর্তব্যরত সব সিনিয়র অফিসারও উপস্থিত ছিলেন। গভর্নরের বেসামরিক বিষয়ক উপদেষ্টা মে. জেনারেল রাও ফরমান আলী খান হাজির ছিলেন। ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হয়-১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮, ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৯, ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৬২ এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩ সালে। উনসত্তরে যে

জাতীয়তাবাদী চেতনায় বাঙালি আন্দোলিত হয়, তার হাওয়া বাঙালি সৈনিকদের গায়েও লাগে। কাকতালীয়ভাবে উপরোক্ত চারটি ব্যাটালিয়নের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীই ফেব্রুয়ারি মাসে। সত্তর এবং একাত্তরে এ ব্যাটালিয়ন চারটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয় ভিন্নরকম উপলব্ধি এবং অনুভূতির মধ্য দিয়ে। পাকিস্তানিরা বাঙালি সৈন্যদের এ মৌনতা ও উদ্বিগ্নতা অবলোকন করে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে। তারা ক্রমাগতভাবে আতঙ্কিত হতে থাকে এই ভাবনায়, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের এই ব্যাটালিয়নগুলো হয়ত বাঙালিদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে প্রকাশ্যে একাত্মতা ঘোষণা করবে। একাত্তরের মার্চ মাসের শুরু থেকেই বাঙালি সৈনিকরা গোপনে তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। তারা পরিষ্কার উপলব্ধি করে, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী হয়ত তাদের হত্যা বা নিরস্ত্র করবে। তারাও গোপনে অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র তাদের সঙ্গে রাখতে থাকে-সামরিক আইনে যা অনুমোদিত নয়। অবাঙালি অধিনায়ক এবং অফিসাররা এসব জেনেও হস্তক্ষেপ করতে সাহস পাননি। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম সেনানিবাসের ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং এর অব্যবহিত পরই চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট প্রতিষ্ঠার আদেশ আসে। লে. কর্নেল মোশতাক আহমেদ (বাঙালি) ৯ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়ক মনোনীত হন। ডিভিশন হেডকোয়ার্টারস থেকে তাকে ব্রিফিং নিয়ে কর্মস্থল চট্টগ্রামে যেতে আদেশ দেয়া হয়। পরবর্তী সময়ে ১৪ ডিভিশন হেডকোয়ার্টারসের বাথরুমে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। তার মৃত্যুর বিষয়ে দ্বিমত আছে। পাকিস্তানিরা তাকে গুলি করে মারে, না তিনি আত্মহত্যা করেন তা নিরূপণ হয়নি।

সত্তরের সেপ্টেম্বরের শুরুতে ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক মেজর আবদুল রশিদ জানজুয়া (অবাঙালি) পদোন্নতি পেয়ে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। এর অল্পদিন পর ২য় ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমান ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের উপ-অধিনায়ক হিসেবে যোগদান করেন। তার স্থলে ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ মেজর কাজী মোহাম্মদ সফিউল্লাহ ২ ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক হয়ে আসেন। ঢাকাস্থ ৫৭ ব্রিগেডের ব্রিগেড মেজর, মেজর খালেদ মোশাররফকে তার আগেকার ইউনিট ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, কুমিল্লা সেনানিবাসে বদলি করা হয় উপ-অধিনায়ক হিসেবে। তিনি একাত্তরের ২২ মার্চ কুমিল্লায় যোগদান করেন। তাছাড়া ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নামে ছাত্রদের সামরিক প্রশিক্ষণের জন্য একটি ব্যাটালিয়ন ছিল ঢাকা সেনানিবাসে। এটি অন্যান্য ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের মতো নিয়মিত পদাতিক ব্যাটালিয়ন ছিল না। এ ব্যাটালিয়নটির নাম ছিল 'ন্যাশনাল সার্ভিস ব্যাটালিয়ন'। অল্প কয়েকজন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার (জেসিও) এবং স্বল্প সংখ্যক নন-কমিশন্ড অফিসার (এনসিও) কেবল প্রশিক্ষণের জন এই ব্যাটালিয়নে নিয়োজিত ছিল। ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন লে. কর্নেল মুয়ীদউদ্দিন আহম্মেদ (বাঙালি)।

সত্তরের ৭ ডিসেম্বর সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় বাঙালিদের মধ্যে অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য এবং চোখে নতুন স্বপ্ন এনে দেয়। বাঙালি রাজনীতিবিদরা

ফেব্রুয়ারি মাস থেকে প্রায় অচলাবস্থায় পৌঁছে যাওয়া রাজনৈতিক সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান খোঁজায় ব্যস্ত থাকেন। বিভিন্ন সেনানিবাসে বাঙালি সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে বিরাজ করে চরম অনিশ্চয়তা। বিরাজমান সমস্যা তারা কিছুটা উপলব্ধি করলেও সেনাবাহিনীর কঠোর শৃঙ্খলা ও পাকিস্তানিদের নিবিড় তদারকির মধ্যে তাদের বস্তুত কিছুই করার ছিল না। সে বিবেচনায় ইপিআর-এর সৈনিকরা ভালো অবস্থায় ছিল। বেসামরিক ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ-আলোচনার তাদের যথেষ্ট সুযোগ ছিল। পিলখানার সদর দফতর ছাড়া সেক্টর সদর দফতর, উইং সদর দফতর, বিওপিগুলোর (বর্ডার অবজারভেশন পোস্ট) অবস্থান ছিল যথাক্রমে জেলা শহর, মহকুমা শহর এবং সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। ইপিআর সৈনিকরা তাদের সাধ্যমতো প্রস্তুতি নেয়। উইং সদর দফতরের অবস্থা ছিল একটু ভিন্ন। প্রতি উইংয়ে উইং কমান্ডার ছিলেন একজন মেজর। দু'জন ক্যাপ্টেন, কখনো কখনো একজন ক্যাপ্টেন সহকারী উইং কমান্ডার হিসেবে থাকতেন।

উইং মেডিকেল অফিসার হিসেবে আর্মি মেডিকেল কোরের একজন ক্যাপ্টেন (ডাক্তার) থাকার কথা থাকলেও প্রায়ই কেউ পোস্টেড থাকতো না। সেক্টর সদর দফতরে সেক্টর কমান্ডার ছিলেন লে. কর্নেল এবং সেক্টর উপ-অধিনায়ক ছিলেন মেজর। একজন মেজর (ডাক্তার) থাকতেন সেক্টর মেডিকেল অফিসার হিসেবে। ইপিআর-এর সব অফিসারই সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে নিয়োজিত থাকতেন এবং এরা প্রায় সবাই ছিলেন অবাঙালি। সৈনিকদের ক্ষেত্রে প্রায় ৯৫% ছিল বাঙালি। সেনাবাহিনীর কিছু অফিসার বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ব্যক্তিগত পর্যায়ে জাতীয় পরিষদের সদস্য কর্নেল এমএজি ওসমানী (অব.) এবং ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায়ের এবং নীতিনির্ধারক পর্যায়ে যোগাযোগ করেন। তারা সেনানিবাসগুলোর ভেতরের পরিস্থিতি ও বাঙালি সৈনিকদের প্রতি সম্ভাব্য নির্দেশ ও ভবিষ্যৎকরণীয় সম্বন্ধে জানতে চান। তারা পাকিস্তানি সৈনিকদের চরম বাঙালিবিদ্বেষমূলক আচরণ ও যুদ্ধ প্রস্তুতির বৃত্তান্ত ও বর্ণনা করেন। উত্তরে এ অফিসারদের অপেক্ষা করতে নির্দেশ দেয়া হয় এবং বলা হয়, সময় এলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হবে। অপরদিকে পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানে বাড়তি সৈন্য সঞ্চালন করতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে অতিরিক্ত সৈন্যই কেবল আনা হচ্ছিল না, বেশ কয়েকজন বিশেষজ্ঞ অফিসার ও কয়েকজন বাড়তি জেনারেলও আনা হয়। বাঙালি রাজনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগের নেতারা বরাবরই সামরিক বিষয়গুলোর ওপর রাজনৈতিক বিবৃতি দিয়ে তৃপ্ত থাকেন।

বস্তুত বাঙালি সৈনিকরা, যদি কোনো রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানো না যায় তাহলে যে সম্ভাব্য সশস্ত্র সংগ্রাম ও প্রতিরোধের জন্য যে অপরিহার্য হয়ে উঠবে সে ভাবনায় কেউই ভাবিত হয়নি। ইপিআর-এর বাঙালি অফিসার ও সৈনিকরাও একই পরিস্থিতিতে থাকে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ৮টি ব্যাটালিয়নের মধ্যে ৫টি ব্যাটালিয়ন তখন পূর্ব পাকিস্তানে। ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট যশোর সেনানিবাসে, ২য় ইস্ট বেঙ্গল জয়দেবপুর রাজবাড়ীতে, ৩য় ইস্ট বেঙ্গল সৈয়দপুর সেনানিবাসে, ৪ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কুমিল্লা সেনানিবাসে, ২৫ মার্চে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট চট্টগ্রাম শহরের ষোলশহরের এলাকায় অবস্থিত ছিল। বাকি তিনটি

ব্যাটালিয়ন ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তানি সামরিক নীতি-নির্ধারকরা সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে, পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সামরিক পদক্ষেপ নেয়া হলে বাঙালি সৈনিকরা বিদ্রোহ করবে এবং প্রথম প্রতিরোধ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলো থেকেই আসবে। ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সত্তরের ৩০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম সেনানিবাসে প্রতিষ্ঠার পরপরই ৮ম ইস্ট বেঙ্গলকে পশ্চিম পাকিস্তানের খারিয়া সেনানিবাসে বদলি করার নির্দেশ আসে। নির্দেশ মতো ব্যাটালিয়নের ভারি সব অস্ত্রসহ এক কোম্পানি সৈন্য অগ্রগামী দল হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যায়।

বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের আক্রমণের মুখে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টগুলোর সংঘবদ্ধ ও পরিকল্পিত প্রতিরোধ এড়ানের জন্য ব্যাটালিয়নগুলোকে বিভিন্ন অজুহাতে সেনানিবাসগুলোর বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ পর্যায়ে বাঙালি সৈনিকরা কোথাও কোথাও স্থানীয় জনসাধারণ এবং রাজনীতিবিদদের সংস্পর্শে আসেন। এ ক্ষেত্রে তারা গোপনে সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রস্তুতিও নিতে থাকেন। কিন্তু এর সবই ছিল বিচ্ছিন্ন ও সমন্বয়হীন। ইবিআরসি, ৫টি ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন এবং ১৭টি ইপিআর উইং, পুলিশসহ অন্যান্য আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে কোনো যোগাযোগ ও সমন্বয় ছিল না। জেলা পুলিশ এবং আনসারদের অস্ত্র ও গুলি মহকুমা সদরে ট্রেজারিগুলোতে থাকতো। আনসারদের জন্য সংরক্ষিত রাইফেল সংগ্রহ ও ব্যবহারের কোনো কেন্দ্রীয় নির্দেশনা ছিল না। যদিও ২৫ মার্চের পর প্রায় ক্ষেত্রেই ট্রেজারির অস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা হস্তগত করতে সক্ষম হয়।

মার্চ মাসে পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ এবং আনসারদের সংখ্যা

ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের সৈন্য-৩,৫০০, ইবিআরসিতে রিক্রুটসহ (প্রশিক্ষণরত সৈনিক) সৈন্য-২,৫০০, ইপিআর-১৫,০০০, বিভিন্ন হেডকোয়ার্টার এবং ইস্ট বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন ব্যতীত অন্যান্য রেজিমেন্ট/ব্যাটালিয়ন/সামরিক প্রতিষ্ঠান/স্থাপনায় চাকরিরত ১,৫০০, বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীতে চাকরিরত-৫০০, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন ইউনিট থেকে ছুটি ভোগরত-১,০০০, যুদ্ধের জন্য ইচ্ছুক এবং শারীরিকভাবে সুস্থ অবসরপ্রাপ্ত ১০,০০০ মোট ৩৪,০০০ সৈন্য। তাছাড়া রাইফেল পরিচালনায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ-২০,০০০ এবং আনসার ১০,০০০ গোটা প্রদেশে ছড়িয়ে ছিল। মোদ্দাকথা পাকিস্তানিদের সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিহত এবং প্রতিরোধ করার জন্য সর্বমোট ৬৪,০০০ লোক পূর্ব পাকিস্তানে উপস্থিত ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যসংখ্যা ছিল ২৫,০০০। তাছাড়া সব বাঙালি জনগণ ছিল পাকিস্তানবিরোধী (হাতেগোনা অল্প কিছু লোক ব্যতীত) এবং স্বাধীনতার জন্য অথবা পাকিস্তানি সামরিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বা সহায়তা করতে সর্বাত্মকভাবে প্রস্তুত। যেসব বাঙালি ঠিকাদার বিভিন্ন সেনানিবাসে পচনশীল খাবার (মাছ, মাংস, মুরগি, ডিম, দুধ, সবজি, আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদি) সরবরাহ করত তারাও সব সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রশদ ও টিনজাত খাদ্যের ওপর তখন তাদের নির্ভর করতে হয়। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে তখন কার্যত দখলদার বাহিনী ও অবাঞ্ছিত

হিসেবে দেখা হয়। বাস্তবে তারা সেনানিবাসগুলোতে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে। এত বিপুল জনসমর্থন এবং বিশাল যুদ্ধক্ষম লোকবল সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়নি। এদের সংগঠিত করে পরিকল্পিতভাবে প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য কাজে লাগাতে পারলে পাকিস্তানিরা নির্বিচারে হত্যা করার সুযোগ পেতো না। মুক্তিযুদ্ধ এত রক্তাক্ত এবং প্রলম্বিত হওয়ারও প্রয়োজন হতো না।

একাত্তরের মার্চের ১-১০ তারিখের মধ্যে ভারতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এটি ছিল মধ্যবর্তী নির্বাচন এবং ভারতের পঞ্চম সাধারণ নির্বাচন। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস (আই) নির্বাচনে জয়ী হয়। মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। ১২ নভেম্বর ১৯৬৯ কংগ্রেস থেকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ইন্দিরা গান্ধীকে বহিষ্কার করা হয়। ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেস (আই) নামে বিভাজিত দল তৈরি করেন একাত্তরে যাদের নির্বাচনী স্লোগান ছিল-'গরিবি হটাও'। কংগ্রেস (এম) নির্বাচনী স্লোগান দেয় 'ইন্দিরা হটাও'। অনিশ্চিত এবং অস্থির অবস্থায় ইন্দিরার বিজয় ছিল পরবর্তী বিচারে একটি মাইলফলকতুল্য ঘটনা। কাজেই নির্বাচনপূর্ব রাজনৈতিক প্রচারণা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের জন্য ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করতে পারেনি। এমনকি ইন্দিরা গান্ধী সরকার গঠনের পরে ২৫ মার্চের পূর্ব পর্যন্ত যে অল্পদিন সময় পেয়েছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের সার্বিক মূল্যায়নের জন্য তা যথেষ্ট ছিল না। ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW-Research and Analysis Wing) আরএন কাও-এর নেতৃত্বে ১৯৬৮ সালে গঠিত হলেও কেন্দ্রীয় সরকারের অনাগ্রহ ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে তাদের কাজের পরিধি ও দক্ষতা ছিল সীমাবদ্ধ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের চিফ অব স্টাফ মে. জেনারেল জেএফআর জ্যাকব বলেন, 'র' আমাদের তেমন কিছুই দিতে পারেনি। (The Research and Analysis Wing (RAW) gave us next to nothing) (Surrender at Dacca-Birth of a Nation, p. 47)

উপসংহার

ইতিহাসে 'যদি' শব্দের কোনো স্থান নেই। একাত্তরের মার্চে সৈন্য সংখ্যার আধিক্য ছিল বাঙালিদের। সর্বোপরি ছিল গণমানুষের অকুণ্ঠ ও শেষ সম্বলের সমর্থন। কূটনৈতিক এবং রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতা ছিল প্রকট। তারপরও করণীয় কাজ করা হয়নি। আমরা যুদ্ধবাজ জাতি নই। সব সমস্যার সমাধান আমরা শান্তিপূর্ণভাবে চাই, যতক্ষণ না পর্যন্ত যুদ্ধ অপরিহার্য না হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের ওপর ভবিষ্যতের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধে যেন একাত্তরের শিক্ষা ভুলে না যাই।

স্মৃতি ভাস্বর একাত্তর

আখতারুজ্জামান মণ্ডল

উনসত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে আইয়ুব খান-ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানি সামরিকজান্তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে আমরা সার্বক্ষণিক সম্পৃক্ত ছিলাম। ইতিহাসের এই শ্রেষ্ঠ গণঅভ্যুত্থান ও সংগ্রামের ফলে '৭০-এর সাধারণ নির্বাচন এবং '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ। আমরা যারা সংগ্রাম-আন্দোলনে লিপ্ত ছিলাম, তাদের মাঝে আমাদের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতেই হবে এই মানসিকতায় উদ্দীপ্ত ছিলাম। ৭ মার্চ '৭১ রেসকোর্স মাঠে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বক্তৃতা দেয়ার পর আমরা আর কোনো নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলাম না। তৎকালীন কুড়িগ্রাম মহকুমার বিশেষ করে ভূরুঙ্গামারী, নাগেশ্বরী ও ফুলবাড়ী সীমান্তে ইপিআর ফাঁড়িগুলোয় বাঙালি ইপিআরদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলি। যদিও বাঙালি ইপিআররা যুদ্ধ করার মানসিকতা নিয়ে প্রস্তুত হয়েই ছিল। চিলমারী সীমান্ত ফাঁড়ি থেকে ইপিআর সদস্য আনিস মোল্লা অস্ত্রসহ (স্টেনগান) রওশনের সঙ্গে কুড়িগ্রাম এলেন। পরিকল্পনা অনুযায়ী আনিস মোল্লার নেতৃত্বে ভূরুঙ্গামারীর জয়মনিরহাটস্থ (শহীদ সামাদ নগর) ইপিআর কোম্পানি হেডকোয়ার্টারের অবাঙালি ইপিআর সুবেদার ও অবাঙালি ইপিআরদের (মোট ৭ জন) হত্যা করে বিভিন্ন সীমান্ত ফাঁড়ির ইপিআরদের সমন্বয়ে ২৫ মার্চ অপরাহ্ণে তিস্তায় তিস্তা পুলের পাড় ঘেঁষে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলি এবং লালমনিরহাটসহ সমগ্র কুড়িগ্রাম মহকুমা আমাদের দখলে মুক্ত রাখতে সক্ষম হই। ভূরুঙ্গামারীতে আমাদের হেডকোয়ার্টার এবং রায়গঞ্জ, নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম, টগরাইহাট, শিঙ্গেরডাবরী ও লালমনিরহাটে অস্থায়ী ঘাঁটি স্থাপিত হয়।

ভূরুঙ্গামারীতে কলেজ, হাইস্কুল এবং বঙ্গসোনাহাটে ইপিআরদের তত্ত্বাবধানে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ট্রেনিং ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২২ এপ্রিল পাকিস্তানি জান্তা কুড়িগ্রাম শহর দখল করে নেয়। আমরা ধরলা নদীর অপর পাড়ে পাটেশ্বরী বরাবর ডিফেন্স প্রতিষ্ঠা করি এবং নাগেশ্বরী, ফুলবাড়ী ও ভূরুঙ্গামারী শত্রুমুক্ত রাখতে সক্ষম হই। ২৭ মে নরপশু পাকিস্তানি বাহিনী ধরলা নদী অতিক্রম করে নাগেশ্বরী ও ভূরুঙ্গামারী দখল করে। ভূরুঙ্গামারীস্থ আমাদের হেডকোয়ার্টার ভারতের কুচবিহার জেলা দিনহাটার সাহেবগঞ্জে স্থানান্তর এবং সঙ্কোষ নদীর পূর্ব পাড়ে বহালগুড়ি থেকে মাদারগঞ্জ পর্যন্ত বিশাল এলাকা শত্রুমুক্ত রাখতে সক্ষম হই।

১ আগস্ট সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগ মুহূর্ত এমন সময় ইনফরমার খবর নিয়ে এলো, আজ শেষ রাতে পাকবাহিনীর কয়েকজন পদস্থ কর্মকর্তা নাগেশ্বরী থেকে

ভূরুঙ্গামারী আসবে। আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, পাকা রাস্তা কেটে এন্টি ট্যাঙ্ক মাইন স্থাপন করে পাক বাহিনীর গাড়ি উড়িয়ে দেব। আন্ধারী ঝাড়ের উত্তরদিকে বাঁশের ঝোপের কাছে পাকা রাস্তা কেটে মাইন বসানো হবে। রাস্তার পাশের বাঁশের ঝোপ থেকে ফুলকুমার নদী প্রায় সিকি মাইল পশ্চিমে। প্রয়োজনে দ্রুত নদী অতিক্রম করে নিরাপদ ও সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করা সম্ভব। সুতরাং এ জায়গাকেই মাইন বসানোর উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হলো। রাতে সাধারণত পাক বাহিনী খুব কম যাতায়াত করে। এ সময় এসব জায়গায় কেবল রাজাকাররা টহল দিয়ে বেড়ায়। আরো জানা গেল, আন্ধারী ঝাড় থেকে জয়মনিরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত একমাত্র এই রাস্তা দিয়ে রাজাকাররা খুব কমই টহল দেয়। রাত ১১টায় ক্যাম্প থেকে বের হওয়ার আগ মুহূর্তে অপারেশনের অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধাদের দাঁড় করিয়ে ব্রিফ করা হলো। আমরা চারটি দলে বিভক্ত হলাম। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, প্রত্যেক দলে বিশজন এবং চতুর্থ দলে দশজন—মোট সত্তরজন এই অপারেশনে অংশগ্রহণ করব ঠিক হলো। প্রথম দল বাঁশঝোপের পাঁচশ' গজ উত্তরে ও দ্বিতীয় দল পাঁচশ' গজ দক্ষিণে অবস্থান গ্রহণ করবে। তৃতীয় দল রাস্তা কেটে মাইন স্থাপন করবে। চতুর্থ দল তৃতীয় দলের সোজা পশ্চিমে ফুলমার নদীর পাড়ে অবস্থান গ্রহণ এবং অপারেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধান করবে। আমাদের প্রত্যেক দলের কাছে ওয়্যারলেসে সেট, প্রথম ও দ্বিতীয় প্রত্যেক দলের কাছে চারটি এলএমজি, বাকি সব অস্ত্র এসএলআর। তৃতীয় দলের কাছে শুধু মাইন আর রাস্তা কাটার কোদাল-শাবল। চতুর্থ দলের কাছে দুটি এলএমজি, এসএলআর এবং এসএমজি। রাত ১টার মধ্যে যার যার নির্ধারিত স্থানে অবস্থান গ্রহণ করা হলো। প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে অন্তত পনেরো হাত পাকা রাস্তা কাটা হয়ে গেল। রাস্তার পাকা স্তর চাপ চাপ করে কাটা হয়েছে। ছয়টি এন্টি-ট্যাঙ্ক মাইন স্থাপন করা হলো এবং এগুলোকে আবৃত করা হলো এমন সুচারুভাবে, মাইন আছে শত্রু সৈন্য যাতে কোনোমতেই বুঝতে না পারে—এ রকম কৌশলে। নিরাপদে মাইন বসানোর কাজ স্বল্পসময়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করা হলে তৃতীয় দল চতুর্থ দলের সঙ্গে এবং প্রথম ও দ্বিতীয় দল একসঙ্গে পাঁচশ' গজ দূরত্বের ব্যবধানে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী অবস্থান গ্রহণ করল। আমাদের অবস্থান থেকে রায়গঞ্জ ব্রিজে পাকিস্তানি দস্যুদের অবস্থানের আলো মিটমিট দেখা যাচ্ছে। ঠিক এমন সময় আসামের রূপসী বিমান ঘাঁটিতে জেনারেল অরোরার কথা মনে পড়ল।

৮ এপ্রিল বিকেলে বিএসএফ সুবেদার রবীন মেহেরা ও ক্যাপ্টেন যাদব ভূরুঙ্গামারীতে এলেন। বিভিন্ন খবর নেয়ার পর এক পর্যায়ে এই এলাকার এমএনএ, এমপিএদের অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে আজকেই রাত ৯টার মধ্যে বিএসএফ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করলেন। এ সময় শামছুল হক চৌধুরী ছিলেন না। তিনি সন্ধ্যার আগেভাগে এলেন। আমি তাঁকে সব বললাম। মোজাহার চৌধুরী এমএনএ ও আবদুল হাকিম এমপিএ সীমান্তের ওপারে ভারতের সাহেবগঞ্জে আশ্রয় নিয়েছেন। সন্ধ্যায় মোটরসাইকেলে করে শামছুল হক চৌধুরীকে নিয়ে সীমান্তের ওপারে ভারতের সাহেবগঞ্জে তাদের খুঁজে বের করতে গেলাম। একটু একটু বৃষ্টি ও বেশ ঠাণ্ডার

মধ্যে অনেক চেষ্টার পর মোজাহার হোসেন চৌধুরী ও আব্দুল হাকিমকে পাওয়া গেল। বিলম্ব না করে আমাদের সঙ্গে তাদের সোনাইহাট বিএসএফ ফাঁড়িতে যেতে বলা হলো। তারা যেতে সম্মত হলেন না। মোজাহার হোসেন চৌধুরী শামছুল হক চৌধুরীকে বললেন, 'সোগে তো তুই করবার লাগছিস, হামার গুলাক নিয়া আর টানাটানি না করিস। যা করবার হয় তুই কর'। অগত্যা বাধ্য হয়ে ভূরুঙ্গামারীতে ফিরে এলাম। বৃষ্টির মধ্যে রাত আটটায় থানা ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াউদ্দিন আহমেদকে সঙ্গে নিয়ে আমরা জিপে সোনাইহাট রওনা হলাম। সোনাইহাট বিএসএফ ফাঁড়িতে পৌছানোর পর মুষলধারে বৃষ্টি ঝরতে লাগল। তাই বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বৃষ্টির মধ্যেই রাত ১২টায় কর্নেল আর দাস বিএসএফের দু'টি জিপে করে আমাদের নিয়ে চললেন। বৃষ্টি আর অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। পানবাড়ি পাহাড়ের মধ্যে গাড়ি কিছুক্ষণের জন্য থামল, পথ ঠাহর করা যাচ্ছে না। আমরা গাড়িতে বসে থাকলাম। এখানে অনেকবার এসেছি। হঠাৎ এই সময় বিজলি চমকালো। তার আলোয় চকিতে পানবাড়ি বিএসএফ হেডকোয়ার্টার চিনতে পারলাম। আমাদের গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। কিন্তু কিছুদূর এগিয়েই আবার গাড়ি থামলো। না, কোনো কিছু আর চেনা যাচ্ছে না। ঘোর অন্ধকার রাত আর তুমুল বৃষ্টি। কিন্তু থামলে চলবে না। তাই ধীরে উঁচু-নিচু আঁকাবাঁকা পথে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে আমাদের গাড়ি চলতে লাগলো। এক সময় কর্নেল আর দাস বললেন, আগামীকাল আপনাদের বড় নেতার সঙ্গে দেখা হবে। সেজন্য আপনাদের নিয়ে রূপসী যাচ্ছি। আমি বললাম, বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে? কর্নেল বললেন, 'বঙ্গবন্ধু কিনা জানি না, তবে আপনাদের উচ্চ পর্যায়ের নেতাই তিনি'। তিনি আরো বললেন, 'বঙ্গবন্ধু যদি সত্যিই আসেন, আর ভগবানের কৃপায় যদি তাকে দেখতে পাই, তাহলে জীবনটা সার্থক হবে, আমার চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই থাকবে না।' বঙ্গবন্ধু কোথায় কীভাবে আছে, আমরা তখনো কিছু জানি না। নিশ্চিত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হতে যাচ্ছে ভেবে আমরা শিহরিত ও পুলকিত বোধ করছিলাম। সারা রাত আমাদের গাড়ি চলল। কোনো কষ্ট বা অবসাদ কিছুই বোধ হচ্ছিল না।

এক সময় সকাল হলো, গাছের ফাঁকে ফাঁকে সূর্য উঁকি দিল। আমাদের গাড়ি চলছে তো চলছেই। কখনো সমতল, কখনো উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ছুটছে। মাঝে মাঝে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠছি, কখন রূপসী পৌছব। অবশেষে ৯ এপ্রিল সকাল আটটায় জঙ্গলঘেরা রূপসী বিমান ঘাঁটিতে পৌছে গেলাম। আমাদের বিমান ঘাঁটির রেস্টহাউজে নিয়ে যাওয়া হলো। ব্রিটিশ শাসনামলে জাপানের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ বেধে গেলে ইংরেজরা এই রূপসী বিমান ঘাঁটি তৈরি করেছিল। রেস্টহাউজে চিলমারীর এমএনএ সাদাকাত হোসেন ছক্কু মিয়াকে পাওয়া গেল। তিনি বললেন, শাড়ি ও বোরখা পরে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আব্দুল মান্নান পায়ে হেঁটে অনেক কষ্টে গতকালই সীমান্ত অতিক্রম করে আসাম পৌছেছেন। হাঁটতে হাঁটতে সৈয়দ নজরুল ইসলামের পা ফুলে গেছে। তারা খুবই পরিশ্রান্ত, এখন ঘুমাচ্ছেন।'

হাত-মুখ ধুয়ে নাস্তা খেয়ে চা-পান করছিলাম। এমন সময় চারদিক তাকিয়ে দেখার সুযোগ পেলাম। দেখা গেল, বিমান ঘাঁটির চারদিকে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর

সদস্যরা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে কড়া পাহারা দিচ্ছে। জলপাই রঙের পোশাক পরিহিত সৈন্যদের রূপসীর ঘন জঙ্গলের সবুজের অপূর্ব সমারোহের ভেতরে হঠাৎ করে আবিষ্কার করা খুবই কঠিন।

বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, আওয়ামী লীগ নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও আব্দুল মান্নান সাহেবের সঙ্গে তখনো আমাদের দেখা হয়নি। জানা গেল, তারা হাত-মুখ ধুয়ে তৈরি হচ্ছেন। সামরিক বাহিনীর কয়েকটি জিপ রেস্টহাউজের গেটে এসে থামলো। কর্নেল আর দাস এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসার আমাদের জিপে উঠতে অনুরোধ করলেন। শামছুল হক চৌধুরী ও আমি এক জিপে, অপরটি সৈয়দ নজরুল এবং আব্দুল মান্নান সাহেবকে নিয়ে রেস্টহাউজের অপর প্রান্তে বিমান ঘাঁটির লাউঞ্জে এলো। আমাদের একটি কক্ষে বসতে দেয়া হলো। আমাদের সঙ্গের অন্যদের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমরা চুপচাপ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, সামনে কী ঘটছে তাই দেখার জন্য। বুক দুরু দুরু করে কাঁপছে বঙ্গবন্ধুকে কাছে পাব, দেখতে পাব—এই প্রত্যাশায়। সকাল সাড়ে দশটায় একটা বিমান অবতরণ করল। বিমান থেকে প্রথমে নেমে এলেন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় অধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরা। তার সঙ্গে শেখ ফজলুল হক মণি, তাজউদ্দীন আহমেদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কয়েকজন ঊর্ধ্বতন ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তা। আমাদের পাশের হলঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। সবার সঙ্গে করমর্দন ও পরিচয় হলো। সবার সঙ্গে করমর্দন ও পরিচয় হলে মণি ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কীভাবে এসেছিস, তোরা কোথায় আছিস'? আমি একপাশে দাঁড়িয়ে সংক্ষেপে তিস্তায় সংগঠিত আমাদের প্রতিরক্ষা অবস্থান, বিশাল মুক্ত এলাকা এবং ভূরুঙ্গামারী প্রধান ঘাঁটির কথা জানালাম। আমি বলছিলাম কিন্তু তিনি শুনছিলেন কিনা জানি না। কারণ তাকে খুবই অস্থির ও উত্তেজিত দেখা গেল। বঙ্গবন্ধুকে না দেখে আমরা নিরাশ হলাম। আলোচনা শুরু হলো। শামছুল হক চৌধুরী বিস্তারিত বলছেন। জেনারেল অরোরা জানতে চাইলেন, বর্তমানে আমাদের ডিফেন্স কোথায়, কীভাবে রয়েছে? কী কী অস্ত্র আছে? ইপিআরসহ মুক্তিযোদ্ধা কতজন, সামরিক বাহিনীর অফিসার ও সদস্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে কিনা, ট্রেনিং সেন্টার কয়টি ইত্যাদি। শামছুল হক চৌধুরী সংক্ষেপে অবগত করলেন। আমাদের বর্তমানে সবচেয়ে বড় অসুবিধা অস্ত্র, গোলাবারুদ ও খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতার বিষয়ে তাকে জানানো হলো। দেয়ালে লাগানো বাংলাদেশের বড় একটা মানচিত্রের সামনে জেনারেল অরোরা দাঁড়িয়ে শামছুল হক চৌধুরীকে ডাকলেন। বর্তমানে আমরা কোন কোন অঞ্চল মুক্ত রেখেছি, আমাদের ডিফেন্স ও মধ্যবর্তী ঘাঁটি কোথায় ইত্যাদি জনাব চৌধুরী মানচিত্রে আঙ্গুল নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন। সমগ্র কুড়িগ্রাম মহকুমা আমরা মুক্ত রেখেছি দেখে জেনারেল অরোরা খুব খুশি হয়ে বললেন, 'ভেরি গুড।' তিস্তা পুল বরাবর লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ কষে তিনি বললেন, 'ইয়ে তিস্তা ব্রিজ তোড় দিজিয়ে, তিস্তা ব্রিজকা ইধার ডিফেন্স আচ্ছা করনে হোগা'।

বিস্তারিত আলোচনার পর শামছুল হক চৌধুরীকে আমাদের এই উত্তরাঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র গ্রহণ, সার্বিক দায়িত্ব পালনের কর্মভার অর্পণ করা হলো, সেই

সঙ্গে তার স্বাক্ষরও সত্যায়িত করে নেয়া হলো। সৈয়দ নজরুল ইসলাম শামছুল হক চৌধুরীকে পারিবারিক কুশলাদি জিজ্ঞেস করলেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামের খবর জানতে চাইলে তিনি প্রায় অস্থির হয়ে উঠলেন এবং বললেন, তারা কোথায় আছে তিনি জানেন না। বললেন, তিনি একাই চলে এসেছেন। নেতাদের আমাদের বিস্তীর্ণ এলাকার হেডকোয়ার্টার ভূরুঙ্গামারীতে অবস্থানের জন্য অনুরোধ করা হলো। আলোচনা করা হলো মুক্ত এলাকার বিভিন্ন সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে। আমাদের মুক্ত এলাকায় স্বাধীন বাংলা বেতার খোলার জন্য রেডিও ট্রান্সমিটার এবং সম্ভাব্য সব ধরনের সাহায্য প্রদানের আশ্বাস দেয়া হলো। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বললেন, 'এখনো বহুবিধ অসুবিধা রয়েছে। আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার এখনো গঠিত হয়নি। সরকার গঠিত হলে বৈদেশিক সমর্থন ও সাহায্য পেতে সুবিধা হবে। মুক্তিযুদ্ধ সঠিক ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য অচিরেই বিপ্লবী সরকার গঠন করা হচ্ছে। সরকার গঠিত হওয়ার পর সব অসুবিধা ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে এবং এবটি সুষ্ঠু সমন্বয় ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। তবে স্বাধীনতা যুদ্ধ করলে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার এবং অসুবিধার সম্মুখীন হওয়াটা স্বাভাবিক। সবকিছু পরিহার করে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে যেতেই হবে। যুদ্ধ মানেই কষ্ট, জীবন বাজি রাখা, মনে রাখতে হবে'। বঙ্গবন্ধু কোথায় জানতে চাইলে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হলো। কারো মুখে কোনো কথা নেই। সবার চোখ ছলছল করছে। নেতারা যেন বোবা হয়ে গেছেন। তারা শুধু বললেন, 'নেতা আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন এবং আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন'। প্রায় দু'ঘণ্টা পর তারা বিদায় নিলেন। বিমান সবুজ' বনানীর ওপর দিয়ে উড়ে গেল, যতক্ষণ দেখা গেল আমরা তাকিয়ে থাকলাম। কর্নেল আর দাসসহ আমরা ফিরে এলাম। দিনের অবস্থা ও আবহাওয়া বেশ সুন্দর, আমাদের জিপ দ্রুত ছুটে চলল। সন্ধ্যার পর আমরা ঘোলকগঞ্জ পৌঁছলাম। আমাদের জিপের শব্দ পেয়ে শত শত মানুষ রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে গেল। জিপ থামাতে হলো। ভারতীয় বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিক অপেক্ষা করছিলেন। বিদেশী সাংবাদিকরাও রয়েছেন। সাংবাদিকরা জিপ ঘিরে দাঁড়ালেন। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করতে লাগলেন। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা? এখন তিনি কোথায় রয়েছেন, কেমন আছেন? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। শামছুল হক চৌধুরী শুধু বললেন, 'নেতা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এবং নেতৃত্ব দিচ্ছেন'। সোনাহাট বিএসএফ ফাঁড়িতে আসার পর রাতেই সামরিক কর্মকর্তাদের সামনে পুনরায় শামছুল হক চৌধুরীর স্বাক্ষর সত্যায়িত করে নেয়া হলো। পরদিন ১০ এপ্রিল আসামের গৌহাটি থেকে প্রকাশিত দৈনিক অহম, কলকাতা থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগান্তর ও আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় হেডলাইনে খবর বের হলো, 'আসামের কোনো এক জঙ্গলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে শামছুল হক এমপিএর সাক্ষাৎ লাভ'।

শামছুল হক চৌধুরীর স্বাক্ষর সত্যায়িত করে নেয়ার পর অস্ত্র সরবরাহ পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ে দুটি এলএমজি, দুটি ৮১ মি.মি. মর্টার, এক্সপ্লোসিভ, রকেট লঞ্চার, গ্রেনেড এবং প্রচুর গুলি পাওয়া গেল। বঙ্গবন্ধুর বিষয়টি মর্মান্তিকভাবে আমাদের ভাবিয়ে তুলল। বঙ্গবন্ধু কোথায়, কীভাবে রয়েছেন, কোনো

সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। তার কথা যখনই মনে হয়, তখনই আঁতকে উঠি এই ভেবে যে, তিনি আদৌ বেঁচে রয়েছেন কিনা, নরপশুরা বাংলার শিরোমণিকে এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে কিনা? শামছুল হক চৌধুরী এবং আমি এক অস্বস্তিকর উভয় সংকটে পড়লাম। কেননা, বঙ্গবন্ধুকে দেখেছি বলতে পারি না, আবার দেখেনি একথাও বলা যাচ্ছে না। তবে বঙ্গবন্ধুর এই অভাব আমাদের প্রবলভাবে আলোড়িত করল, সঞ্চার করল পাকিস্তানি বর্বর হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ ও লড়াই করে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত করতে প্রচণ্ড শক্তি ও সাহস।

জয়নালের মৃদু ডাকে জেনারেল অরোরার রূপসী বিমান ঘাঁটির ভাবনা থেকে বাস্তব আন্ধারী ঝাড় অভিযানে ফিরে এলাম। আমরা এখন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গাড়িবহরের অপেক্ষায়। মাইন স্থাপন করা জায়গা থেকে সোজা পেছন দিকে নদীর পশ্চিম পাড়ে কলাগাছ, বাঁশের ঝোপ ও ছোট গাছের নিচে আমাদের দু'দল সামান্য ব্যবধান রেখে অবস্থান গ্রহণ করে অপেক্ষা করছি। সন্ধ্যায় একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে বৃষ্টিতে ভেজা ঘাস ও মাটির ওপর আমরা বসে। মশা কামড়াচ্ছে, ছোট ছোট জোঁক হাতে লাগছে, জোঁক কাপড়ের ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে বাদুড় উড়ে যাওয়ায় পাখার ঝাপটার শব্দে নীরবতা ভেঙে পাখিরা চিৎকার করে উঠছে। কিন্তু একই জায়গায় সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ। হানাদার বাহিনীর গাড়ি কখন আসবে, তারই অধীর অপেক্ষায় গুনছি প্রহর। ভোর চারটা-সাড়ে চারটায় রায়গঞ্জের দিক থেকে একটি গাড়ির দু'টি হেডলাইট উপরে উঠে নিচে নেমে গেল। স্পষ্ট বোঝা গেল গাড়ি রায়গঞ্জ পুল পার হয়ে উত্তরে আন্ধারী ঝাড়ের দিকে আসছে। গাড়ি যতই অগ্রসর হচ্ছে, ততই আমাদের বুকের স্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। আর কয়েক মুহূর্ত। ওই তো গাড়িটি মাইন বসানো স্থানে চলে এসেছে। আমরা দু'হাত দিয়ে কান চেপে ধরলাম। হঠাৎ গগনবিদারী 'গুরুম গুরুম' বিকট শব্দে আকাশ যেন ভেঙে পড়ল। মাটি কেঁপে উঠল। পাখিরা ভয়ে চিৎকার করতে করতে উড়তে থাকল। মনে হলো, কান ফেটে গেছে। কয়েক মুহূর্ত পর সম্বিৎ ফিরে পেয়ে সবাইকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বললাম। কিন্তু সবাই ছুটছে ঘটনাস্থলের দিকে। দেখা গেল, রাস্তার মধ্যে বিরাট এক খাল হয়ে গেল। জিপের কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। রাস্তার বেশ দূরে ক্ষেতের মধ্যে একটি টুপি আর ক্যাপ্টেনের ব্যাজ লাগানো শার্টের হাতাসহ একটি হাত পড়ে রয়েছে। বিলম্ব না করে এগুলো নিয়ে দ্রুত চলে এলাম। শত শত লোক ও ভারতীয় সেনাবাহিনী দাঁড়িয়ে। ভারতীয় ব্রিগেডিয়ার জসি আমাদের অভিনন্দন জানালেন। জানা গেল, সাহেবগঞ্জসহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বাড়িঘর, দিনহাটার পাকা ভবনগুলোও কেঁপে উঠেছিল। পাক বাহিনীর ওই গাড়িতে একজন ক্যাপ্টেনসহ এগারোজন হানাদার বাহিনীর সদস্য ছিল। মাইনের আগাতে লরি-জিপসহ শয়তানদের সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। পার্শ্ববর্তী দিনহাটা, কুচবিহার, তফানগঞ্জ এবং দূর-দূরান্ত থেকে উৎসুক মানুষ কয়েকদিন যাবৎ আমাদের এই অপারেশনের সাফল্যের কথা জানতে এসেছে। মানুষের এই প্রাণঢালা ভালোবাসা এবং আমাদের প্রতিটি সাফল্যে মানসিকভাবে উত্তরোত্তর আরো বেশি করে শক্তি অর্জন করতে লাগলাম।

শ্লোগান, কবিতা ও সংগীত : মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

গোলাম মুস্তাফা

বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রকৃত ও কার্যকরী উন্মেষ ঘটে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ঘোষণা ও প্রচারের মাধ্যমে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই ৬ দফার প্রবর্তক ও পথপ্রদর্শক হিসেবে সহজেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। অপর দিকে গোটা বাঙালি জাতি তাকে তাদের অবিসংবাদিত নেতা এবং প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করে। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর বুদ্ধিদীপ্ত ও দৃঢ় নেতৃত্ব পূর্ব পাকিস্তানের একক শাসনক্ষমতা তার তথা আওয়ামী লীগের হাতে এনে দেয়। পাকিস্তানি কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো কর্তৃত্বই তখন আর এখানে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি।

জাতীয়তাবাদের বুলন্দ আওয়াজে মুখরিত হয় গ্রাম-শহর, দেশপ্রেমে উজ্জিবীত হয় সব বর্গের মানুষ। শ্লোগান, কবিতা আর সমকালের যে আবহ তা পূর্বে কখনো আসেনি, ভবিষ্যতেও কখনো আসবে না, এটি নিশ্চিত। সে উদ্দীপ্ততা এবং সে জাগরণ আর তৈরি হবার নয়। অগ্নিঝরা সে দিনগুলি যাদের প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়নি তাদের বোধে সে আবেগময় ও ঐক্যের দৃশ্য আসা সম্ভব নয়। উনসত্তরের ২৫শে মার্চ (যেদিন জেনারেল ইয়াহিয়া খান সামরিক আইন প্রবর্তন করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন) থেকে একাত্তরের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত দু'বছর সময়ের স্বাধীকার আন্দোলন রূপ নেয় স্বাধীনতায়– বিবর্তন ও বিপ্লব মিশে যায় একই স্রোতে।

সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর থেকেই বাঙালিদের আত্মপোলব্ধির সূচনা হয়। আন্দোলনে ও সংগ্রামে তিক্ষ্ণ হয়ে উঠে জাতীয়তাবাদের বিবর্তন, মূর্ত হয়ে ওঠে বাঙালির প্রকৃত পরিচয়। শ্লোগানে, কবিতায় ও সংগীতে বিমূর্ত হয়ে ওঠে স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের জীবন্ত ইতিহাস। নিচের সংগ্রহ ও সংকলন তারই কিছু নমুনা।

- নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর
- ইনকিলাব জিন্দাবাদ
- লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান

- কানমে বিড়ি মু'মে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান
- লাখো ইনছান ভূখা হ্যায়, ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়
- উর্দু-বাংলা ভাই ভাই, রাষ্ট্র ভাষা দুই-ই-চাই
- রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, নুরুল আমিনের গর্দান চাই
- রক্তের বদলে রক্ত চাই, মায়ের ভাষা বাংলা চাই
- আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি ?
- পাকিস্তান জিন্দাবাদ
- পাকিস্তান মুর্দাবাদ
- পাকিস্তান নিপাত যাক
- যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ
- ২১ দফা মানতে হবে
- আইয়ুব শাহী নিপাত যাক
- ৬ দফা ৬ দফা, মানতে হবে মানতে হবে
- পূর্ব বাংলার স্বাধীকার, দিতে হবে দিতে হবে
- শহীদের রক্ত, বৃথা যেতে দেবো না
- আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, মানিনা মানবোনা
- ১১ দফা ১১ দফা, মানতে হবে মেনে নাও
- শেখ মুজিব শেখ মুজিব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
- জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো, জাগো জাগো বাঙালি জাগো
- জেলের তালা ভাঙতে হবে, শেখ মুজিবকে আনতে হবে
- জেলের তালা ভাঙবো, শেখ মুজিবকে আনবো
- জেলের তালা ভেঙেছি, শেখ মুজিবকে এনেছি

- মুজিব না ভূট্টো, মুজিব মুজিব
- চাউল না ভূট্টা, চাউল চাউল
- ঢাকা না পিন্ডি, ঢাকা ঢাকা
- তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা
- তোমার আমার ঠিকানা, মক্কা আরব মদিনা,
  পদ্মা মেঘনা যমুনা, ইলিশ মাছের ঠিকানা
- জয় বাংলা
- ভোটের আগে ভাত চাই
- আসবে দেশে শুভ দিন, নৌকা মার্কায় ভোট দিন
- বঙ্গবন্ধু এগিয়ে চলো, আমরা আছি তোমার সাথে
- আপোষ না সংগ্রাম, সংগ্রাম সংগ্রাম
- সংগ্রাম সংগ্রাম, চলছে চলবে
- ইয়াহিয়ার ঘোষণা, মানিনা মানবোনা
- ভূট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো
- এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম
  এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম
- বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, পূর্ব বাংলা স্বাধীন কর
- জ...য় বা...ং...লা !!!
- স্বাধীনতা এনেছি, স্বাধীনতা রাখবো
- এক নেতা এক দেশ, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ
- লাখো শহীদ ডাক পাঠালো সব সাথীদের খবর দে,
  সারা বাংলা ঘেরাও করে রাজাকারদের কবর দে

- একাত্তরের হাতিয়ার, গর্জে উঠুক আরেকবার

- এই বাংলার শ্যামল প্রান্তর আকাশ গিরী ও নদী
  বলিছে সবাই বঙ্গবন্ধু আবার আসিতে যদি !!

- যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান
  ততদিন রবে কীর্ত্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।

গোলাম মুস্তাফা

জন্ম : ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫০, ফেনী। শিক্ষা: আলী আজম হাই স্কুল ও ফেনী কলেজ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সম্মানসহ এমএ। নিবেদিত রোটারিয়ান ও রোটারির গভর্নর গোলাম মুস্তাফা মানুষকে ভালোবেসে সমাজের কম ভাগ্যবানদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট।

একাত্তরে গোলাম মুস্তাফা ১০ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এর গণযোদ্ধা হিসেবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কমান্ডিং অফিসারের স্টাফ অফিসার ও পাইওনিয়ার প্লাটুনের একাংশের কমান্ডার হিসেবে রণাঙ্গনে রাখেন বীরত্বের স্বাক্ষর। প্রকাশিত বই : "ফেনী– বিলোনিয়া : রণাঙ্গণের এক প্রান্তর", "যুদ্ধ করেছি বিজয় এনেছি" ও 'আমি রোটারির কথা বলিতে ব্যাকুল।'

লেখক পরিচিতি

নিজামউদ্দিন লস্কর

জন্ম ৯ এপ্রিল ১৯৫২, সিলেট। একাত্তরে সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজের বিএ ক্লাসের ছাত্র তখন যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। সম্মুখ সমরে ডান উরুতে গুলিবিদ্ধ হন। একমাস চিকিৎসাধীন ছিলেন আসামের কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল, শিলং-এ। চলৎশক্তি ফিরে পেয়ে আবার উপস্থিত হন যুদ্ধের মাঠে।

মঞ্চ, বেতার ও টেলিভিশনের নাট্যশিল্পী ও নাট্যকার। নির্দেশনা ও অভিনয় শত নাটকে। সাহিত্য চর্চায় প্রথম প্রকাশনা ওয়াল্টার ট্রবিশের *আই লাভড আ গার্ল*-এর অনুবাদ। প্রকাশিত গ্রন্থ-*একাত্তরে রণাঙ্গনে*। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকীতে ছোটগল্প, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ লেখক। সিলেট জেলা শিল্পকলা একাডেমীর নাট্য-প্রশিক্ষক। বর্তমানে একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে ফিল্ড ম্যানেজারের দায়িত্বে কর্মরত।

মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদ (অব.), বীর বিক্রম

জন্ম : ২৯ অক্টোবর ১৯৪৪, ভোলা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ-র পাঠ শেষে যোগ দেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে। ১৯৬৮ সালে ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করেন। কামালপুর যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হন। স্বাধীনতা যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য সরকার কর্তৃক 'বীর বিক্রম' উপাধিতে ভূষিত হন।

পাকিস্তান জাতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড় হিসেবে বিভিন্ন দেশ সফর করেন। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ঢাকা মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় দলের অধিনায়কত্ব করেন। ১৯৮০ সালে জাতীয় ক্রীড়া পুরুষ্কারে ভূষিত হন।

তিনি বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এবং এশীয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের নির্বচিত সহ-সভাপতি ছিলেন। 'ফিফা'র আপিল ও ডিসিপ্লিনারি কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

বর্তমানে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়। ভোলা-৩ আসন থেকে ছয়বার জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিভিন্ন সময় সরকারের নানা মন্ত্রালয়ের প্রতিমন্ত্রী ও মন্ত্রী ছিলেন।

কর্ণেল মোহাম্মদ সফিক উল্লাহ (অব.), বীর প্রতীক

জন্ম : ২৬ অক্টোবর ১৯৪১, কুমিল্লা। ১৯৬২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় অনার্সসহ মাস্টার্স। ১৯৬৩ সালে একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাইব্রেরী সায়েন্সে ডিপ্লোমা।

১৯৭১ মার্চে যখন ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের বাংলার অধ্যাপক তখন যোগ দেন মুক্তিযুদ্ধে। যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হন। যুদ্ধের সময় তাকে ক্যাপ্টেন পদবীতে ফিল্ড কমিশন প্রদান করেন। যুদ্ধে সাহস প্রদর্শনের জন্য সরকার তাকে 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করে। তিনি বর্তমানে একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার।

হায়দার আনোয়ার খান জুনো

জন্ম ২৯ ডিসেম্বর ১৯৪৪, কোলকাতা। ১৯৬৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যার উপর মাস্টার্স ডিগ্রী লাভ। ১৯৭৫ সালে পদার্থবিদ্যার উপর দুই খন্ডের ডিগ্রী পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন বাংলা ভাষায়।

ছাত্রজীবন থেকেই কমিউনিস্ট রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ১৯৬২ সালে সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলনের সময় কারারুদ্ধ হন। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সক্রিয় সংগঠক। তখন তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি। বর্তমানে 'কিউবার সঙ্গে সংহতি কমিটি'র সাধারণ সম্পাদক এবং গণ সংস্কৃতি ফ্রন্ট এর সভাপতি।

মেজর কামরুল হাসান ভূঁইয়া (অব.)

জন্ম ২৪ জুলাই ১৯৫২, কুমিল্লা। ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে যখন তিনি এইচএসসি পরীক্ষার্থী, তখনই ডাক এলো মুক্তি সংগ্রামে। যোগ দেন ২ নম্বর এক গণযোদ্ধা হিসেবে। ৭২-এ সেনাবাহিনীতে নির্বাচিত, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি প্রতিষ্ঠায় বিলম্বের কারণে ৭৪-এর ৯ জানুয়ারি সেনাবাহিনীতে যোগদান, ৭৫-এর ১১ জানুয়ারী ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট কমিশন লাভ এবং ১৯৯৬-এর ১২ জুলাই স্বেচ্ছায় অবসরগ্রহন। ১৯৮৩ সালে চীনের বেইজিং ল্যাংগুয়েজ ইউনিভার্সিটি থেকে চীনা ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ। ঢাকা সেনানিবাসের 'বিজয় কেতন' মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা। মুক্তিযুদ্ধের গবেষক ও লেখক। প্রকাশিত বই-*জনযুদ্ধের গণযোদ্ধা* এবং *বিজয়ী হয়ে ফিরব নইলে ফিরবই না*। সম্পাদিত গ্রন্থ *স্বাধীনতা* (প্রথম খণ্ড), *খালেদের কথা* মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক বই।

মুক্তিযুদ্ধের গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর বাংলাদেশ লিবারেশন ওয়ার স্টাডিজ'-এর প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও প্রধান গবেষক।

আখতারুজ্জামান মন্ডল

জন্ম : ২ জানুয়ারি ১৯৫০, কুড়িগ্রাম। উনসত্তরের গণআন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। অতঃপর কারারুদ্ধ হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে অনার্সসহ মাস্টার্স। ৬ নম্বর সেক্টরের সাহেবগঞ্জ সাবসেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেন। প্রকাশিত গ্রন্থের নাম-*উত্তর রণাঙ্গনে বিজয়*। বর্তমানে শিল্পপতি।

মাহবুব এলাহী রঞ্জু, বীর প্রতীক

জন্ম : ১৭ জুন ১৯৫২, গাইবান্ধা। শৈশব রংপুরে এবং কৈশোর গাইবান্ধায়। একাত্তরের মার্চে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিসংখ্যানে বিভাগে প্রথম বর্ষ সম্মানের ছাত্র। গাইবান্ধায় মুক্তিযুদ্ধের অগ্রসৈনিক। ১১ নম্বর সেক্টরের মাইনকারচর সাব-সেক্টরে যুদ্ধ করেন।

যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য তিনি 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত হন।

মাহবুবুল আলম

জন্ম ১ সেপ্টেম্বর ১৯৫০, রংপুর। শিক্ষা-রংপুর জেলা স্কুল এবং কারমাইকেল কলেজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে এমএ। পোল্যান্ডের ওয়ারস ইউনিভার্সিটি থেকে জনপ্রশাসনে এমএস। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান। ৬ নম্বর সেক্টরের ৬/এ সাব-সেক্টরে স্কোয়াড্রন লীডার সদরুদ্দীনের অধীনে যুদ্ধ করেছেন। প্রকাশিত গ্রন্থ-(দুই খন্ডে) *গেরিলা থেকে সম্মুখযুদ্ধে, স্মৃতিসৌধ, এইদিন সেইদিন, এখন বড় অসময়, হাইড আউটের গল্প এবং যুদ্ধরেখা*। বর্তমানে সরকারী চাকুরে।

নাসির উদ্দীন ইউসুফ

জন্ম : ১৫ এপ্রিল ১৯৫০, ঢাকা। আদিনিবাস-চট্টগ্রাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগ বিভাগ থেকে মাস্টার্স। ২ নম্বর সেক্টরের অধীনে যুদ্ধ করেছেন ঢাকা (উত্তর) গেরিলা বাহিনীর কমান্ডার হিসেবে। বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। প্রকাশিত গ্রন্থ-*টিটোর স্বাধীনতা, ঘুম নেই*। নাটক-*একাত্তরের পালা*।

বর্তমানে ব্যবসায়ী ও সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি।

মেজর জেনারেল আমীন আহমদ চৌধূরী (অব.), বীর বিক্রম

জন্ম : ১ জানুয়ারী ১৯৪৬। ৫ জুন ১৯৬৬ ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টে কমিশন লাভ করেন। সত্তরের মার্চে তিনি ক্যাপ্টেন পদবীতে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে কর্তব্যরত ছিলেন। ২৪ মার্চ ১৪ ডিভিশনে জিওসি মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা চট্টগ্রাম থেকে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের কমান্ডান্ট ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদারসহ ক্যাপ্টেন আমীনকে আগাম কোনো সংবাদ ছাড়া হেলিকপ্টারে ঢাকায় নিয়ে আসেন। ক্যাপ্টেন আমীন পালিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন।

তিনি ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যুদ্ধ করেন। ৩ আগস্ট তিনি নক্‌সি বিওপিতে শক্ত পাকিস্তানি অবস্থান আক্রমনকালে মারাত্মকভাবে আহত হন। সাহসিকতার জন্য তাকে 'বীর বিক্রম' বীরত্ব উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ডা. জিয়াউদ্দীন আহমদ

জন্ম : ২৮ এপ্রিল ১৯৫২, সিলেট। সিলেট মেডিকেল করেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। তার পিতা সিলেট মেডিকেল কলেজের সার্জারী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সামসুদ্দীন আহমদ মুক্তিযোদ্ধা ও গুলিবিদ্ধ আহতদের চিকিৎসারত অবস্থায় পাকিস্তানিরা বর্বরভাবে তাকে ডা. লালসহ আরো ৭ জনকে হত্যা করে ৯ এপ্রিল ১৯৭১। ডা. জিয়াউদ্দীন তখন ব্রাক্ষ্মনবাড়িয়ার শাহবাজপুর এলাকায় ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে যুদ্ধ করছিলেন।

ডা. জিয়াউদ্দীন বর্তমানে আমেরিকার ফিলেডেলফিয়ার ড্রেক্সেল ইউনিভার্সিটিতে এসোসিয়েট প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন। সেখানে তিনি মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে গবেষনা করছেন তার চিরায়ত পেশার বাইরে।

কর্ণেল মোহাম্মদ আব্দুস সালাম (অব.), বীর প্রতীক

জন্ম : ৩০ জুন ১৯৫২, সিলেট। এইচএসসি পর্যন্ত লেখাপড়া সিলেটে। ঢাকায় জিন্নাহ কলেজের (বর্তমানে তিতুমীর কলেজ) প্রথম বর্ষের ছাত্র থাকা অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এপ্রিল মাসে। মেজর কাজী মোহাম্মদ সফিউল্লাহর নেতৃত্বে তিনি ৩ নম্বর সেক্টরের অধীনে ও পরে এস ফোর্সের ১১তম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সাথে গণযোদ্ধা হিসেবে যুদ্ধ করেন।

সম্মুখ সমরে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য জন্য সরকার তাকে 'বীর প্রতীক' উপাধিতে ভূষিত করে।